প্রথম সংখ্যা]　　২৫শে বৈশাখ ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত

প্রকাশক—

কার্ত্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা

এই সংখ্যার মূল্য চারি আনা মাত্র

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কার্ত্তিক প্রেস হইতে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কার্ত্তিক প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সবুজ পত্র

মুখপত্র

ওঁ প্রাণায় স্বাহা

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"একটা নতুন কিছু করো।" সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে' তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দুদিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে' ফেলে। এই সব দেখে শুনে, এদেশে কথায় কিম্বা কাজে নতুন কিছু করবার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই—তা যে আমাদের আছে তা বলতে পারিনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ কর্‌বার জন্য, এত কাগজ থাক্‌তে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি—তাহলেও আমাদের নিরুত্তর থাক্‌তে হবে; কেন না কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্য-সমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্ব্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা,—শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা,—যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্ব্বলোকমান্য "সাহিত্যিক" নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ কর্‌তে আমরা বাধ্য। যে কথা বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখ্‌তে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই—এ জাঁক করবার মত দুঃসাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্ম্মও নয়; সে হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রের কথা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্ত্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে কর্‌বার জিনিষ। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়্‌তে পারি নে, গড়্‌তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন। কারণ দশের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে কোনও কাজ উদ্ধার করতে হলে, নিজের স্বাতন্ত্র্যটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ-আনা মিল থাকে, তাহলে প্রতিজনে বাকী দু-আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনও ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক

দেশের, এক যুগের, এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ-আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দু-আনার মূল্য ঢের বেশী। কেননা ঐ দু-আনা-হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকী চৌদ্দ-আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোল-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এ কথা শুনে অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব, সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়,—সখ। ও ত কল্পনার আকাশে রঙীণ কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে' নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভাল। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে শেখায়। তবুও একথা সত্য যে মানব-জীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করে'ই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের

শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্‌গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়,—আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ়তত্ত্ব আমরা না জান্‌লেও, তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট, যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রতভাব। অপরদিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাঙ্গলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি,—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেন না জানিনে। সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে' তোলা। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙ্গালীজাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব তা কতকটা দূর কর্‌তে পার্‌ব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে', জড়তাকে

সাত্ত্বিকতা বলে', আলস্যকে ঔদাস্য বলে', শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে', উপবাসকে উৎসব বলে', নিষ্কর্ম্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে' প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল। যে দুর্ব্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চণার মত আত্মঘাতী জিনিষ আর নেই। সাহিত্য, জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনা—কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বলতে পারিনে, কেননা, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে' পাবার জিনিষ নয়। তবে বাঙ্গলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে—সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ। এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে' তোলবার দিকে তাও অস্বীকার করবার যো নেই, কারণ ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্, আর হলাহলই হোক্, তার ধর্ম্মই হচ্চে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজি-সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক্

কোনও একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু কর্‌ছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হট্‌তে চান্, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান কর্‌ছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান কর্‌ছেন। এক কথায় আমরা উন্নতিশীলই হই, আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক্, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে—সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব-সাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বল্‌তে পারলেও, এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয় এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ কর্‌বার জন্য উৎসাহ দেব।

ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আননা কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ কর্‌তে হবে। চিনের টবে তোলা মাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই, ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলক্ষে শুধু বঙ্গ বিহার নয়, সেই সঙ্গে

হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙ্গিয়ে একেবারে আর্য্যাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব্ব কবি হচ্ছে কালিদাস, কাশীদাস নয়,—দার্শনিক শঙ্কর, গদাধর নয়,—শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয়,—আলঙ্কারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায়, নব্যদর্শন, নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতি পুরাতন, আর যা কালের হিসাবে অতি পুরাতন, তাই আবার বর্ত্তমানে নতুনরূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাক্‌লেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল,—উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও, জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য—উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়ে এক জাতীয়, কেননা উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক দুই দিক্ থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য,—বাদবাকী লেখা হয় কাজের, নয় বাজে।

এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহির্ভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে', আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।

এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য যে কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়।

কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই, সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।

সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি; তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছি সব সাহিত্য-সমাজের সখের কবির দল। অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোন কাজই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্ব্বলোক-স্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, সে লেখায় তা নেই,—অপর দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তা'তে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়তে চাই বলে', আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত, যে যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও করতে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠছে। ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্র-গুলি সংখ্যাপূরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার করতে বাধ্য, এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এই সব দেখে শুনে, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের তারতম্যে; প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা

অগ্রাহ্য কর্‌তে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল, অনাহূত কিম্বা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌তে বল্‌তে পার্‌ব; কারণ, আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ কর্‌তে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পার্‌বেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ' বার বলা হয়েছে তারি পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।

তারপর, যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি;—তা হয় দূরদেশ হতে, নয় দূরকাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনও আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন কর্‌তে না পার্‌লে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিম্বা জীবনে ফল পাবনা। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্‌তে হলে প্রথমে মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ কর্‌তে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে' নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত কর্‌বার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের

নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্চে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করে' দেবার চেষ্টা করব।

আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষার দোষেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে', বাঙ্গলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরাজি, লিখি বাঙ্গলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও, তার চারা তুলে বাঙ্গলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আন্ছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পার্ছে না বলে', হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদবধ" কাব্য পরগাছার ফুল। "অর্কিড"এর মত তার আকারের অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাক্লেও, তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে' "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোন দেশেরই নয় বলে' "বৃত্রসংহার" মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র, ভাষার ও ভাবের একতার গুণে, সংযমের গুণে, তাঁর মনের কথা ফুলের মত সাকার করে' তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীন হোক্ না কেন, প্রাণও আছে, গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্ছে। আশা করি বাঙ্গলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ

কর্‌লেই তা'তে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশা করি এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা কর্‌বে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে' রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে' থাকেন যে "গৌড়-সারঙ্গ" রাগিণী ছোট, কিন্তু গাওয়া মুস্কিল; "ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতী নিকাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল।" অবস্থাগুণে যতই মুস্কিল হোক্ না কেন, বাঙ্গালীজাতিকে এই গৌড়-সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাঙ্গলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনও সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

সম্পাদক।

সবুজ পত্র

বাঙ্গলা দেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার কর্‌বেন না। মা'র শস্যশ্যামলরূপ বাঙ্গলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে, যে সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর

সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, ভরাই হতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত, এক ঢালা সবুজবর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথায়ও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথায়ও তার বিরাম নেই ;—শুধু তাই নয়, সেই রং বাঙ্গলার সীমানা অতিক্রম করে', উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে, ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশযোড়া রং নয়, বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কারা হয়ে দেখা দেয় না; বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতে পূজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মত শাদা সাড়ীও পরে না। মাধব হতে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে ; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয় সে শুধু কড়ি কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণ-গ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী ; প্রকৃতির ও-সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যাভিচারীভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ীভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। ' বর্ণ মাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ,—অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্য-বস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই

সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না, এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারিনে। বাঙ্গলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই—কারণ সে লেখার ভাষা বাঙ্গলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারিনে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিষ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিষ তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে সূর্য্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টি মাত্র, এবং শুধু সিধে পথেই সে শাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি। এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে' থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং,—জীবনের পূর্ব্বরাগের রং। লাল রক্তের রং,—জীবনের পূর্ণরাগের রং। নীল আকাশের রং,—অনন্তের রং। পীত শুষ্কপত্রের রং,—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অনন্ত ও অন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম্ম।

যে বর্ণ বাঙ্গলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয় মনকেও রঙ্গিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে, সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙ্গালীর মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রমাণ স্বরূপে দেখান যেতে পারে, যে আমাদের দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়মন্দিরে রজতগিরিসন্নিভ কিম্বা জবাকুসুমসঙ্কাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই সৌরও নই।

আমরা হয় বৈষ্ণব নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ সেই পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গ-সরস্বতীর দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায়, দিন দিন নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিনে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর-পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কখনও আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম নষ্ট করা। সমাজেব যা মন্ত্র, তারি সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে "অপরের মত হও", আর তার

নিষেধ হচ্ছে "নিজের মত হয়ো না।" এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট,—সবুজ রং, ভালমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্ম্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে' তুলতে চান্। তাঁদের বিশ্বাস যে কোনরূপ কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পার্‌লেই—আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অন্তে আসে না,—জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্ম্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এঁদের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ, যে সে মন পূর্ব্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে, এবং উত্তর মীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এঁরা ভুলে যান্ যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি,—প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁরা চান যে আমরা শুধু গদগদ ভাবে আধ-আধ কথা কই। এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে' দিয়ে, ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না, তার ধর্ম্ম হচ্ছে এগোনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্ম্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই,—

কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে' রাখ্‌তে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙ্গালীর মন এখন অর্দ্ধেক অকাল-পক্ক, এবং অর্দ্ধেক অযথা কচি। আমাদের আশা আছে যে সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চ্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলাতী পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, বাঙ্গলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে', তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনও গর্ভ-মন্দির থাক্‌বে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাক্‌বে। উষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালঙ্কারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনও উজ্জ্বল, কখনও কোমল করে' তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

বীরবল।

সবুজের অভিযান

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা !
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজ্‌কে যে যা বলে বলুক তোরে !
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা !
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

খাঁচাখানা দুলচে মৃদু হাওয়ায়।
আর ত কিছুই নড়েনা রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় !
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ !
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠ্‌ছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায়না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাববে একি বিষম কাণ্ডখানা !
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায় !
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা !

শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' !
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা !
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে !
বিবাগী কর্‌ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা' !
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী !
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার্‌ দিবি !
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা !

১৫ই বৈশাখ ১৩১৫ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতর বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

এসব তর্ক করিয়া হয় নাই—কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপক-পাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদূর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে সুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখ, আমরাও পশ্চিম সমুদ্র-পারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, "তোমরা মরিতে বসিয়াছ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলি বস্তু-চাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ,—তোমরা স্থূলের উপাসক।" এসব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা ত মারমূর্ত্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভাল-মানুষের মত মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, "হবেও বা! আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি—ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালই বোঝে।" এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুসি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা

যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, একথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। কেননা সে গালিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাদের জীবনযাত্রায় সঙ্কটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পূরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এই জন্য, নিষ্কর্ম্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্ত্তিও নাই, হাতে কোনো কর্ম্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া? তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদী স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিষ নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্ম্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এস্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনি হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বক্‌শিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয় "হজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান ত নড়িবেন না।"

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমারা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য,—কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক্ আর বেশিই হউক্ তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই

যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিষই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কি! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারি খবরদারী করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, "রোস রোস," প্রাণ বলিতেছে, "দেখাই যাক্ না!"

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব

আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই সরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতি সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কি ভয়ঙ্কর তাহা মধ্য-এসিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড় বড় সহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জ্জটী সেখানে একা স্থাণু হইয়া উর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ

গণিতেছেন,—কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া? নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কি উপায়ে?

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ঙ্কর হইয়া বসিয়া আছে—এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে,—মহতী স্রোতস্বিনীর মত দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণ বিনিময়ের সেই পণ্য বিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালু-চাপা পড়িয়া গেছে। এখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো একটা ভাঙাটুক্‌রা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্প-প্রবাহিনীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মত মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কি? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলি তলাইয়া যাইতেছে।

চারিদিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহু-পূর্ব্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত—সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের

ঢালাই-পেটাইকরা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না—তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁৎ নয়, নিটোল নয়; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন? তাহাদের সিন্ধুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্ না কেন, সেই ইজিপ্টের নীল-নদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে "ফেলাহীন্" চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোট ভাই; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে—যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মত সনাতন আর কিছুই নাই;—কিন্তু তারিখ ত কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা ত প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে ত ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা

মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অজ্ঞতা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়িমারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তর মেরু কখনো দক্ষিণ মেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত একথা কোনো মতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন

বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলি ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোন শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলি তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য্য দুরন্ত হইয়া উঠে, যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জ্জনি সঙ্কেতে ওঠ্ বোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষ-গুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে! তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কি

আশ্চর্য্য তাহার কৌশল! ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে!

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্ব্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মত। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এদেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এই জন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে," আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার

বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড় ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্য লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়্‌দাড়্‌ শব্দে ঘরের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্ত্তিগুলি চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক! তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক্, জঞ্জাল সরিয়া যাক্, কাঁটা দলিয়া যাক্, পথ খোলসা হৌক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও

আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর একথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হালদার-গোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোন রকমের গোল বাধিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা সঙ্গত কারণেই যদি মানুষের সব কিছু ঘটিত তবে ত লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মত হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে;—গণিত শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না জানিনা কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এই জন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন সেটা অসঙ্গতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড কবিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুইকূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে, এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া

তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের ষ্টীমের মত তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে। সামনে যদি সে রাস্তা পায় ত ভালই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়মানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায় এই প্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্ততঃ দুটি একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মত টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায়, যে লোক নিজের ভার ষোলো আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন এক প্রকারের পুরুষ মা, তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহরক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে

অহোরাত্র কামারের হাপরের মত হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয় ত মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু এই সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদ-পরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থি-কঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্ত্তিমান দুর্ভিক্ষের মত পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে কর, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড় বৌয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিষটা ফরমাস করে। কিন্তু সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে কিন্তু কাহারও মনের মত হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই

শুনিয়া আসিয়াছে যে নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ দশটাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই—একথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো না কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্ত্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হোক্ চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড় বৌয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নিধরণের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড় স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন

তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়ন শাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড় কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত;—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নিভৃত তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজনবোধ নাই। এই জন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুসি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাস করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-কিছু খর্ব্ব করা সম্ভব হয় কিন্তু নিজের সঙ্গে ত দরকষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুসি হইল তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে, বেশ, ভাল;—কিন্তু বনোয়ারির মনের খট্‌কা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয় ত পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়া বলে—"তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করচ? কেন, এ ত বেশ হয়েছে!"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী ত তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে ত বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের ত এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর কিছু নাও যদি থাকে ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন—ময়ূরের পুচ্ছের মত স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়বাবু তবু কিছুতে তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর কিছুর জন্য তত নহে, যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মত শর যোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার ত জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙীন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষার-সঙ্ঘাতের মত;—তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ

খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার ত এখনি, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান সখ তিনটি,—কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃত চর্চ্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায় সেগুলি বড় কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলঙ্কারবাহুল্যকে খর্ব্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক্ কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকেনা বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোট ভাই বংশীলাল যখন ছোট ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিষটিও জড়িত, —এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতই ছোট—ছোট বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারী একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনেভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড় আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু

করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানা রকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই সখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্য্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন,—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহা সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মত হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্ত্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই, বছর কয়েক পূর্ব্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন উপলক্ষে অন্যান্য বারের মত জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভাল মত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু মধুকৈবর্ত্ত

ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে একথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক্, কিরণ নিশ্চয় জানে যে নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এই জন্য কিরণ সুখদাকে বারবার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কি করব বল! জানই ত এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্ত্তা আছেন, মধুকে বল তাঁকে গিয়ে ধরুক্।"

সে চেষ্টা ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের পরেই অর্পণ করেন, কখনই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্ত্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন,—বিষয়-কর্ম্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কি!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বারবার করিয়া

বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মত বিঁধিল।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগ্‌লা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল ত ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির;—বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আর আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে—যেন ঠেলাঠেলি ভিড়। জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের রংকরা একখানি সাড়ি এবং খোঁপায় বেল ফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুনঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে রঙীন চাদর ও বেলফুলের গড়ে' মালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? মধুকৈবর্ত্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে?

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্ত্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে

লাগিল। বলিল, ছোটলোক,—নীলকণ্ঠ কহিল, ছোটলোক না হইলে বড় লোকের শরণাপন্ন হইব কেন। বলিল, চোর,—নীলকণ্ঠ বলিল, সে ত বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই ত সে প্রাণ বাঁচায়। সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল—শেষকালে বলিল, উকিল-বাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন ত আবার আসিব।

বনোয়ারি ছোট ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনি বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত একলা গেলে কোনো ফল হইবে না—কেননা এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্ব্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাহার বড় ছেলেকেই সব চেয়ে ভালবাসেন। কিন্তু এখন মনে হয় বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এই জন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভাল ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিন রাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জালনা বন্ধ। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক

বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; —দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস্!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়—সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া খুব এক চোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দীঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিষ্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্ত্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া সুরু করিয়া দিল নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই

এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল নীলকণ্ঠের সংস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্ত্তা সকল বিষয়েই তাহার পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোন অশ্রদ্ধা নাই। কারণ আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই ত চিরকাল বড়-ঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই মনিবের বিষয় রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া ত জমিদারীর কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কি করে, না করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, দেখ দেখি বংশীর ত কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে, ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মত।

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দীঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্দ্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম্ম আজ সে সকাল সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্ত্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড় ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড় হইতে হইবে এমন কথা কোনো দিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোঁসাই-গঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্ম্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, যেমন করিয়া পারি মধু কৈবর্ত্তকে আমি রক্ষা করিব!—কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, শোন একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া?

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোন দিন ত টাকা জমে না। স্থির করিল

তাহার তিনটে ভাল বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামী হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু গ্রামে এসব জিনিষের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারিদিকে লোকে কানাকানি করিবে। এই জন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্ত্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কি রে কি, ব্যাপারখানা কি!" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।

কি সর্ব্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে

লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিষ্টার আসিল; সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাসকরা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্ত্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয়মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না।—আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কি করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, তুই থাক্ তোর কোনো ভয় নাই। কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে—বোধ করি নিছক্ নিজের পৌরুষের স্পর্দ্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন কি, কর্ত্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে। বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। একি কাণ্ড! বাড়ির বড়বাবু—বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্ত্তকে লইয়া!

অদ্ভুত বটে। এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়বাবু জন্মিয়াছে

এবং কোনো দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়-ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়বাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট-ভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার ত কোনো দিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়বাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড় বৌয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লটকানে রংয়ের সাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্ত্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদার-বংশের বড় ছেলে, সকল কথার আগে একথা ত মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে ইহা ত হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সঙ্গত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে

নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না একথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়বাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল—অন্য কোনো প্রকারের উচিত অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্ত্তব্য তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, জান ত ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভাল আছেন তখন বেশ আছেন কিন্তু একবার যদি ক্ষ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কি করি বল ত?

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপা ফুলটির মত পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির

সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্ত্তব্যের কথাটা, চারিদিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য সত্যই একটা ক্ষ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না এই জন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মত উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে সান দেওয়া সুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক্ মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল—তাহার পরে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে

এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু বনোয়ারির মা আছেন, এবং আত্মীয় স্বজনের নানা লোকের নানা প্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিস তাহা জানে এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে মধুকে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত অমাবস্যা রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমত তাহার শান্তি হইল। কিন্তু সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্ব্বের মত রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালবাসিত আজ দেখিল বংশী তাহার কেহ নহে; সে হালদার-গোষ্ঠীর! আর তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদার-গোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাসে গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়-বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎ খুঁৎ করিত। আজ দেখিল

কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদার-গোষ্ঠীর বড় বউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায়রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়!

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের ত প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোট কুনকের মাপের বাঁধাবরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবল মাত্র ডিমের ভিতরকার সঙ্কীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচেনা, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে—নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক—কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার-গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্ব্বের মত কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়,—আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধু কৈবর্ত্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে, তাহার মূল কারণ মধু। এই জন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা

অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে সয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শ্রান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই এক দিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোট বৌ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্ত্তব্যের ক্রটি হইয়াছিল এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে—এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ ত তাহাকে এক মুহূর্ত্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধু কৈবর্ত্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোট, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল

মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখী শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এই জন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষ্যার বেদনা জন্মিয়াছিল কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালবাসিতে পারিত কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্ম্যের একজন ভাড়াটে—যতদিন বাড়ির কর্ত্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জ্জনের শক্তি যে কত প্রবল তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল,—এই হৃদয়কে আমি ত জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা ত করিয়াছি।

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভাল করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন

ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারি সহিয়াছে কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষহিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশী তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল বংশী জ্বরে পড়িয়াছে, এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোট ভাই, এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই ত একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কি তাহা আর সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেই জন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্ব্বদাই ভয় পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়।

তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ীর সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা তাবিজ মাদুলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড় ভালবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারী আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয় তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এই জন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল;—প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে

নীলকণ্ঠ যখন কর্ত্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন—বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুইশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিকুটর, তাহার উপরে ভার রহিল সে যতদিন বাঁচে হালদার পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব তিনি বরাদ্দমত আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান। তিনি কিরণকে বলিলেন, আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না—এবাড়ি ছাড়িয়া চল আমার সঙ্গে কলিকাতায়!

“ওমা! সে কি কথা! এ ত তোমারি বাপের বিষয়—আর হরিদাস ত তোমারি আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন?”

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কি কঠিন! এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষ্যা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটলোক,

যত যদু, মধু, যত কৈবর্ত্ত এবং আগুরির দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি ত ঘরে আসিয়াছে এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই ত তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিষপত্রের লিস্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক বাক্স আছে তাহাতে তালা চাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দ্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বনোয়ারি সিংহগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, বড়বাবু, আমার ত কোনো দোষ নাই! কর্ত্তার উইল অনুসারে আমাকে ত সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই ত হরিদাসের।

কিরণ মনে মনে কহিল, দেখ একবার, ব্যাপারখানা দেখ! হরিদাস কি আমাদের পর? নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের? আর, জিনিষপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি? আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই ত ভোগ করিবে!

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার

বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্ত্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব!

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিলনা যে কর্ত্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানেনা কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের, এবং ইহাদের অভাবে মামলা মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নালকণ্ঠের দেহের ভঙ্গী অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু

তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। নীলকণ্ঠ বলিল, কর্ত্তার শ্রাদ্ধসম্বন্ধে—

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—আমি তাহার কি জানি?

নীলকণ্ঠ কহিল, সে কি কথা? আপনিই ত শ্রাদ্ধাধিকারী।

মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে—আমি আর কোনো কাজেরই না। বনোয়ারি গর্জ্জিয়া উঠিল, যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাসা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মত ভাগ্যকর্ত্তৃক পরিহসিত আর কে আছে! পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুয্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল এই দলিল দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক্।

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, জ্যাঠামশায় তুমি বাহিরে যাইতেছ আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব!

বনোয়ারির মনে হইল বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে

দিয়া বলাইয়া লইল। আমি ত পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে!

বাহিরের বাগান পর্য্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটীরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল দেখিল তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কি ছিল! তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মত সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনো কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথী। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, তুমি চাঁপাতলায় গিয়েছিলে?

নীলকণ্ঠ বলিল, আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম বইকি। দেখিলাম আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কি হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।

বনোয়ারি। আমার রুমালে বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালমানুষের মত কহিল, আজ্ঞা না।

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ! তোমার ভাল হইবে না এখনি ফিরাইয়া দাও!

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। কি জিনিষ তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোন জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে-করিয়া হউক্ এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব। কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিলনা, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মত বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই!

শ্রান্ত দেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই, এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না কোথায় সে আছে! ভাল করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া।

বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, জ্যাঠামহাশয়, তোমার কি হারাইয়াছে বল দেখি ?

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল—হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, আমি যদি দিতে পারি আমাকে কি দিবে ?

বনোয়ারির মনে হইল, হয়ত আর কিছু। সে বলিল, আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।—এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল, সে জানে তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙীন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল—সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অনেকদিন পূর্ব্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে ল্যাজ নাড়িতেছে। আর কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, হরিদাস তুই কি চাস আমাকে বল্।

হরিদাস কহিল, আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই জ্যাঠামশায়।

বনোয়ারি কহিল, আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও—উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, আমাকে আর ভয় করিয়োনা, আমি ফেলিয়া দিবনা!

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, এগুলি হরিদাসের। বিষয় সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তুমি কোথা হইতে পাইলে?

বনোয়ারি কহিল, আমি চুরি করিয়াছিলাম।

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে এই নে!—বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর একবার ভাল করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল সেই তন্বী এখন ত তন্বী নাই—কখন মোটা

হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদার-গোষ্ঠীর বড় বৌয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরু শতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না—দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পাতার গান

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী-সঙ্গমে
রঙীন্ হয়ে উঠ্‌ছি মোরা সবুজ-শোভা-বিভ্রমে।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো! বনের বনস্পতি গো!
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো।

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে,
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে।
মেতেছে মন—প্রাণ মেতেছে না জানি কোন সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয়-গানে।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য,
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান, কঠিন কাঠের কারুণ্য!
স্তর পড়েছে পঞ্জরে যার থর পড়েছে বল্কলে
মোদের তরে পণ সে করে কোন্ রভসের কোন্ ছলে!

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদ্‌রা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম।
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই নে,
সবুজ দীপের দীপান্বিতা এক্কেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে ;
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাবাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্র খর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে,
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো ছায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুন্‌ছ কথা ?—বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষ লাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা'।"

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা! গানের প্রাণের মাতৃকা!
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দ্বিতীয় সংখ্যা]   জ্যৈষ্ঠ ১৩২১   [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক ঃ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সাহিত্য-সম্মিলন

গত সাহিত্য-সম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে,—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে কখনও শোনা যায়নি তা নয়; তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর পাঁচটি বিবাদী সম্বাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তা কোমল নয়—তীব্র।

এবারকার ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের, প্রচলিত প্রথা মত—"আসুন বসুন" বলে' সম্ভাষণ করেননি; "উঠুন চলুন" বলে' অভিভাষণ করেছেন! এঁরা সকলেই গলার আওয়াজ আধসুর চড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলেছেন যে—"এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ।" এই দেশব্যাপী

মিথ্যার হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারি সন্ধান বলে' দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্য্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিথ্যার চর্চ্চা লোকে দু'ভাবে করে,—এক জেনে, আর এক না জেনে। সত্য যে কি, তা জেনেও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন,—অন্ততঃ ওর কোন টোট্‌কা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে অনেকে কেবল মাত্র মানসিক জড়তাবশতঃ, ও-বস্তু যে কি, তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখপাত্রেরা, যাদের মনের সর্ব্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে, সেই শ্রেণীর লোকদের উপদেশ দিয়েছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

এঁরা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান,—সত্যের জ্ঞানে; আমাদের উঠে চল্‌তে বলেন, সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্ত্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য। কোনও জিনিষ দেখ্‌তে হলে, জাগা অর্থাৎ চোখ-খোলা দরকার, আর কোন জিনিষ খুঁজতে হলে, ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এঁরা আমাদের "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চান্। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে রাজি হব কিনা জানিনে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

লোকপ্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপাত করে না। পাঁঠা যে ওসব কথা কানে তোলে না, তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্য-যজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের

মন্ত্র,—সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এঁরা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মত কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ-চতুষ্টয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অভিভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে—

"বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।"

এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি, কিন্তু পুরাকালে বালক অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে', দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিত পালিত হয়ে, এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন কি, ইউরোপবাসীরা এখন আর তাঁকে সাম্‌লে উঠতে পারছে না। এই কারণেই, যিনি স্থলপথে বিলেত চলে গেছ্‌লেন, তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনও অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলেরই আশা করেন। কেন? তা তিনি স্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপগুণের যে শাস্ত্রসঙ্গত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।

ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,—

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন সত্য তিন প্রকার :—

(১) পারমার্থিক সত্য = তত্ত্বজ্ঞান = পরাবিদ্যা।

(২) ব্যাবহারিক সত্য = বিজ্ঞান = অপরাবিদ্যা।

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য = ভ্রমজ্ঞান = অবিদ্যা।

বিজ্ঞান বল্‌তে একালে আমরা যা বুঝি, সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক আলোচনা করা কঠিন; কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। নব্যমতে জ্ঞান এক,—শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করে'ও, জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখান যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।

ঠাকুরমহাশয় পূর্ব্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন :—

"বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।"

অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ড-সত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান,—আর যার দ্বারা বহু খণ্ড-সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান, এই মনে করে' যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে

রাখবার জন্য এঁদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদবেদান্তে নেই ; বরং উপনিষৎ-কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ব করতে না পারলে, পরাবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করলে, বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম-জ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান ; বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ড-সত্যের উপর যদি এক মোট-সত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তাহলে বহু খণ্ড-মিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।

আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক করে নিলেও,—এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে ; কেন না বস্তুতঃ ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় এক ভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-একভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলতঃ একত্বের জ্ঞান। অপরপক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারি জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জানতে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে, কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই ; ভয় আছে শুধু মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের। যাঁরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তাঁরাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্রমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগ্‌তে পারে যে, কি করে' একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে মিথ্যা,—এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারি সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা ও সূর্য্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য; অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাঙ্গলা দেশে চোখে দেখা যায়, তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আর নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চেপ্টা---গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে', অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান,—অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যোগাযোগ করে' সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চেপ্টা-খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং কোনও একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করান যায় না।

ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণতঃ মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে—কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখ্‌তে চায়; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তু সকলকে পৃথকভাবে না দেখে, যুক্তভাবে দেখ্‌তে গিয়ে, বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চেপ্টা, ও সূর্য্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে এ দু'টি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এ দু'টি হচ্ছে এক সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী নামক মৃৎ পিণ্ডটি যে কারণে সূর্য্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ, বা চতুষ্কোণ কিম্বা চেপ্টা হ'লে, ও-ভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হ'ত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই; কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তুজগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে না; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না, অর্থাৎ কাব্য শিল্পও মারা যাবে না। যা' তত্ত্বজ্ঞানও নয়, বিজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়,—তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা; এবং তারি চর্চ্চা করে' আমরা ধর্ম্ম, সমাজ, কাব্য, শিল্প,—এক কথায় সমগ্র মানবজীবন সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।

(২)

বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের নাম নয় ;—একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে' যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারি নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধাসাধি করিনে, সে কখনই এদেশে ফিরে আসবে না, যদি না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বল্‌তে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্ব-জ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে—"এক সত্য",—অথচ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন—যা পূর্ব্বে এক ছিল, তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙ্গাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক পৃথক বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা,—জড়-জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে, একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মত সমষ্টি গড়ে' তোলা। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ করতে হলে আঁকযোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আর-যে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়—পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপযোখও করা চাই। বিনা মাপে, বিনা আঁকে যে

সত্য পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্য্যাদা, গৌরব ও মূল্য,—তা সবই এই পদ্ধতির দরুণ। আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মুল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে, তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মত,—এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য ; কিন্তু কি মাপযোখের, কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে, ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া,—অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে, যে-খুসি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয়ে ভুল বেরচ্ছে, আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়, ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও, একটি উপ-বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এক্ষেত্রে মৈত্রমহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে' অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল, নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেই সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতিহাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল-সময়ে মাটির উপর পড়ে'-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে' উদ্ধার করবার জিনিষ ; কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়,—বর্ত্তমানে তা চাবা পড়ে' থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করবার অর্থ হচ্ছে অদৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য পুরুষকার চাই। তাই মৈত্রমহাশয়, কেবলমাত্র ভক্তি-

ভরে অতীতের নাম কীর্ত্তন না করে, তার সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌বার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শমত কাজ কর্‌তে হলে, আমাদের করতাল ভেঙ্গে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যে সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে, আগে তা খুঁড়ে বার কর্‌তে হবে, পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে' সাহিত্য-সমাজে প্রচলন কর্‌তে হবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্রমহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশঃ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্ত্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে—মৈত্রমহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে, একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।

সে যাই হোক, মৈত্রমহাশয় আমাদের আর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে, কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা কর্‌তে হলে, আমাদের অসংখ্য মানসিক আলস্য-প্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ কর্‌তে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিম্বদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।

শুধু রূপকথা নয়, সেই সঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা কর্‌তে হলে সে রচনায়, "শব্দের

লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য্য, ভাষার চাতুর্য্য" পরিহার করতে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চলবে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু, অপরকে যে উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে উপদেশ অনুসরণ করেন নি, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে "অক্ষর-ডম্বর", এ কথা টাউনহলে সশরীরে উপস্থিত থাকলে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার করতেন। সম্ভবতঃ অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।

(৩)

যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেননি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মত সহজ হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা-সহজেই নিবারণ করে। বর্ণগন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।

আমি বহুকাল হতে এই কথা বলে আসছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্ব্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন। এঁদের মতে, বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে

ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না; সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোষাকী ভাষা তৈরি করা চাই। পোষাক যখন চাইই, তখন তা যত ভারি আর যত জমকালো হয়, ততই ভাল। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা জরিতে কিংখাব বুন্‌তে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি ঝুঁটা, তা দিয়ে তাঁরা কিংখাব দূরে থাক্ দোসুতিও বুন্‌তে পারেন কি না,—পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না,—এ সব বিচার করবার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাঙ্গলা লিখ্‌তে বল্‌লে তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তাঁদের কাব্যের বস্ত্রহরণ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনও গর্হিত আচরণ কর্‌তে চাইনে তার প্রমাণ,—ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ কর্‌বার জিনিষ নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ,—আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বলে "কাব্যশরীর"। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙ্গালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেহ প্রবেশ করিয়ে দিলে, ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ ভূপতির দেহে প্রবেশ করে' যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল,—সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করায় তার যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস কথাসরিৎসাগরে দেখতে পাবেন। বাঙ্গালীর স্কুলে-পড়ানো আত্মা কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে' পরের পঞ্জরে প্রবেশ লাভ কর্‌বার জন্য ছটফট কর্‌ছে, তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয়ই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনও ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন।"

আমরাও তেমনি বাঙ্গালী জাতির অজ্ঞান অবতার,—সম্ভবতঃ গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে;—কেননা সত্য লাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাসই জাতির পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার, মনের ও চরিত্রের জ্ঞান হারিয়েছি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক "আর্য্য" শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, বাঙ্গালীর ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হবে; কেন না আমরা মোক্ষমূলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য্য নই। আমরা একটি মিশ্র জাতি। প্রথমতঃ দ্রবিড় ও মংগলের মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয়। তারপর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্য্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' আমরা একেবারে আর্য্যমিশ্র হয়ে উঠিনি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্য্য-সভ্যতা, আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গলায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন—

"এই সকল আবর্ত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী"।

এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবতঃ আমি এই ক্রমাগত আর্য্য আবর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ;—কেন না আমি ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গলা ভাষা, আর্য্য ভাষা নয়,—উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা,—এক কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙ্গালী জাতিও আর্য্যজাতি

নয়,—একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী-খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য্য-সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমতঃ ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হলেও, বড় বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? ও ত খাদ নয়,—ওই ত হচ্ছে বাঙ্গালীজাতির মূল ধাতু! এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিম্বা উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়, তা যিনিই বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন, তিনিই মানেন। কাঁঠাল আম নয় বলে' দুঃখ করবারও কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বসাবার চেষ্টা করবারও দরকার নেই। আমরা এই বাঙ্গলার গায়ে হয় ইংরাজি, নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে, সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কাঁঠালের আমসত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙ্গালীজাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যেরা সব সহজিয়া মতের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে', যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জ্জন করি। আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি, আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্য্যামী করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলে, আমরা আবার সহজ অর্থাৎ natural হতে পারব। মনের এই সহজ-সাধন অতি কঠিন ব্যাপার; কেননা আমাদের সকল শিক্ষা দীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।

(৪)

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নমহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে—

"আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙ্গাইতে হইবে।"

এ যে শুধু কথার কথা নয় তার প্রমাণ, কি করে' সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারা যায়, তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মোট কথা এই যে, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা না কর্‌লে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে "সাহিত্য" শব্দের অর্থ সাহচর্য্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কিসের সাহচর্য্য? তার উত্তর—সকলপ্রকার জ্ঞানের সাহচর্য্য; কারণ অতি প্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য, অর্থাৎ ছেলেমানুষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে কালিদাস প্রভৃতি বড় বড় সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ শকুন্তলা,—অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা সংস্কৃত কাব্য আধ বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে' গণ্য করি, আর ধর্ম্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।

সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিন্‌কালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ কালিদাস, দান্তে, মিল্টন, গেটে প্রভৃতি। তবে পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ বোঝায়, তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি; কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য

প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে Synthetic Culture, তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাক্‌লে, কোনো বড় ইংরাজ কবি কিম্বা নভেলিষ্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে আর পাঁচজনের মনের আর পাঁচ রকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যাঁর মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না—সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক্ আর আধিভৌতিকই হোক্—তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে' তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশী বিলাতি সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞান অনুবাদ কর্‌তে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলস্যপ্রিয় বাঙ্গালীমনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরাম-জনক বিশ্বাসসকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত হবে না,—আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলঙ্কার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।

(৫)

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের ফ্‌লে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়,—তা হলে বঙ্গসাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুই পুষ্ট হবে।

সে মিলন যে কবে হবে তা জানিনে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে,—এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না; কারণ, সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মান-মন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙ্গা চাই।

আমি বৈজ্ঞানিক নই,—কাজেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্যেরা কেউ দুটি ভাল কথা বলেননি। তাই আমি তার স্বপক্ষে কিছু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূল জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর কর্‌তে হলে, ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কাণা, কান থাকতেও কালা,—অথচ মুখ না থাক্‌লেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাঙ্গলা-সাহিত্যের কোন মর্য্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার কর্‌তে হলে, ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে' তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে। অপরপক্ষে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে থাকলেও, যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না কর্‌তে পার্‌লে, কোনও পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ, সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা কর্‌বেন; তাঁদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন কর্‌তে হবে। কারণ

কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনও সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্ব্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনও পদার্থকে এক-হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোঁজে, সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক করতে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র,—হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে, তাকে আগে ভাঙ্গে, পরে আবার যোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে,—আর না হয়ত একভাগ অক্সিজেন আর দুভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে', সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে হাইড্রোজেনে পুনর্ম্মিলন করে দেয়।

কিন্তু আমরা এক-নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান;—এ জ্ঞানও একের জ্ঞান,—অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এ কথা তাঁরি কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেন না কোনরূপ আঁকের সাহায্যে কিম্বা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই,—সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই,—এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই। এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনরূপ স্বার্থসাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুঁজি, তা কখনও সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনও অহৈতুকী হ'তে পারে না। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজ সাধন, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন ;—কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের চর্চ্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব, বিজ্ঞানের পাকাখাতায় পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মূলে যে চির-রহস্য আছে, তা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপরপক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্ত্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলা ছন্দ *

* * * আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে ;—ইহা আমি অনেক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরাজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (Sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের

* কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্সন, আই, সি, এস মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে অধ্যাপকমহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত। বাড়ির কর্ত্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায় আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না কিন্তু এই সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভাল করিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছ-বিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝাল-মসলা বেশী করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা, পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথী রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

"অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।"

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্ত্তৃক পরম-প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

"পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।"

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন-কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে ত প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা। সকল শব্দই মাথায় সমান। বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ;—কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না।

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল-ক্ষেত্রে নদীর ধারা

যেমন স্বচ্ছন্দে চারিদিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সম-মাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজন মত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মত হইয়া পড়ে। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।

"কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

"পুণ্যবান" শব্দটি "কাশিরাম" শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হাল্কা ও ভারি দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে। যে সভায় চৌকি পাতিয়া মানুষ বসে, সেখানে প্রত্যেক চৌকির পরিমাপ সমান, সেই চৌকিতে যে মানুষগুলি বসে তাহারা মোটাই হউক, আর রোগাই হউক, সমান জায়গা জোড়ে। কিন্তু ফরাসের উপর গায়ে গায়ে যদি বসিতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক আপনার দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণমত স্থান

দখল করে। আমাদের পয়ার ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে কিন্তু সেই জন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি, ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে, যথা :—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়, যেমন :—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি!

কিন্তু এগুলি বাংলা-নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা :—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়্ উড়্ এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি "মানসী" নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্ত-বর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগান হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না; কিন্তু "কর্চ্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেই জন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মত মোটাসোটা

দখল করে। আমাদের পয়ার ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে কিন্তু সেই জন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি, ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে, যথা :—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়, যেমন :—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি!

কিন্তু এগুলি বাংলা-নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা :—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি "মানসী" নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্ত-বর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগান হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না; কিন্তু "কর্চ্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেই জন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মত মোটাসোটা

গোলগাল ; চর্ব্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্য-সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশী বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো-গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মত পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই ;—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মত চলে—তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চল্‌তি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্‌ সকল্‌ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বেগো ফুল্‌ ফুট্‌বে।
আমার্‌ সকল্‌ ব্যথা রঙীন্‌ হয়ে
গোলাপ্‌ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি একমাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশীর ফাঁকগুলি শিষা দিয়া ভর্ত্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না। * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা চলি সমুখ পানে

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে ?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য্য।

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর গিরি করবরে জয়
 যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
 সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
 বাধবে ওদের বাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
 পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান
 ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে',
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
 মরণ-সাধন সাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সেই জন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি; এফ,এ, পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নর-মাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা, সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্ব্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ

বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌ কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু এ কি করিতেছি? এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম? মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই ত জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু

যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে,—আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকাল বেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোট ছিল। অথচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী—দেশের প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিষ আমাদের সমাজে সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর অন্তে এক এক বছর করিয়া বড় হইতেছে তাহা আমার শ্বশুরের

চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না, যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ,—এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক কিন্তু আমি বলিতেছি সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, এইবার সত্যিকার পড়া পড়—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া!

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া, খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কম্পানির জবড়জঙ্গ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি সাড়ি। কিন্তু সমস্তটি লইয়া কি যে মহিমা সে'আমি বলিতে পারি না! যেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগকাটা

শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া; আর গালিচার উপরে সাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল—দুটা তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায় শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সাম্‌নে একটা অকাল চার পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্ব্ব লগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি;—আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্!

বিবাহ-সভায় চারিদিকে হট্টগোল—তাহারি মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে! আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। কাহাকে পাইলাম? এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে?

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশঙ্কর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার ইহার বেশি আশীর্ব্বাদ আর নাই।

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, বেহাই মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন, বলিলেন, বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।

মেয়ে বলিল, তাই বই কি! কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল তাহার প্রতি তাঁহার

বিশেষ আসক্তি; বাপকে সেই সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল—বাবা তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?

বাবা হাসিয়া কহিলেন, মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কি হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক্ কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়া মমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘট্‌কালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন—সংসারে তোমার ত ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরি পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও!

তিনি বলিলেল, যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মত এমন বিড়ম্বনা আর নাই।

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলিলেন—আমার মেয়েটির বই পড়িবার সখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড় ভালবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন্?

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক

হইতে অর্থ সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন তাঁহার মেজাজ এত খারাপ ত দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনি ভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইঁহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই ত বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহ-সভাতেই বুঝিয়াছিলাম দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয় অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু সে যে আমার সাধনার ধন ছিল—সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে ত এটা তাহার নাম নয় তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্য্যের মত ধ্রুব—সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কি হইবে গোপন রাখিয়া—তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কি অকলঙ্ক শুভ্র সে, কি নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড় মেয়ে, কি জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে! কিন্তু অতি অল্প দিনেই দেখিলাম মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার শাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ ত গেল একদিকের কথা—আবার অন্যদিকও আছে—সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাক্‌রি,—ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে—তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখটাকার গুজব ত একেবারেই ফাঁকি!

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণসম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে বাবার একটা ধারণা ছিল আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রীগোছের একটা কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাষ্টার;—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা: বাবার বড় আশা ছিল শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূরসম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।

আর এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপূ বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন ?

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—ওমা, সে কি কথা ! বৌমার বয়স সবে এগারো বই ত নয়, এই আস্‌চে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দিদিমারা বলিলেন, বাছা, এখনো চোখে এত কম ত দেখি না ! কন্যাপক্ষ নিশ্চয় তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে !

মা বলিলেন, আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না ?

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, নাতবৌ তোমার বয়স কত বল ত।

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না, বলিল, সতেরো।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি জান না।

হৈম কহিল, আমি জানি আমার বয়স সতেরো।

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্ব্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, তুমি ত সব জান ! তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।

হৈম চমকিয়া কহিল, বাবা বলিয়াছেন ? কখনো না !

মা কহিলেন, অবাক্ করিল! বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে কখনো না!—এই বলিয়া আর একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইসারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল—বাবা এমন কথা কখনই বলিতে পারেন না।

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?

হৈম বলিল, আমার বাবা ত কখনোই মিথ্যা বলেন না।

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ সব চলিবে না বলিয়া রাখিতেছি।

হায়রে তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া?

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কি বলিব?

বাবা বলিলেন, মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কি, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সে দিন দেখিলাম শরৎ-প্রভাতের আকাশের মত তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কি সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মত সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, আমি ইহাদিগকে চিনি না।

সে দিন একখানা সৌখীন বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, হৈম, আমার উপর রাগ করিয়োনা। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চ্চনা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল—সে বলিল, মা, বলিয়া দাও কি করিতে হইবে?

ইহাতে কাহারো মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয় কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, ওমা, এ কি কাণ্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে! এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড় বড় দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে ?

ঋষি বলে ! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা ! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন্, খৃষ্টানও নন্, হয় ত বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চ্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন শুনাইয়াছেন কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতাসম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালী বাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল—সে আমার ছোট বোন নারাণী। বৌদিদিকে ভালবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এসব কথা সঙ্কোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সঙ্কোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোট কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইসারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারাণীর কাছে শুনিয়াছি শ্বশুরবাড়ির কথা কি লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই? এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম—তোমার বাবার চিঠি আর কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোষ্ট করিয়া দিব।

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপূর মাথা খাওয়া হইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কি?

সে ত বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালবাসি, তাহার

দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি, এ, ডিগ্রি অকাতর চিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক ত হৈমর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সঙ্কীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে দেওয়া এক একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হূহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কি দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব?

আমাকে ত কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টক-শয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর কাল অন্তরে বাহিরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে! কি নির্ম্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না,—তাহা আমার

নিজের মধ্যে কোথায় ? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্ব্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্ব্বাক্ মনের কথা হয় ; এবং এক একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই ; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম কি করি ? শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, বৌয়ের শরীর ভালো নয় তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।

বাবা ত একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব্ব স্পর্দ্ধায় আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তখনি তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলি বৌমা তোমার অসুখটা কিসের ?

হৈম বলিল, অসুখ ত নাই।

বাবা ভাবিলেন এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্যে।

কিন্তু হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এ কি ? হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর ? অসুখ করে নাই ত ?

হৈম কহিল, না।

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই বলা নাই কহা নাই হঠাৎ আমার

শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিলেন না, কেমন আছিস? আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—বুড়ি আমার সঙ্গে যাবি?

হৈম কাঙালের মত বলিয়া উঠিল—যাব।

বাপ বলিলেন, আচ্ছা সব ঠিক করিতেছি।

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এবাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা ত ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুসি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেহাই, আমি ত কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—

বাড়ির মধ্যের উপর বরাৎ দেওয়ার অর্থ কি আমার জানা ছিল। বুঝিলাম কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বৌমার শরীর ভালো নাই! এত বড় অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।

বাবা হাসিয়া কহিলেন, হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো ত সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা?

আমার শ্বশুর কহিলেন, জানেন ত উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার—উঁহার কথাটা কি—

বাবা কহিলেন, অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, হৈমকে আমি লইয়া যাইব।

বাবা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—বটেরে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন—স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই ত হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্ম্মের কাছে সত্যধর্ম্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি

দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে? জান তোমরা, যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই ত সেদিন, লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি! বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জ্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত?

পিতায় কন্যায় আর একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এই-বারেও দুই জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারো পরে কি হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয় ত একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে! কারণ, —থাক্ আর কাজ কি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গমনাগমন

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন; এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"সে স্থানে কি দর্শনীয় আছে!" মিশনারিটি সেই ধরণের লোক, গির্জ্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক কিছু! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে—এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম,—ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরী সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছরকতক পূর্ব্বে আমি "পুরীর পত্রে" শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটরগাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয়, পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবী পিয়ানোবাদ্যের টুং টাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে!

সুতরাং মোগলাই জোব্বার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবী সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয় ছয় কালা আদ্‌মি যে পাল্কী-বেহারা তাহাদের সঙ্গে একেবারে পূব মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম—সুরুচির এবং ভদ্রতার কোন দোহাই না মানিয়া। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন

ঘনাইয়া আসিল যে, মনে হইল, বুঝিবা পাদরী সাহেবের অভিশাপ ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ,—বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মত দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই;—রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা,—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জ্জন স্বপ্নের প্রায়—পাই কি, না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলো'কে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে, সেখানে কিছুই নাই;—অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয় ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জ্জীব নহে সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারিদিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনিঝিনি,—দূরে অদূরে কাহাদের নূপুর-শিঞ্জিনীর মত তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে,—তাহা কানে আসিতেছে না সত্য; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে,—চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময়ে একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক যাত্রার প্রথমেই এই যে শিশুর মত ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ,—নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ—ইহাতে প্রাণ যেন

দুলিতে থাকে,—মনেই আসে না, একা চলিয়াছি! চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত দুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুঘাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে;—মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্র তারকা আচ্ছন্ন; নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি;—কোনোদিকে সাড়া শব্দ নাই! মনে হইতেছে এ কোথায় আসিলাম,—কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে পায়ে অর্দ্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী! এসময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও একটা কিছুকে দেখিবার জন্য, প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাল্কীবাহকদের করুণ ক্রন্দন-গান শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই বা চলিয়াছি তাহা আর মনে আসিতেছে না;—শুধু বোধ হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলি তালে তালে পা ফেলিতেছি—“পহর রাতি, পান বিঁড়িটি! পান বিঁড়িটি, পহর রাতি!”

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর রাতি, পান বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে।

মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে! চারিদিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে;—মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে! কাছে আসিতেছে সকলি—গাছ পালা গ্রাম নদী; কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে,—কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না!

দর্শন আকর্ণন এবং নিরাকরণ—এ তিনের অভাবের মধ্যে 'নিয়াখিয়া' নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চকিতের মত রাত্রির গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায়; পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি,—অদূরে অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোট গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চিরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়া ঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্যময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্য-পথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলি আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলি মনে হয়—আর কতদূর,—আর কত প্রহর—এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব!

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমনি করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনোদিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না,—আপনাকে গুটাইয়াসুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে।

ঘুমাইয়া পড়িবার—আপনাকে এই বিশ্বজোড়া বিলুপ্তির মধ্যে বিনা আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় খোঁয়ারী আসিয়াছে; যেন একটা শীতল মুষ্টি, প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে—জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে—সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ অবসাদ! দেখিতেছি যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই—পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মত নিশ্চল মন, একটা খট্ খট্ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্কীর তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহকদের দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া, আলো-আঁধারের স্রোতের মত, অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, কালো এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্কী নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে! সমস্ত দেহ মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না। চারিদিক এমনি নীরব, স্থির ও স্তিমিত যে, মনে হইতেছে একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্যপটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে! মন্দিরের পিছনে,—আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র কম্পন নাই; তলদেশে,—পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রং হলুদের প্রলেপের মত লাগিয়া আছে —অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত

মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট দেখিতেছি—কিন্তু অবিচল, অবিকল, ছবির মত।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম, পাল্কীতে আসিয়া বসিলাম, বাহক আসিল, পাল্কী চলিল—এত গভীর নীরবতার মাঝখানে, যে, মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌঁছিয়াছি যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে স্থূলে সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কিনা এ কথাটা জানিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু পথ বাহিয়া, পায়ে পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি, সেই সময়ে সহসা খোলকরতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমনি করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল, যে, মনে হইল বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একসময়ে এই শব্দতরঙ্গের ঝনঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রণরণ করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী—আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘাট—পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্ত্তনের সুর, যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মত, আমাদের নিকটে পৌঁছিতেছে—অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে ক্ষণে! পাড়ি দিয়াছি যে-ঘাট হইতে, তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি ;—পাড়ি দিতেছি যে-পারে, তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই ;—মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে—আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপূর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো—সে এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দহীন ধূসরতার মাঝে, ক্ষণেকের জন্য আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহুপথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তারপরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মত সেইদিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে—নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোতিমন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশেপাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর কালো সমুদ্রের সাদা আলো,—মায়ার প্রাচীরের মত, অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে!

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে। কালোর দুন্দুভি, আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে,—দিকে দিগন্তে, সীমে অসীমে! এই জ্যোতির্ম্ময় ঝন্‌ঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান, শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে—বরুণ দেবতার অনুচরগণের মত, —নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায়! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না!

বালুতট ওদিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এদিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি—আলো-আঁধারের, ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে প্রহর-শেষের নিশ্চল ধূসরতা

দিয়া গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া, যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে—অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী উষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে! একাকী এই জন্ম-রহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটিমাত্র বুদ্বুদ—অখণ্ড অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্‌ করিতেছে! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণ-বিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর জলোর্ম্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া! পূর্ব্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্র-তরঙ্গ বহিয়া তাহারি প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল, রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল; মৈত্রবনের শিখরে কোণার্ক মন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গ দেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি—কত যেন ক্ষুদ্র! সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া, তাহারি শক্তিতে ঊর্দ্ধে বাড়িয়া আপনাকে চিরশ্যামল, চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্দ্ধে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই;—আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

জরাজীর্ণ, বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত আভার মোহ সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন ভাব মনকে যেন লোহার মত শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি—চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াইগণ্ড পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া—মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ-বশে,—চুম্বকের টানে লোহার মত। মন টানিতেছে! ঐ বটচ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ঐ চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ঐ ঝরিয়া-পড়া, ঝুঁকিয়া-পড়া বালুশয়ানে শুইয়া-পড়া রাশি রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতিটির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে-মুহূর্ত্তে কোণার্কের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি মন সকলি, অগ্নিশিখার চারিদিকে পতঙ্গের মত, আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে,—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন—বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্ত্তিহীন অনঙ্গ দেবতার রত্নবেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান্ অশ্বের মত

বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মত,—শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারি শিখরে—এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস-শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি—উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে ;—আর একবার সংসারের দিকে, সুরুচি কুরুচি শ্লীল অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্দ্ধ-নিমগ্না পড়িয়া আছে সে—পাষাণী অহল্যার মত সুন্দরী ;—নীরব, নিস্পন্দ,—মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তব্যাপী প্রতীক্ষার মত, শতসহস্রের গমনাগমনের একপ্রান্তে, সুদুর্ল্লভ একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

গত মাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনও টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ—

"যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য,—তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটীকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্ত্তাকর্ত্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা সেই টীকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।"

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম, যদি না আমার জানা থাকত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্ত-ঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অসায়েস্তা, অতএব শাসনযাগ্য। এ উভয়কে জুড়ীতে যুতলে আর বাগ মানান যায় না ;—অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে, পরে পরাজিত কর্‌তে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে ;—অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না! শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই ; কেননা প্রকৃতির ধর্ম্ম মানবধর্ম্মশাস্ত্র-বহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্‌তে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির

উল্টো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এদেশে লোকে যে, যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্ত্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানব-জীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনো রকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান্ যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপর পক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই; বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্চে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্চে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্চে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক দিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে এক-দিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাষ্টার; সমাজে এক দিকে বাল্য-বিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু; ধর্ম্মক্ষেত্রে এক দিকে শুধু "ইতি" "ইতি", অপর দিকে শুধু "নেতি" "নেতি";—অর্থাৎ এক

দিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে ;—ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে ; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে ;—শুধু মধ্য নেই।

বার্দ্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেল্‌লেও আমরা তার মিলন সাধন কর্‌তে পারি নি ; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে, তা নেই বল্‌লেও, তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বল্‌লেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না এবং আত্মাকে ছায়া বল্‌লেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনও কোনও সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দেই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য্য। গুপ্ত জিনিষের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে, যৌবনকে গোপন করে রাখ্‌তে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life. —ইংরাজি-সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্য্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে-ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ এবং মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিম্বা দ্রষ্টা কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগান এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগান। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে—"যদি বিলাস কলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।" এক কথায়, যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবাস্তর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতম-বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ

করে, পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়নি, তা নয়;—তবে ললিতবিস্তরকে আর কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না; এবং অশ্বঘোষের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, যথা, ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা শুন্‌তে ও বলতে ভালবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না, যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে—রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়ন-ধর্ম্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন করতে পারে না বলে, কিছু বর্জ্জনও করতে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে, কিছু ছাড়তেও পারে না;—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে, এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে

সংস্কৃত কাব্য 'বয়কট' কর্‌তে বলছি কিম্বা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে-যৌবন-ধর্ম্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানব-ধর্ম্ম—এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল তাও অস্বীকার কর্‌বার যো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে এক-রোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূলশরীরকে অত আস্কারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এতে বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন পদার্থ টি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতি-শত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক্, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পারের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী; এক দিকে পত্তন, অপর দিকে বন; এক দিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয়;—এক কথায় এক

দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনও পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা !" এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশী অসংযত।

যারা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ—এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন, রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি Solomon। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন এবং তাকে পদদলিত করতেও সঙ্কুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে উঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা

যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাঁটার সময় পাঁকে পড়ে' গত-জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই, যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন, তাহলে তিনি, যে কাব্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা কর্‌তেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাক্‌ত তা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারিনে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে ;—কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক সকলেই এক-মত।

"যৌবন ক্ষণস্থায়ী"—এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সঙ্গীত পরিপূর্ণ।

"ফাগুন গেয়ী হয় বহুরা ফেরী আয়ী হয়
গ্যায় তো জোবন ফেরি আওত নহি।"

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপশোষ রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার

উদ্দেশ্যেই এদেশে যৌবন, শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্য-বিবাহের মূলে হয় ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্ত্তমান। জীবনের গতিটি উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর সব দেশে, লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারি সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয়, সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয় বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চ্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই অপর সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে, মানব-সমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহঙ্কার করবার আছে এমন ত আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন;—ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানব-সমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

এ বিচার কর্‌বার সময়, এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানব-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও, দেহ মনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে, মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাক্‌লেও, দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ কর্‌তে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌ব। দেহ সঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন, অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার যো নেই;—কিন্তু একের মনের যৌবন, লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণ-শক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা কর্‌ছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্চে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম্ম, যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্চে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের

গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা— দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণী-জগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্ম-জগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক— প্রাণ-শক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও, আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের অবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী কর্‌তে হলে, শৈশব নয়—বার্দ্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার কর্‌তে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের

অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই এক মত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে তার অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে, যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

বীরবল।

তৃতীয় সংখ্যা] আষাঢ় ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে',
কেমন করে সইব?
বাতাস আলো গেল মরে'
এ কি রে দুর্দ্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চলবি যারা চল্‌রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক!
ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ!

চলেছিলেম পূজার ঘরে
          সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
          কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
          হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
          তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা ?
          এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্ত-জবার মালা ?
          হায় রজনীগন্ধা !
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
          লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
          নীরব তব শঙ্খ !

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ !
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ ।
নিশার বক্ষ বিদার করে'
উদ্বোধনে গগন ভরে'
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক !
দুই হাতে আজ তুলব ধরে'
তোমার জয়শঙ্খ ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে ।
জানি শ্রাবণ-ধারাসম
বাণ বাজিবে বক্ষে ।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পালঙ্ক ।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্য্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকীব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্ত্তী হইয়া বসে। তমালতালীবন-রাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর

সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্ব্বদিগ্বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্ব্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তল্পি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই ত শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্‌কা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই ত পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাৎ জোড় মেলাইবার জন্য। তাহারা জানেনা বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে

দুই দিয়া ভাগ কর—৩৬ পর্য্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সঙ্গীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-সয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনো-মতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না;—সেই ত নৃত্যপরা উর্ব্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সাম্‌লাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড় ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের তিন মূর্ত্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিষ একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া

নাড়াচাড়া করাতেই তাহার সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারি সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মত মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত।

এই জন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্ম্মেও অধিকার

নাই ; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে ;— কর্ম্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা-ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কাজ-কর্ম্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কীর বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দ্দা-নসিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দ্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দ্দা থাকে না। বাদলার কর্ম্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্ত্য হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিনীর পক্ষে বড় সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবী লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে ?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেণ্ট্ আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্ট্‌মেণ্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবী। সরকারী হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

মনে কর, খামখা এত বড় আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে ত কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্য্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারো কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিষ যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবী করে; সেই জন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতি-কাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্য্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সঙ্গীতের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা সঙ্গীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে, হেমন্তে, ভরা-মাঠ, ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিষ নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ু-মণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ু-মণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের

অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে ? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ঐ শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে ; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে ; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কি কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ ; সেই জন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক্ অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থ-পিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইসারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই নানা

রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্ব্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্য হৃদয় অবকাশ দাবী করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবীটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ--পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলি

যে সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ ত সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের

যে ভয়ঙ্কর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখ ঐ নক্ষত্র-মণ্ডলীর আবর্ত্তনে, দেখ যুগযুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা "আষাঢ়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল-কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে-কথার পণ্য! অন্যায় মনে করে না। সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্ম্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এস সমস্ত ক্ষ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম্ম নয় এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্ব্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী ত নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক্ সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয় সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া এক-ঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই ত স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জ্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারিদিকে যে টোল খাইয়া যায় বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চ্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে।

আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে—আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে; অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দরজির দোকান বানাইয়াছে ইহার মত এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুইচার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল—আমার ঠাকুরকে দিলাম।—বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

আমি এমনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসররৌদ্রে ল্যাজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীব-লীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সে বার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দীবোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না, অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, আচ্ছা এইখানে নিয়ে আয়!

বোষ্টমী পায়ের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম সেই আমার পূর্ব্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে

চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কি-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড় বড় চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিষকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, এ আবার কি কাণ্ড? আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন? তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল!

বুঝিলাম গাছ-তলায় এ আমাকে অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দ্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েক দিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি—তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। বলিলাম, উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।

বোষ্টমী ভারি খুসী হইয়া গৌর গৌর বলিয়া উঠিল। কহিল, ভগবানের ত শুধু রসনা নয় তিনি যে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।

আমি বলিলাম, চুপ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্ব্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই সহর ছাড়িয়া এখানে আসি।

বোষ্টমী কহিল, সেটা আমি বুঝিয়াছি তাই ত তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিলাম আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড় বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মাঠ ধূ ধু করিতেছে। পূর্ব্বদিকে বাঁশ-বনে ঘেরা গ্রামের পাশে আখের ক্ষেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্‌নে সূর্য্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘনছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা-মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য্য উঠিয়াছে কিনা জানিনা। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মত গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপ্‌সা-আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্ত্তির মত করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূবদিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মত একসময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল, এবং ঐ সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্ম্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মত আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্ করিতে

করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।

আমি বলিলাম, সে কি কথা?

সে কহিল, কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কি ছিল জানিনা কিন্তু আমি খাইয়াছি।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমার বিলাত-যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কি খাইয়াছি, না খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সঙ্গত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার ত কোনো দরকার ছিল না।

আমি বলিলাম, লোকে জানিলে তোমার উপর ত তাদের ভক্তি থাকিবে না।

সে বলিল, আমি ত সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল আমার এইরকমই দশা।

বোষ্টমী যে-সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো, এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার

ইচ্ছা মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার চলে কি করিয়া ?

উত্তরে শুনিলাম তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আমার ত সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি; আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কি দরকার ছিল বল ত।

সহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষা-জীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথি-পড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না—আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল—না, না, এই আমার ভাল। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর ঘরে মনে হয় আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয়

না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সবচেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরীবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি তাই বলিলাম, এই সকল দুর্ম্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো কর তাহা হইলেই ত ভগবানের সেবা হইবে।

এইরকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালবাসি। কিন্তু বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, তুমি বলিতেছ ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই ত?

আমি কহিলাম, হাঁ।

সে বলিল, উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই কি! কিন্তু আমার তাহাতে কি? আমার ত পূজা ওখানে চলিবে না—আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কি হইবে? সত্য যে চাই। ভগবান সর্ব্বব্যাপী এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড় বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও ত কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার একি আশ্চর্য্য প্রণালী!

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন? যখনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!

আমি বলিলাম, যে লোকটা কোনো কর্ম্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া-থাকিতে দেন না পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজা-জোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া!

হাতজোড় করিয়া সে বলিল, গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কি ঠাণ্ডা! কি কোমল! কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে ত খুব হইল।

তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? প্রভু, এ আমার মোহ নয় ত, ঠিক করিয়া বল!

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্ব্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও!

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া কতক্ষণ মাথা নত করিয়া একান্ত স্নেহে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, তুমি চাহিয়া দেখনা বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মত প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, পাগ্‌লি, কাকে ভক্তি করিস্

তুই ? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে। হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয় ?

কেবল একমুহূর্ত্তের জন্য মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায় !

বোষ্টমী বলিল, বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এ ত তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন ! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো ?

আমি বলিলাম, আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয় ত একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।

বোষ্টমী কহিল, মানুষের মনে বিষ যে কত সে ত দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।

আমি বলিলাম, মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্ব্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।

বোষ্টমী কহিল, দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্য্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যা-তারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল---বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।

আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে

ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয় সে ভালবাসা—এমন ভালবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কি সুন্দর রূপ তাঁর!

(বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন গুন করিয়া গাহিল—

অরুণ-কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।)

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন—তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেই

জন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশিতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই। পাড়ার সই-সাঙাতীদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কি হইতে পারে? আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরী নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা—আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মত তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্প-বয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না।

নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্ব্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না এই জন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসিত। সে যেন বুঝিত সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারৎপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁশেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসিগে।

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দীঘিটা প্রাচীন

কালের—কোন্ রাণী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রাণী-সাগর। সাঁতার দিয়া এই দীঘি এপার-ওপার-করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কুলে কুলে জল। দীঘি যখন প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, মা! ফিরিয়া দেখি খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, আর আসিস্‌নে, আমি যাচ্চি! নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কি দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দীঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মত থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম কিন্তু আর সে মা-বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন ত ভালো হইত কিন্তু তিনি ত কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলে-বয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধূলা

করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলে-বয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথী, ইঁহার সাম্‌নে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না!

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে ত হয় না। আমার কাছে সে সব কথার যা কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন—অমন সুধাপাত্র ত তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ত সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্ব্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মত ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহার-বিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদ পাইব প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র—সেদিকে ত তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুসি করিতে পারি তাহাতেও এতদিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুসি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ তখন তিনি ভাবিতেন গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুসি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্ত্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়া-পথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আম-তলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্ একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়সড় হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, তোমার দেহখানি সুন্দর।

ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলি নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্দী নাই কেন?

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্য্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর-ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মত ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া

দেখি আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রং ধরিয়াছে—তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, আর আমি সংসার করিব না।

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ কর। আমি বিদায় লইলাম।

স্বামী কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ ? তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল ?

আমি বলিলাম, গুরুঠাকুর।

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ; গুরুঠাকুর ! এমন কথা তিনি কখন্ বলিলেন ?

আমি বলিলাম, আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন আদেশ কেন করিলেন?

আমি বলিলাম, জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন ত তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

স্বামী বলিলেন, সংসারে থাকিয়াও ত সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।

আমি বলিলাম, হয় ত গুরু বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, চল না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়ালের জন্ম

(Terza Rima)

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার, জাতে আফ্‌গান।
দিনে তাঁর নিত্য দোল, রাত্তিরে দেয়ালী ॥

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচ গান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্ত্তকী দুবেলা দিত রূপের যোগান ॥

ঘিরে তারে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ, কারো বা রবাব,—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী ॥

কারো হস্তে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,—
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব ॥

সেকালে কেবলি ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ,—
ছয় রাগ হয়েছিল এত দরবারি,
এক পা নড়িত নাকো, বিনা পাখোয়াজ ॥

সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি,
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর,—
দুহাতে উঁচিয়ে ধরে' তাল-তরবারি ॥

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর,
বসেছে ইয়ার যত আমির-ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর ॥

দাড়িগোঁফে কেশেবেশে হোমরা-চোমরা
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান্।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা !

সহসা বিরক্তস্বরে কহে সুলতান্,—
"শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান !

ভাল আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার।
সুরু করে দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার !

বিলম্বিত তালে যবে করগো বিলাপ,
মূর্চ্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্চ্ছাকে জিনিয়ে,—
নয়ত দূনেতে বকো সুরের প্রলাপ ॥

যে গান দুবেলা গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে,
সে গানে জমক আছে, নাইকো চমক।
তাল হতে নারো নিতে সুরকে ছিনিয়ে ॥

কারিগরি করে' যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,—
রাগ যেন রাগিণীকে দিতেছে ধমক !"

গুণীগণে পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব !
হেন সাধ্য নাহি কারো দুটি কথা কয় ॥

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙিয়া,—
মুহূর্ত্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ভ ॥

নর্ত্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া,
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
মুক্ত হল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া ॥

বাদশা কহিল পুনঃ, রাঙা করি মুখ—
"নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত-নায়ক
যে পারে স্থজিতে গীতে নতুন কৌতুক ?

সভাপ্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর,—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক ॥

জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল "হুজুর !
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্ধন,—
সার জানি দুনিয়ায় সুরা আর সুর ॥

অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,—
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন ॥

বাঁধা রাগ, গাঁথা তাল, এই দুই কুল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল !"

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর, মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপিয়ার তান ॥

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিট্‌কারি,
যুবকের কণ্ঠ হতে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিট্‌কারি ॥

অবাক বাদশাজাদা, না পড়ে পলক,
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে, বিক্ষিপ্ত অলক !

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক্ ভেবে আত্মহারা !

শিহরিল নর্ত্তকীর কর-কিশলয়,—
স্ফুরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মণির বলয় ॥

শিকল ছিঁড়িয়া সুর, ভাঙিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল,—
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ ॥

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল।
নেশায় বাদশা হাঁকে—"বাহবা বাহবা।"
ধ্রুপদীরা কহে রেগে—"ডাকিছে শেয়াল !"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২৯শে মে, ১৯১৪।

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিম্বা স্বজাতির নাম উল্লেখ কর্‌বামাত্রই, একদলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন—ও সব কথা উচ্চারণ কর্‌বার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে' কোন-একটা বিশেষ দেশ নেই, এবং ভারতবাসী বলে' কোন-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ, এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার কর্‌বার জন্য পায়ে হেঁটে তীর্থ-পর্য্যটন কর্‌বার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্রখানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার কর্‌বার জন্যও সেন্সস্‌ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই; চোখ কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—

আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের Utopia, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্ব্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্ম্মর প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রজত সৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎলাভ করেছেন—তিনি আকাশরাজ্য হতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও-ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু, বাস্তবজগতের অজ্ঞতা-বশতঃ নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতঃই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনা-রাজ্য কখন কখন কালকের বাস্তব-জগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখন কখন ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য করে তোলা—অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোন লক্ষ্য না থাকায়, দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নির্জ্জীব, এবং ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্ব্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য ideal unity, এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট ideal-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত Utopia ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই ideal-কে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরাজি সংবাদপত্র, অপর দিকে

বাঙ্গলা সংবাদপত্র, এই ideal-টিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন। উভয়েই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশী-শিক্ষালব্ধ, এবং সেই জন্যই স্বদেশী-ভিত্তিহীন—কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। ইংরাজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়, বহু; এবং যা গোড়া হতেই পৃথক, তার আর কোনরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর কর্‌তে পারে। অপরপক্ষে বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ সতরঞ্চের ঘরের মত চক-কাটা। এবং কার কোন্ চক, তাও অতি সুনির্দ্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে, কে সিধে চল্‌বে, কে কোণাকুণি চল্‌বে, কে এক-পা চল্‌বে আর কে আড়াই-পা চল্‌বে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে ঐক্য চান, তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই—সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা কর্‌তে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজ-তরী কোণাকুণি চলে তীরে আট্‌কে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই-পা'র পরিবর্ত্তে চার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং

ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের ideal-এর ভিত্তি আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবতঃ রাধাকুমুদবাবু দুহাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

(২)

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার কর্‌তে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনও ঐক্য ছিল না। মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও জীবন-বৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে' এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশ-কুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বর-বাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে, বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে, এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন ও পালনকর্ত্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ।

অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানারাজ্যে বিভক্ত, এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশ-দেশে বহু দেবতা এবং উপ-দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণতঃ মানুষে, মর্ত্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্ব্বপক্ষ একেশ্বরবাদী, সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক,—এবং যে দেশের পূর্ব্ব-পক্ষ বহু-দেবতাবাদী, সে দেশের উত্তর পক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না; কিন্তু বহুকে মায়া বলে' তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তর-মীমাংসার সার-কথা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এই অর্দ্ধ শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ, এবং শঙ্কর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ —এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্ম-জ্ঞান কর্ম্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মার যতটা চর্চ্চা করা হয়, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চ্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক ধর্ম্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বল্‌তে পারেন। সমাজ-ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোহং হচ্ছে Individualism-এর চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্ত-মত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও

সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি,—প্রতিহত হয়েছে। বেদান্তদর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়,—প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ কর্ম্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবাদ ;—এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে, জীবের এই স্বরাট-জ্ঞান শুধু বিরাট অহঙ্কার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে এ কালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবন সূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগা-চাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী, আর একজন শুধু উদাসীন,—পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্য্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুসি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীতসম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই

আছে; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার করতে চাই তা সেখানে পাই ত ভালই; না পাই ত, না পাই।

(৩)

জীবের অহং-জ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে, জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্ম-জ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হ'লেও যে একদেশ, এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্ততঃ দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য। তারপর, এদেশ অসংখ্য যোজন বিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-ক্ষেত্র বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবতঃ এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হত। রাধাকুমুদবাবু দেখিয়েছেন

যে, এই স্বদেশ-জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি ;—সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র, প্রতি নদী—তীর্থ, প্রতি পর্ব্বত—দেবতাত্মা। কিন্তু এই ভক্তি-ভাব আর্য্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চ নদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্ব্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম্ম নয়, লৌকিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারত-বর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্ম ; বিদেশী বিজেতা আর্য্যদের ধর্ম্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে, সেই হচ্ছে অন্নদা, এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রস-সঞ্চার করে, সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এ সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জ্জন হয়। "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে" একথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদবাসী আর্য্যেরা মন্দিরও

গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগ ছিল, সেই যুগেই এই স্বদেশ-জ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অবৈদিক ধর্ম্ম, এবং সার্ব্বজনীন বলে' তা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যদের গৃহধর্ম্ম, বড়-জোর কুলধর্ম্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্ম্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশানকোণ ব্যতীত আর সকল-দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবতঃ ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-প্রভৃতি সংস্কৃত দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্ততঃ আকাশের দেবতারা যে, মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্ম্মভাবের জন্ম। আর্য্যেরা যে কস্মিনকালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চাননি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত-এবং-আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিম্বা আর্য্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মনিরত আর্য্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্য্যভূমি,—বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্য্যদের এই স্বজাতি-জ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশ-জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের

পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডুষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতী-আর্য্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে "The Land we live in"-এর নামোচ্চারণ করে সুরার আচমন করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মনে দেশ-প্রীতির চাইতে আত্ম-প্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন কোন বিরুদ্ধপ্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যা'তে করে আমার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

(৪)

ইংরাজ যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন তা নয়; আজ দু-হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়া-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। একথা শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই জানা না থাক্, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন,—তাঁর পুস্তিকার মৌলিকত্ব এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনা পরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে' উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিম্বা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখন মুখে আনেননি; বরং বৌদ্ধাচার্য্যেরা যখন বেদের কোন উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভুত হয়েছে এই দাবী করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা

কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয়, তা বৌদ্ধযুগে ব্রাত্যদেশে শূদ্র-ভূপতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল। এবং অশোক, সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয়, ধর্ম্মচক্রেরও স্থাপনা করে, সসাগরা বসুন্ধরার সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক-মনে পাওয়া যাবে কি না—সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন একরাটের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিম্বদন্তী আছে,—সেই কিম্বদন্তীর সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোন ঘটনা না হোক্, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদবাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মনোভাব উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক-দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না; অতএব কোন বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে, তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর

মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাঙ্গলা অনুবাদ আছে; তারি সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। "সম্রাট" কাকে বলে' তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে:—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান-অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা "সম্রাট" নামে অভিহিত হন।"—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮শ অধ্যায়।)

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এস্থলে মাগধ-সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয়, তাহলে প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান্ যে, ঐ সকল নাম উচ্চ-নীচ-হিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐ সকল নাম হচ্ছে পৃথক পৃথক দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল-দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোন কোন দেশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের রাজা—সম্রাট। দক্ষিণদিকে সত্বৎগণের রাজা—ভোজী। পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট্। উত্তরদিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং উর্দ্ধদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশ-ভেদ-অনুসারে সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল,—পদমর্য্যাদা-অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট, একসঙ্গে স্বরাট, বিরাট, সম্রাট, সব রাট হতে পার্‌তেন,—অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশ-দেশের রাজা হতে পার্‌তেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। রাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুনরভিষেক, ঐন্দ্র মহাভিষেক,—এসব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হতে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে, পুরাকালে যাঁরা একরাট পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হতে তুলে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত রাজাগণের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে,—কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে, ঐন্দ্র মহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্র-বাঞ্ছিত পদলাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুণ আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয়, এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারিনে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দ্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দ্দটি তুলে দিতেন, তাহলে পাঠকমাত্রেই ঐতরেয়

ব্রাহ্মণের কথা কতদূর প্রামাণ্য তাহা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্র মহাভিষেক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হত ঃ—

বদ্ধ শতকোটী গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হলেও, গ্রহীতা আরও বেশি দুর্লভ। এত গরু ঘোড়া ও বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধহয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদয় হত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের কোষ-বৃদ্ধি, এবং অধিকার-বৃদ্ধির প্রতি লোভ ছিল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তর-মন্তর-যাদুতে বিশ্বাস করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ শত্রু নাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্ব্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা Spencer-এর বিলেতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি, Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে পান করে, তৃপ্তিও লাভ করি, মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। Bismarck-এর জর্ম্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে

গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও হাতায় এ জিনিষ কিছুতেই ধর্‌বে না। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপারসকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা কর্‌তে পারি, এবং চাই কি তাতে কৃতকার্য্যও হতে পারি,—কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, তদুপরি ইংরাজি ভাষার সাহায্যেও তার "আধিরাষ্ট্রিক" ব্যাখ্যা কর্‌তে পারিনে।

(৫)

এতদিন, প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ কর্‌বামাত্রই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন, এই সকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদিত হত, এবং বঙ্গসাহিত্যে তারি গুণকীর্ত্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ কর্‌তুম। Imperialism-নামক আহেল-বিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে কেউ বল্‌লে তার উপর আমরা খড়্‌গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত কর্‌ত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ Imperialism-এর উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝল্‌সে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে, সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখ্‌ছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে, তখন আমরা এই প্রাচীন

Imperialism-কেও খুঁটিয়ে দেখ্‌তে পার্‌ব, এবং কৌটিল্যকেও জেরা কর্‌তে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন,—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারি ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আর্য্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থশাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ Law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে এই lawএর মূল হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ legislation যে ধর্ম্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন্‌। অপরপক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল-ধর্ম্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনই মেনে নেন্‌ নি,—কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্য্য ঋষিদের স্মৃতি,—তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্য্যদের কুলাচার,—তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে—"পারম্পর্য্যক্রমাগত" আর্য্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র Law। যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ কর্‌তেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্যকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রাহ্য কর্‌তেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই, চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও

কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবতঃ আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংস-ব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধহয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্য্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য-গঠনে নয়—সমাজ-গঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে বাণিজ্যে নয়—চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বল্‌তে হলে "পৃথিবীর সর্ব্ব-মানবকে" আর্য্য-আচার শিক্ষা দেওয়া, এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে এক-সমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু সমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্য্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁরা যে দুর্গ-গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, অভিধানে, ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—যে ভাষার তুলনা জগতে নেই, সেই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা যে, সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই; কারণ বর্ত্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, Political problems-এর অপেক্ষা Social problems-এর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়ই হো'ক বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। Hamlet, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার যো নেই। কিন্তু, সঙ্গীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে এদেশে আর্ট, কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগ-রাগিণীর স্ফূর্ত্তির ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তিনিও জানেন যে ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল, আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে—সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিক-পত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তা ছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে, তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে

রাখ্‌তে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখ্‌তে আমার ভর্সা হয় না এই কারণ যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনও শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাঙ্গলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, এ কথা আমি অস্বীকার কর্‌তে পারিনে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিল্‌লে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিল্‌লে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোন কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তাহলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে, পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপূর করে তুল্‌তে হলে, মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্ম্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী,—শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা ; দামোদর নন্ যে, শব্দের বন্যায় বাঙ্গলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাক্‌তে হচ্ছে। অবশ্য দরশ, পরশ, সরস, হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলান যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে

আছেন। আমি যদি ঐ সকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তাহলে আমার চুরিবিদ্যে ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্য্যবৃত্তি কিনা—সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্য কবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃক-সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্য্যোপযোগী করে ব্যবহার কর্‌বার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ ও-সব কথার আর কিছু পেটেণ্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার কর্‌লে চোর-দায়ে ধরা পড়্‌ব, বিশেষতঃ যখন তাদের কোনও বদ্‌লি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে তাকে আর চাপা দিয়ে রাখ্‌বার যো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত কর্‌বে। নব্য কবিদের আর একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন, তাহলে পরবর্ত্তী কবিরা তা ব্যবহার কর্‌তেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুণ সে সুযোগ হারিয়েছি বলে, আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্য-জগতের এমন কোনও নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য কর্‌লেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর একটি বাধা আছে। কলম ধর্‌লেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন;—বাকী যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিম্বা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্ত্তির বর্ণনা কর্‌তে উদ্যত হই, তাহলেও বড় সুবিধে কর্‌তে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো,

রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাকবে কিনা তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার, এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেই সব আনুষসঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখী-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দ্দুর বক্তা,—চকোর আকাশ-দেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে' ফটিকজল শব্দ আর মুখেও আনে না। যে সকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখী—যথা বক, হাঁস, সারস, হাড়গিলে ইত্যাদি—এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, এরা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্য্যন্ত নয়। তারপর কাব্যের উপযোগী ফুল, ফল, লতা, পাতা, গাছ, বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না—তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্ব্বতায় পুষ্প-জগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্দ্ধ-বিকশিত ও অর্দ্ধ-নিমীলিত। রূপের যে অর্দ্ধ-প্রকাশ ও অর্দ্ধ-গোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য, স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না

করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা—আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্তরূপ নেই—অপরের গুপ্তগন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়,—অস্ত্র। গোলা এবং সঙ্গীনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্ব্বে যা দেখানো গেল, সে সব ত অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে;—দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা, সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণ-পবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়-পর্ব্বত তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়;—সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো,—সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা ত সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা আমরা হয় সূর্য্যবংশীয়,নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং ভবলীলা-সম্বরণ করে আমরা হয় সূর্য্যলোকে, নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনও ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত, এতই অশিষ্ট, এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে যে কোনও অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল, এতই চঞ্চল, এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের

এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনই জন্মলাভ করে নি। আর এক কথা—বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়,—অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয়, আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয় তা কেউ বল্‌তে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণ-স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূকম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়; তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্য্যায়ক্রমে নয়,—ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুঙ্কার;—সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরাজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা ?—পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা! ইনি এক লম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙ্গেন, গাছ ওপ্‌ড়ান। আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন।

আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্য্যস্ত করে ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন ;—ইনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট! এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, সে কালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিষ নয় ;—নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনও মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ,—শান্ত দান্ত। সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ,—স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুঙ্কার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ,—সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়,—কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সঙ্গীতজ্ঞ ;—তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মৃদঙ্গের সঙ্গত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্ত্তমান। সে মেঘ ত মেঘ নয়,—পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ, মুরজ-ধ্বনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শীলাবৃষ্টি করে না,—মধ্যে মধ্যে

পুষ্পবৃষ্টি করে। এহেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে ?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ; সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্য্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তাহলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান ? আমাদের মত শান্ত, সমাহিত, সুসভ্য জাতির পক্ষে বর্ষা নয়—হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয় কিন্তু শাস্ত্রের ; নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই প্রমাণিত হবে ঃ—

"ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্টব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।" (শতপথ ব্রাহ্মণ।)

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানিনে ; এবং জানিনে যে তার কারণ, কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার—যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না করে, সবুজ করে তোলে।

বীরবল।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঘোর লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার ঢেউ ভেঙেছে
মেঘের থরে।
গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল করে।

ঝড়ে আজ ঝুল্‌নো ঝুলে
তমাল্‌ তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয় চমকে তাকায়।
বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নূতন দলে ;
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায় সরে।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা,
উড়বে চাতক, উড়বে তবু।
বাহিরে কদম ফুটে
নূতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সায়রে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুর্থ সংখ্যা]　　শ্রাবণ ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সর্ব্বনেশে

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো!
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠ্‌চে অট্ট হেসে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে !
এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে !
চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,
রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্‌ মাথা নীচু
সিক্ত আকুল কেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে !
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস্‌ নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে !
ঢাকিস্‌ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্‌ নে !

কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্ না, সকল
দুঃখ সুখের শেষে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো!
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিক-মত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহার-নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মত উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব যদি এমন কথা কেহ বলিত যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু একেবারে আমারি নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক-সভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর, তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক, তাহার লেখাটা ত রইলই।

অতএব নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুসি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল এমন সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে,—কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্যসম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু সমালোচক যত বড় বিচক্ষণ হোন না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সাম্‌লাইবেন সেটা ত ধাত্রী এবং ধৃত কাহারো পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুস্কিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রস-বস্তু। বলা বাহুল্য এখানে রস-

সাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিষ, যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয়পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন তেমনি রস-ভারতী স্বয়ম্বর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এই জন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালীর কাজে নামিতে কাহারো বাধে না তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কি? আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাৎ তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার, কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপরপক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে কিন্তু সেই দেওয়ানী আদালতের মত দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাসা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন— "দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাণ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ত প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।"

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তু-পিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়?

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা মনে করা যাক কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম দেশে সব চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম ব্রাহ্মণ-সভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণ-সভা তাহার পৈতা কাড়িবে এই ঘটনাটা বাংলা দেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়। অতএব বাঙালী কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধ-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতা-সংহার-কাব্য। তাহার বস্তু-পিণ্ডটা ওজনে কম হইল না কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে বাস্তবতা জিনিষটা কি, তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদী বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল "গোরা" উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কি বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক

তাহা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্ত্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা, তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা, স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়, অথবা নিন্দা করি সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়? তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জ্জনবাসী একলা-কবির চিত্ত-বাঁশীতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজন-দরে যাহা বিক্রি হয় এমনতর বস্তু-পিণ্ড তাহার মধ্যে কি আছে জানিতে চাই।

আর কীট্‌স্‌, শেলি,—ইঁহাদের কাব্যের বাস্তবতা কি দিয়া নির্দ্ধারণ করিব? ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইঁহারা বক্‌শিষ ও বাহবা পাইয়াছিলেন? যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালী করিয়া থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড-স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মত তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন্‌। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্ম্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ছিল। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে;—সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে বাস্তব নহে অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না। উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয় ত উত্তরে শুনিব আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের? বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্ত্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ এদিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা বাঙালীকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনো মতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক্ আর বাঙালীই হউক,

এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে?

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকর্‌নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের ত কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তব-বাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন; শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল-কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল,—আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয় ত তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত ?

তুমি কি মনে কর লোক-হিতৈষী তখন কেহ ছিল না ? লোক-সাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই ? কিন্তু সে কি সাহিত্য ? ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চের ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে—রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে তাহার সাধনা করিবার সময় আছে কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,—যদি প্রতিকার

করিতে পার, করিয়া দাও কাহারো আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব একথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা ত নিজের খেয়াল-মত এককথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কি? একটা-কিছুর পরে জোর করিয়া তাঁহারা ত ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে—সেখানে

নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফেশান্। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারীর আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা ;—যে লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুসি বসিয়া যেমন-খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত-আদর্শের নকলে কৃত্রিম নক্সা কাটা হয়—এই জন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কবি রাগই করুন আর খুসিই হউন তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে —এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার

করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ছন্দ*

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

এতদিন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল; এখন আবার কাজে লাগিয়াছি। বাংলা ছন্দসম্বন্ধে আপনাকে আরো কিছু লিখিব আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু যাহারা খাঁটি কুঁড়ে মানুষ, ফুরসৎ পাইলেই তাহারা কোনো কাজ করিতে পারে না। সেই জন্য এতদিন ছুটির ভিড়ে আপনাকে লিখিতে পারি নাই। যখন নিয়মিত কাজের তাড়া পড়ে তখন কুঁড়ে মানুষরা একটা অনিয়মিত কাজ পাইলে বাঁচিয়া যায়—তাই আমার ইস্কুল পালাইয়া আপনাকে বাংলা ছন্দসম্বন্ধে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলাম।

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু,—"

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা "সম্মুখ" শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক-ঝোঁকে একেবারে "বীরবাহু" পর্য্যন্ত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ,—এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরাজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না—কেননা আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া

* এই পত্র কেম্ব্রিজের বাংলা-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ডার্সন সাহেবকে লিখিত।

নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible,—এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মত এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কি রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা-বাক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই,—সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি—যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্ব্বে পর্ব্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। "আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ"—এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত মত করিয়াও পড়া যাইতে পারে,—আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ। এই বাংলা-শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবী নাই—আমাদের মর্জ্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু "Realize the riotous animality of primitive man"—এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ-নিজ এক্‌সেণ্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ একএকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক্। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা ৷ অমৃত সমান ৷
কাশিরামদাস কহে ৷ শুনে পুণ্যবান ৷

"অমৃত সমান" ও "শুনে পুণ্যবান" এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ঐখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা "মান" এবং "বান" শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ঐ ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

একএকটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, একএক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে :—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলিনা তাহার কারণ ইহার একএকটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম ঃ—

ফাগুন-যামিনী ॥ প্রদীপ জ্বলিছে ॥ ঘরে— ॥

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে —

পূরব মেঘমুখে ॥ পড়েছে রবি-রেখা ॥
অরুণ-রথচূড়া ॥ আধেক গেল দেখা ॥

এখানে স্পষ্টই একএক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার একমাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা। চার চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুল্‌কি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হাল্‌কা কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন্‌। আটমাত্রায় তাহার পা পড়ে—কেবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার ঝঙ্কারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই।

একদিন আমার মাথায় একটা ছয়মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এই রকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটাকয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁস হইল যে আকারে আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাৎ নাই অতএব পাঠকেরা আটমাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে—তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয়মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত মত ভাগ হয় ঃ—

প্রথম শীতের । মাসে— ।।
শিশির লাগিল ।। ঘাসে— ।।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এককথায় বলিলেই বুঝিবেন চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিন-বর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। যথা—

ভবানীর কটুভাষে। লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে।
ক্ষুধানলে কলেবর। দহে।

তৃতীয় পদে দুটামাত্রা বেশি আছে, তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভার-সামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। "ক্ষুধানলে

কলেবর” পর্য্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাৎ হইয়া পড়ে এই জন্য “দহে” একটা যোগ করিয়া ছোট একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টল-টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সাম্‌নের দিকে খানিক্‌টা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটাকরিয়া বড় মাত্রাকে একটিকরিয়া ছোট মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত—ইহার ভাগ আট + দুই, অথবা, চার + চার + দুই।

মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি |
পরশিব | চরণের | ধুলি |

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয় + দুই, অথবা, তিন + তিন + দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি |
হাসিল | বদন | ঢাকি |
মরম-বারতা সরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল,—হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একটু বিশেষভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোট

হওয়া চাই। কারণ, বড় হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে,—সেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্ত্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না।

যেমন—

প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে ?

অথবা,

মুখে তার | নাহি আর | রা।
লাজে লীন | কাঁপে ক্ষীণ | গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই সমস্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এই জন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলা-সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মত। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরী | চমকি | চলিয়া | গেল ॥

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর

গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে—থামানো দায়। অবশেষে একটি দুইমাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

৩+২, যথা,—

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখী
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
অশনি গরগর হাঁকে।

৫+৪

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনী।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্ত্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে, কিন্তু জন্তুর পা বল, পাখীর পাখা বল, মাছের পাখনা বল, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে—সেই

অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত মজবুৎ হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী।
হরতি দর | তিমির মতি | ঘোরং।

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃত ভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালবাসিতেন এই জন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে—তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচমাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ :—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২ |
১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+ – |

বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত হইবে :—

বচন যদি | কহগো দুটি।
দশন রুচি | উঠিবে ফুটি।
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

Ah distinctly | I remember |
It was in the | bleak December, | —

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক্—

১	২	৩	৪
Ah	dis	tinct	ly
১	২	৩	৪
I	re	mem	ber

ইহার একএকটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা,—কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের এক্‌সেণ্টের সড়্‌কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধুবাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে—

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতর নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণ-ওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রাণ মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরাজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরাজির চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি সেটা কেবল সাধুভাষায়;—বাংলার চল্‌তি ভাষায় ঠিক ইহার উল্টা। চল্‌তি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না—ইংরাজি শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্ব্বপত্রেই লিখিয়াছি বাংলা চল্‌তি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি—এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চল্‌তি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম:—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
একলা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল
মিট্‌বে সঙ্কট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাৎ নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ :—

শয্যা কই বস্ত্র কই
কি আছে কৌপীন বই
একা বনে ফিরে ঐ
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচেনীচে লিখিলাম মিলাইয়া দেখিবেন :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই | পা | লঙ্ | ক ‖ কই | রে | কম্ | বল্ ‖
শ | য্যা | ক | ই ‖ বস্ | ত্র | ক | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্ | নি | টুক্ | রো ‖ রই | ল | সম্ | বল্ ‖
কি | আ | ছে | কৌ ‖ পী | ন | ব | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্ | লা | পাগ্ | লা ‖ ফির্ | বে | জঙ্ | গল্ ‖
এ | কা | ব | নে ‖ ফি | রে | ও | ই ‖

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মত— আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরাজিতে সমমাত্রার ছন্দ অনেক আছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। অসমমাত্রা অর্থাৎ তিনমাত্রার দৃষ্টান্ত, যথা :—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un ‖ for | tu | nate ‖

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of ‖ breath— — ‖

ইংরেজিতে বিষমমাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে :—

১ ২ ৩ ৪ ৫
When | we | two | par | ted |

১ ২ ৩ ৪ ৫
(In) si | lence | and | tears | — |

১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed

১ ২ ৩ ৪ ৫
(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষমমাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি—বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে যেমন—

O the dreary | dreary moorland |
O the barren | barren shore |

পদের শেষে, যেমন,

And are ye sure || the news is true ||
And are ye sure || he's well ||

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিম্বা

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরালো। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কিনা জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে—কারণ চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে,—আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখন কখন জিত হইবার সম্ভাবনা আছে এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম।

চিঠির মধ্যে কাটাকুটি অনেক রহিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষতচিহ্নসমেত এটা আপনার কাছে চালান করিয়া দিলাম—এই ত্রুটিকে বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিবেন না। চিন্তার সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছে--তবু রণে ভঙ্গ না দিয়া বক্ষের উপর তলোয়ারের দাগ বহিয়া এই পত্র আপনার সভায় হাজির হইয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে। ইতি ১৮ আষাঢ়, ১৩২১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জান্‌তনা সেই শিশু-বয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠ্‌লুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বল্‌তে লাগ্‌ল, মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?—চুরিবিদ্যাতে যম পাকা; দামী জিনিষের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখ্‌তে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখ্‌তে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেলা শেয়াল ডাকে। ষ্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কী করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সেদিন তোমাদের কি হয়রানী! তার উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্না,—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেননি।

তোমাদের বড়-বৌয়ের রূপের অভাব মেজ-বৌকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোঁজ করতে হয় না—তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুরদুর করতে লাগ্‌ল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে? মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ত মেয়ের মধ্যে নেই—যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই ত হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্‌ল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে

মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুই-জোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল—আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজ্‌তে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠ্‌লুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাকৃত—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন তাই তোমাদের ধর্ম্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি—কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চল্‌তে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চল্‌তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কি করব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্চে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম। সে ছাই পাঁশ যাই হোক্ না সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি চিন্‌তেও পারনি ;—আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগচে সে তোমাদের গোয়াল-ঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সাম্‌নের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত সহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বৌ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম—যখন বড় হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্রসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকৃত তাহলে সেই

আমার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজ-বৌ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্‌তুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা-হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জ্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল করেছিল, সে ভেবেছিল এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মত: সে ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে ত অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই ত মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো। আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও

কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কিইবা, যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে, মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্‌তুম। বাঙালীর মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাদুরিটা কি! মরতে লজ্জা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি ত সন্ধ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেত আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটল সুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে তোমরা সেদিন ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করব বল, দেখ্‌লুম তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ সেইজন্যেই এই

নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড় অপমান! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায়?

তার পরে দেখলুম আমার বড় জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগ্‌লেন যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—যেন এ'কে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। দেখলুম বড় জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া-পরার এম্‌নি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির সর্ব্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমন ভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা।

আমাদের বড় জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না। রূপও না টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে ত সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে

যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারিনে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বল্লেন, "মেজ-বৌ গরীবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বস্‌লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্‌কা হল। আমার বড় জা বিন্দুর বয়স থেকে দুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না একথা লুকিয়ে বল্‌লে অন্যায় হত না। তুমি ত জান সে দেখ্‌তে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মত মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিল।

বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগ্‌লে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার

যেন জন্মাবার কোনো সর্ত্ত ছিল না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চল্‌ত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তত ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ঘরের আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু তারা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আন্‌লুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু আমার ঘর শুধু ত আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দুচার দিন আমার কাছে থাক্‌তেই তার গায়ে লাল-লাল কি উঠ্‌ল—হয় ত সে ঘামাচি, নয় ত আর কিছু হবে। তোমরা বল্‌লে বসন্ত। কেননা, ওযে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বল্‌লে, আর দুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু ত তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বল্‌লুম, বসন্ত হয় ত হোক্—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্‌ব, আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্ত্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন

অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করচেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে। বল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ওযে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না—মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন! আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাস্‌তে সুরু কর্‌লে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার এ রকম মূর্ত্তি সংসারে ত কোনোদিন দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বল্‌ত, "দিদি তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায়নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে চাড়তে তার ভারি ভালো লাগ্‌ত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের ত দরকার ছিল না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির করে

রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দ্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যেদিন দেখ্‌তুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে সেইদিন জান্‌তুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হয়ে উঠ্‌ল সেদিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালবাসার দুঃসহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল—একএকবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি—কিন্তু তার এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মত মেয়েকে আমি যে এতটা আদর যত্ন করচি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎ-খুঁৎ খিটখিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগ্‌ল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বস্‌লে যে, বিন্দু পুলিষের পোষা মেয়ে-চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি

করত,—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে ও মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌ত। এই সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখ্‌লুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না করলেও চলে আর তোমাদের খুসি না করলেই নয় এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য হই তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাওনি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় কর্‌তে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড় জা বল্‌লেন, বাঁচ্‌লুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা কর্‌লেন।

বর কেমন তা জানিনে ; তোমাদের কাছে শুন্‌লুম সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল—বল্লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন ?"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম,—"বিন্দু, তুই ভয় করিস্‌নে—শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বল্‌লে,—"বর যদি ভালো হয় আমার কি আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে ?"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখ্‌তে আসবার নামও কর্‌লে না। বড় দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থাম্‌তে চায় না। সে তার কি কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক্‌ এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বল্‌ব ? আমি যদি মারা যাই ত ওর কি দশা হবে ?

একে ত মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে—কার ঘরে চল্‌ল, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বল্লে,—"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি ?"

আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিলুম কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বল্লে,—"দিদি,

আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বল্‌বে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।”

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় ত নয় শাস্ত্রও আছে ; তিনি বল্লেন, —“জানিস্ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে ত কেউ খণ্ডাতে পারবে না।”

আসল কথা হচ্চে কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই—বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে—তার পরে যা হয় তা হোক্।

আমি চেয়েছিলুম বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু তোমরা বলে বস্‌লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাইনি কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্ম্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—“দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে ?”

আমি বল্লুম,—“না বিন্দী, তোর যেমন দশাই হোকনা কেন আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না।”

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের একপাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আস্‌তুম; —তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর করে দেখেছি তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস্‌ বিন্দী?"

"এত বড় মিথ্যা কথা তোমার কাছে বল্‌তে পারি দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মত ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েমানুষ বই ত নয়। ছেলে হোক্‌না পাগল, সে ত পুরুষ বটে।

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না—কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ

হয়ে উঠ্‌ল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু ত ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বল্‌লে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পূরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুক্‌তে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বল্লুম, এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।

তোমরা বল্লে, বিন্দু মিথ্যা কথা বল্‌চে।

আমি বল্লুম, ও কখনো মিথ্যা বলেনি।

তোমরা বল্লে, কেমন করে জান্‌লে?

আমি বল্লুম, আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌-কেস্‌ কর্‌লে মুস্কিলে পড়তে হবে।

আমি বল্লুম, ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুন্‌বে না?

তোমরা বল্লে, তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ত্তে হবে নাকি? কেন আমাদের দায় কিসের?

আমি বল্লুম, আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।

তোমরা বল্লে, উকীলবাড়ি ছুটবে না কি?

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কি করব?

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বল্‌চে সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে—কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্দ্ধা করে বল্লুম, তা দিক্ থানায় খবর!

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেল্‌বে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্‌ছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কি করব? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী ত বটে।

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলনা। আমি ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন? তোমাদের এই সব ধর্ম্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না!

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্‌বে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোট ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই ত যত-রকমের ভলণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ,এ, পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায়নি। তাকে আমি ডেকে বল্লুম, বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না—লিখ্‌লেও আমি পাব না।

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দুকে ডাকাতি

করে আন্‌তে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহলে সে বেশি খুসি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করচি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বল্লে আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ ?

আমি বল্লুম, সেই যা সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম,—কিন্তু সে ত তোমাদেরই কীর্ত্তি।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে,—"বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ ?"

আমি বল্লুম,—"বিন্দু যদি আস্‌ত তাহলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আস্‌বে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্‌দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মাম্‌লায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুন্‌লুম বিন্দু আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কি অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বল্লে, বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনি আবার তাকে শ্বশুড়বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

এর জন্যে তাদের খেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বল্লুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুসি হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্‌দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌ব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বল্লুম, যেমন করে হোক্ বিন্দুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে।

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল,—সে বল্লে, ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বল্লুম,—"কি শরৎ, সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বল্লে,—"না।"

আমি বল্‌লুম,—"রাজি করতে পারলিনে?"

সে বল্লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল!

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বল্‌তে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান্ হয়েছে।

তোমরা বল্‌লে, এ সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও ত ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্‌নি পোড়াকপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায়নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুসি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই ত না; বেঁচে থাকলে কি না হতে পারত!

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বল্‌তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক্ তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বল্‌তে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড় জায়ের মত পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার

চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তারপরে এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম জগতের মধ্যে যা কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারিদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক্ না —একমুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র

চৌকাঠ পেরতে পারি নে ?—তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের ?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল,—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া! কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়চে! ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজ-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না!

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ!

তুমি ভাবচ আমি মরতে যাচ্চি—ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট্টা

তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারি ছিল না, তাকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে; মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক্!"* এই লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন—মৃণাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র

সম্পাদক-মহাশয়সমীপেষু—

আপনি যে নূতন কাগজ বার করেছেন, তার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে, নূতন কথা নূতন ধরণে বলা। এ উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হলে, নূতন লেখক চাই,—নচেৎ সবুজপত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।

যদিচ আপনি মুখপত্রে "আমির" পরিবর্ত্তে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি ঐ বহুবচনের পিছনে যে বহু লেখক আছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাঙ্গলায় দ্বিবচন নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই আপনি প্রথমপুরুষের বহুবচন ব্যবহার কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। কারণ অদ্যাবধি কেবলমাত্র দুটি লেখকেরই পরিচয় পাওয়া গেছে—এক সম্পাদক, আর এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গুণ্‌তির মধ্যে ধরা গেল না, কেননা আপনারা লেখার যা নমুনা দেখিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আপনার প্রধান ভরসাস্থল হচ্ছে গদ্য। কারণ সোজা কথা বাঁকা করে এবং বাঁকা কথা সোজা করে বলা পদ্যের রীতি নয়।

আর ছিলুম আমি,—কিন্তু আর বেশিদিন যে থাক্‌ব কিম্বা থাক্‌তে পার্‌ব, এমন আমার ভরসা হয় না। হয় আপনি আমাকে ছাড়বেন, নয়ত আমি আপনাকে ছাড়ব। আমার লেখায়, আর যাই হোক্, সবুজপত্রের যে গৌরব বৃদ্ধি হয়নি, একথা সর্ব্ব-সমালোচক-সম্মত। এ অবস্থায়, "বীরবল" অতঃপর "আবুল-ফজল" হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর

দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে আইন-ই-আঙ্গরেজি নামক যে নব-বিশ্বকোষ রচনা কর্‌ব—"সবুজপত্রে" তার স্থান হবে না। যদি "ফৈজি" হতে পারতুম, তাহলেও না হয় আপনার কাগজের জন্য একখানি দেশকালোপযোগী অর্থাৎ স্বয়ম্বরা-তিরস্কৃত একখানি "নলদমন" রচনা কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু সে হবার যো নেই। আমাকে আবুল-ফজল হতেই হবে। আশা করি, বাঙ্গলার নবীন আবুল-ফজলদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আমার সঙ্গে পেশা বদ্‌লে নেবেন, কেননা সাহিত্য-রাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরাজেরা বলেন—এক কোকিলে বসন্ত হয় না—অর্থাৎ আর পাঁচরঙ্গের আর পাঁচটি পাখীও চাই। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্তঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাক্‌বে, কাঠ-ঠোক্‌রাও থাকবে, লক্ষ্মী-পেঁচাও থাকবে, হুতুম-পেঁচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে তখন নানা পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক "বউ কথাকও" নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক "চোখ-গেল" নিয়ে দর্শনও হয় না।

উপরোক্ত ভাবে বাদসাদ দিয়ে শেষে দাঁড়াল এই যে, আপনার কাগজের যা প্রধান প্রয়োজন সেইটিই হচ্ছে তার প্রধান অভাব—অর্থাৎ নূতন লেখক। মনে রাখ্‌বেন যে, এদেশে আজকাল খাঁটি সাহিত্য চল্‌বে না, চল্‌বে যা – তা হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য ;—যদিচ এ কথার সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে কারো স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনও লেখা যদি সাহিত্য না হয়, তবুও তার আর মার নেই—যদি তা তথাকথিত জাতীয় হয়। এর কারণ, প্রথমতঃ আমরা বিশেষ্যের চাইতে বিশেষণের অধিক ভক্ত, দ্বিতীয়তঃ আমরা সাহিত্য বিচার কর্‌তে পারি

আর না পারি, জাত-বিচার কর্‌তে জানি। বলা বাহুল্য যে, দুহাতে কখনো জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলা যায় না। দুহাতে অবশ্য তালি বাজে। আপনারা যদি স্বজাতিকে অহর্নিশি করতালি দিতে প্রস্তুত হতেন, তাহলে আপনাদের হাতে জাতীয় সাহিত্য রচিত হত; কিন্তু সে বিষয়ে আপনাদের যখন তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, তখন নূতন লেখক চাই।

বাঙ্গলা-লেখ্‌বার লোকের অভাব না থাক্‌লেও, "সবুজপত্রে" লেখ্‌বার লোকের অভাব যে কেন ঘট্‌ছে, তার কারণ নির্ণয় কর্‌তে হলে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আজ বসন্তকাল উপস্থিত, "সবুজপত্রের" আবির্ভাব তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশী জ্ঞানবৃক্ষের নানা ডালপালা বেরিয়েছে, এবং অন্ততঃ তার একটি শাখায় —অর্থাৎ ইতিহাসের অক্ষয় শাখায়—এমন ফুল ফুটেছে ও ফল ধরেছে যা সমালোচকদের নখদন্তের অধিকার বহির্ভূত; কেননা সে ফুল তামার এবং সে ফল পাথরের।

কিন্তু আপনি পাঠকদের এই ফলাহারে নিমন্ত্রণ করেননি। আপনি সবুজপত্রে যে ফল পরিবেষণ কর্‌তে চান্, সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি মুখরোচক সংসারবিষবৃক্ষের সেই ফল, যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অমৃতোপম মনে কর্‌তেন। সেই জাতীয় লেখকেরা হচ্ছেন আপনার মনোমত, যাঁরা কিছুই আবিষ্কার করেন না কিন্তু সবই উদ্ভাবনা করেন,—যাঁরা বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানের হাতে সমর্পণ করে মনোজগতের উপাদান নিয়ে সাহিত্য গড়েন।

আমাদের সাহিত্যসমাজে কবি দার্শনিকের ভিড়ের ভিতর

বৈজ্ঞানিকদেরই খুঁজে পাওয়া ভার, অতএব আপনার স্বজাতীয় সাহিত্যিকের অভাব এদেশে মোটেই নেই। তাহলেও তাঁরা যে উপযাচী হয়ে এসে আপনাদের দলে ভিড়্‌বেন, তার সম্ভাবনা কম,—কেননা, যাতে করে দল বাঁধে, সেরকম কোনও মতের সন্ধান আপনাদের লেখায় পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই মনেরও একটা চল্‌তি পথ আছে। অভ্যাসবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ দলে দলে লোক সেই পথ-ধরেই চল্‌তে ভালবাসে, কারণ মুখ্যতঃ সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ। সে পথ মহাজনদের হাতে রচিত হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের পায়ে গঠিত হয়েছে। আপনারা বঙ্গ-সরস্বতীকে সেই পরিচিত পথ ছেড়ে একটি নূতন এবং কাঁচা রাস্তায় চালাতে চান। আপনারা বলেন—"সমুখে চল"; কিন্তু বুদ্ধিমানরা বলেন—"নগণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ!" আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ করা কবি কিম্বা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ দেখানই হচ্ছে সে মনের ধর্ম্ম, অতএব কর্ত্তব্য। সুতরাং আপনাদের দ্বারা উদ্ভাবিত, অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত চিন্তামার্গে অগ্রসর হতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বিশেষতঃ যখন সে পথের একটা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই—যদি বা থাকে ত সে অলকা বর্ত্তমান-ভারতের পরপারে অবস্থিত। শুন্‌তে পাই, ইউরোপের সকল স্থল-পথই রোমে যায়। তেমনি এদেশের সকল হাঁটা-পথই কাশী যায়। কিন্তু আপনারা যখন বাঙ্গালীর মনকে কাশীযাত্রা না করিয়ে সমুদ্রযাত্রা করাতে চান, তখন যে নূতন লেখকেরা সবুজপত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এক-পংক্তিতে বসে যাবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং আপনাদের সেই শ্রেণীর

লেখক সংগ্রহ করতে হবে যাঁদের কাছে আপনাদের সাহিত্য অচল নয়। এ দলের বহুলোক আপনার হাতের গোড়াতেই আছে।

গত বৈশাখ মাসের "ভারতী" পত্রিকাতে আপনি বিলেত-ফেরৎ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নেই—সুতরাং নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজ অর্থাৎ সাহিত্য সমাজে এঁদের তুলে নেওয়া হচ্ছে আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য। অতীতের উদ্ধারের পাল্টা-জবাব দিতে হলে, পতিতের উদ্ধার করা আবশ্যক।

বিলেত-ফেরতদের লেখায় আর কিছু থাক আর না থাক্—নূতনত্ব থাক্‌বেই। ৺মাইকেল দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই তিনটি বিলেত-ফেরৎ কবির ভাষায় ও ভাবে এতটা অপূর্ব্বতা ছিল যে, আদিতে তার জন্য এঁদের দুজনকে পুরাতনের কাছে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়কে যে কেউ ঠাট্টা করেন নি তার কারণ, তিনি সকলকে ঠাট্টা করেছেন। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিলেত-ফেরতের হাতে পড়লে বঙ্গ-সাহিত্যের চেহারা ফিরে যায়।

আসল কথা, এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্য হচ্ছে বিলেতি ঢংয়ের সাহিত্য। যে হিসেবে দাশরথি রায়ের পাঁচালি ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খাঁটি বাঙ্গলা-সাহিত্য—সে হিসেবে নব-সাহিত্য খাঁটি বঙ্গ-সাহিত্য নয়। এর জন্যে কেউ কেউ দুঃখও করেন। চোখের জল ফেলবার কোনও সুযোগ বাঙ্গালী ছাড়ে না। ব্যাস-বাল্মিকীর জন্যও আমরা যেমন কাঁদি, পাঁচালিওয়ালাদের জন্যও আমরা তেমনি কাঁদি। কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও, বঙ্গ-সরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকার ভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।

আমাদের নব-সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিতা এবং কলেজে শিক্ষিত লোকেরাই অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে আস্‌ছেন এবং ভবিষ্যতেও কর্‌বেন—কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ হ্যাট পরে। এই প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ করছি। পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একসঙ্গে সুরা এবং সোম পান্‌ কর্‌তেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই শান্তি-বচন পাঠ করতেন

—"অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর।"

আমরাও কলেজে যুগপৎ ইংরাজি সুরা এবং সংস্কৃত সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায়, সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই কর্‌ছে। আমাদের সাহিত্য সেই কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের যে নেশা ধরেছে, সে মিশ্র-নেশা। তবে কোথাও বা তাতে সুরার তেজ বেশি, কোথাও বা সোমের। মনোজগতে যে আমরা সকলেই বিলেত ফেরৎ, এই কথাটা মনে রাখলে, সাহিত্য-মন্দিরে আপনার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে সাহিত্যের পাণ্ডারা আর বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহই দেবেন; কেননা আমরা সকলেই ইংরাজি-সাহিত্যে শিক্ষিত, আপনারা উপরন্তু ইংরাজি-সভ্যতায় দীক্ষিত।

সামাজিক হিসেবে বিলেত-ফেরতদের এই গুরুগৃহ-বাসের ফল যাই হোক, সাহিত্য-হিসেবে এর ফল ভাল হবারই সম্ভাবনা। কারণ ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে ইংরাজি-সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে ইউরোপে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ও প্রতিবাদ—আর সে

পরিচয় যাঁর নেই, তিনি ভাবেন যে, ও শুধু বাদানুবাদ। সাহিত্যের ভাষ্য ও টীকা জীবনসূত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা শুধু কথার কথা হয়ে ওঠে। সেই কারণে নব-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জীবনে ইংরাজি-জীবনের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তাঁদের রচিত সাহিত্যে ইংরাজি কথার প্রভাব তত বেশি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের স্বদেশী বক্তৃতায় ও লেখায় নিত্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়েও বিলেতি মনোভাবকে আমরা গোপন করে রাখতে পারিনে। বিদেশী ভাবকে আমি অবশ্য মন থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করছি নে,—কারণ যে সকল ভাব সাত সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে উড়ে এসে আমাদের মনোজগতে জুড়ে বসেছে, তাদের বেবাক্ উপ্‌ড়ে ফেলাও সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও তাতে মন উজাড় হয়ে যাবে। তবে যা জালে ওঠে তাই যেমন মাছ নয়—তেমনি যা ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে তাই গাছ নয়। বিলেতিজীবনে বিলেতিসাহিত্য যাচাই করে নিতে না পার্‌লে, এই বিদেশী ভাবের জঙ্গলের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উদ্যান গড়ে তুলতে পারব না। এই পরখ কর্‌বার কাজটি সম্ভবতঃ বিলেত-ফেরতেরাই ভাল পার্‌বেন।

তবে সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ কর্‌তে এঁরা সহজে স্বীকৃত হবেন না। লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌বামাত্র এঁরা উত্তর কর্‌বেন যে, "আমরা বাঙ্গলা লিখ্‌তে জানিনে।" কিন্তু ও কথা শুনে পিছ-পাও হলে চল্‌বে না। সেকেলে বিলেত-ফেরতেরা বল্‌তেন যে তাঁরা বাঙ্গলা বল্‌তে পারেন না। অথচ সে বিনয় কিম্বা সে স্পর্দ্ধা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আজ বিলেত-ফেরতের মুখে মুখে পাওয়া যায়। হতে পারে যে, বাংলা লিখ্‌তে পারিনে একথা বলায় প্রমাণ হয় যে, বক্তা ইংরাজি লিখ্‌তে পারেন।

অথচ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে-লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, সে-ইংরাজি কোন দেশী লোক লিখ্‌তে পারেন না। যাঁরা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরাজি ভাষায় ওকালতি এবং "কলাবতী" করেন, তাঁরা যে ও-ভাষায় শুধু পড়া-মুখস্থ দেন তা শ্রোতামাত্রেই বুঝতে পারে। আমরা আইন-সম্বন্ধে এবং রাজনীতি-সম্বন্ধে ইংরাজ-রাজপুরুষের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য, সুতরাং ও দুই ক্ষেত্রে মুখস্থ-বিদ্যা যার যত বেশি, সে তত বড় বড় প্রাইজ পায়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, ঐ প্রাইজের দৌলতে তাঁরা ইংরাজি সাহিত্য-সমাজে প্রোমোসন্ পান। সুতরাং সাহিত্য বস্তু যে কি, তা যিনি জানেন, তাঁকে ইংরেজি ত্যাগ করে বাঙ্গলা লেখাতে প্রবৃত্ত কর্‌তে কিঞ্চিৎ সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হবে। বিলেতি বুট ত্যাগ কর্‌লে বঙ্গসন্তান যে স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর্‌তে পারেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—তবে বুট ছেড়ে যদি পণ্ডিতি খড়ম পরে বেড়াতে হয় তাহলে অবশ্য তা আরও বিপদের কথা হবে। কিন্তু বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে খোলা পায়ে প্রবেশ করাটাই যে কর্ত্তব্য এবং শোভন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেটি বোঝা উচিত। অবশ্য পণ্ডিতি-খড়মের প্রধান গুণ এই যে, তা যত বেশি খট্‌খটায়মান হবে, লোকে তত বেশি "সাধু সাধু" বল্‌বে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আশৈশব ও-বস্তুর ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে, খড়মধারীদের পদে পদে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য্য।

বিলেত-ফেরতকে লেখক তৈরি করার প্রধান বাধা হচ্ছে যে, তাঁরা অধিকাংশই আইন-ব্যবসায়ী। উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব—যদিচ উভয়েই বাচাল। এর একেকে দিয়ে অপরের

কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই যে রাসবিহারী হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, এ দেশের কত বিদ্যাবুদ্ধি আদালতের মাঠে মারা যাচ্ছে। তার কারণ ও শুষ্ক এবং কঠিন ক্ষেত্রের রস আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, অনেকের মন তাতে শিকড়ও গাড়্‌তে পারে না। এ অবস্থায় যে অনেকে আদালতের মাটি-কাগড়ে পড়ে থাকেন তার কারণ, ও স্থান ত্যাগ করলে হাঁসপাতালে যাওয়া ছাড়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ীর আর গত্যন্তর নেই। তাই নিত্যই দেখ্‌তে পাওয়া যায় বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক, এক ফোঁটা জল না খেয়ে, দিনের পর দিন, ন্যুব্জশিরে কুব্জপৃষ্ঠে অগাধ আইনের পুস্তকের ভার বহন করে আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে গুরুভারে পৃষ্ঠদণ্ড ভঙ্গ হলেও যে তাঁরা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দেন না, তার আর একটি কারণ এই যে, এই মরুভূমিতে তাঁরা নিত্য রজতমায়ার মরীচিকা দেখেন। সুতরাং এই আইনের দেশ একবারে ত্যাগ কর্‌তে কেউ রাজি হবেন না; তবে মধ্যে মধ্যে সবুজপত্রের ওয়েসিসে এসে বিশ্রামলাভ কর্‌তে এঁদের আপত্তি নাও হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু সতর্ক থাকবেন যে, এমন লোক আপনার বেছে নেওয়া চাই যার মন ইংরাজের আইনের নজিরবন্দী হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, যেন তেন প্রকারেণ আপনার নিজের দলের লোককে,—আর কোনও কারণে না হোক, আত্মরক্ষার জন্যও —আপনাকে লেখক তৈরি করে নিতে হবে—কারণ তাঁরা যদি লেখক না হন, তাহলে তাঁরা সব সমালোচক হয়ে উঠবেন। ইতি

বীরবল।

উপমা ও অনুপ্রাস

ভাব-পদার্থকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবিগণ উপমা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যাঁহার ঐশ্বর্য্য যত বেশি, কবি-সমাজে তিনি যে তত উচ্চ আসন অধিকার করেন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু অনুপ্রাসের সার্থকতাসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কাহারও কাহারও মতে এই শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে ভাবের মূর্ত্তি ঢাকা পড়ে।

এ কথা অবশ্য মনে করা ভুল যে, কাব্যে অনুপ্রাসের কোনও স্থান নাই। রূপের সাদৃশ্য হইতে যেমন উপমা জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি শব্দের সাদৃশ্য হইতে অনুপ্রাস জন্মলাভ করিয়াছে। রসায়নে আণবিক আকর্ষণের বলে, যেমন অণুর সঙ্গে অণু মিলিত হয় তেমনি একটি বিশেষ হৃদয়াবেগের প্রকাশের তাড়নায় বিশেষ বিশেষ শব্দ তাহার জুড়িকে খুঁজিয়া লয়। এই যে শব্দের সহিত শব্দের সহজ সঙ্গতি, ইহার মূলেও শব্দ-রাজ্যের কোনো গূঢ় রাসায়নিক আকর্ষণ বিদ্যমান। পাতায় পাতায় লাগিয়া যেমন মর্ম্মরধ্বনি উঠে, তরঙ্গে তরঙ্গে অভিহত হইয়া যেমন কলগান জাগে, সেইরূপ কথা যখন তাহার জুড়ির সহিত মিলিত হয়, তখন সেই মিলনের ফলে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত কাব্যে হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"র একটি কবিতার তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব
চলচপলার চকিতচমকে করিছে চরণ বিচরণ।

এটি বোধ হয় কোনো বর্ষার কবিতা হইবে। শেষ-ছত্রটিতে যে অনুপ্রাসের লীলা আছে বিদ্যুতের নৃত্যলীলার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যে যখন ভাবের দৈন্য ঘটে, তখন বলিবার-ভঙ্গী বলিবার-বিষয়কে অতিক্রম করে। যেখানে রসের অভাব আছে, সেখানে কবিরা রচনার চাতুর্য্যের দ্বারা সেই আন্তরিক শুষ্কতা গোপন করিবার প্রয়াস পান। শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবার জন্য তখন তাঁহারা অপূর্ব্ব উপমা এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

উপমা ভাবানুসারী না হইলে তাহা যে কতদূর পর্য্যন্ত কৃত্রিম হইতে পারে, তাহার উদাহরণ সংস্কৃত-কাব্যেও বিরল নহে। সংস্কৃত-কাব্যের জোয়ারের মুখে যে উপমাগুলি শুভ্রফেণকিরীটের মত ভাবের তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ঝলমল করিয়াছে, ভাঁটার সময়ে সেই উপমা-গুলিই ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ভাবের মরা-স্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ কষ্টকল্পিত এবং অসঙ্গত উপমার দুএকটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ভ্রূরেখাযুগলং ভাতি তস্যাশ্চটুলচক্ষুষঃ।
পত্রদ্বয়ীব হরিতা নাসাবংশবিনির্গতা॥"

অর্থাৎ, চঞ্চলনয়না সেই রমণীর ভ্রূদুটি, নাসারূপ বংশের হরিৎবর্ণ দুটি পত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অপর একটি শ্লোক ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত। সেটি এই—

"বেণী শ্যামা ভুজঙ্গীয়ং নিতম্বান্মস্তকং গতা।
বক্ত্রচন্দ্রসুধাং লেঢ়ুং সান্দ্রসিন্দূরজিহ্বয়া॥"

অর্থাৎ, অতি গাঢ় সিন্দূররূপ জিহ্বাদ্বারা মুখচন্দ্রের সুধাপান করিবার জন্যই যেন কালো ভুজঙ্গীর মত বেণীটা নিতম্বদেশ হইতে মস্তকে আরোহণ করিতেছে।

উপমার উপর জোরজবরদস্তি করিলে তাহা যে কতদূর অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, তাহার উদাহরণ যেমন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে দেখানো গেল, তেমনি অনুপ্রাস যখন শব্দের উপর শব্দ চাপাইয়া ভাবের প্রাণ বাহির করিয়া দিবার আয়োজন করে, তখন তাহার উপদ্রব যে কতদূর বিরক্তিকর হয়, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভাঁটার সময় এই অনুপ্রাসের ঘটা বাঙালী কবিদের পক্ষে শ্রোতার মনোরঞ্জনের প্রধান সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপ্রাসের ভেল্কিবাজি যে-কবি যত দেখাইতে পারিত, শ্রোতাদের চমৎকৃত করিবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে তত বাড়িয়া যাইত। বলা বাহুল্য, দাশরথি রায়ের পাঁচালি এ বিষয়ে স্বনামধন্য হইয়াছে। দীনেশবাবুকর্তৃক আবিষ্কৃত কৃষ্ণকমল গোস্বামী নামক জনৈক ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির কবিতা হইতে অনুপ্রাসের একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বিদ্যুতলজ্জিতকৃত যে রূপসী
সে রূপচ্ছেদক বিদ্যুন্‌রূপ অসি,

মরি ! কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশিরাশি-জিত যে শশী,—
হ'ল সে শশী অসিত চতুর্দ্দশীর প্রায় ॥"

অনুপ্রাস যে কতটা প্রলাপের মত হইয়া উঠিতে পারে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই যুগসঞ্চিত কৃত্রিম উপমার আবর্জ্জনা ও কৃত্রিম অনুপ্রাসের জঞ্জাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার জন্য কোনো কোনো আধুনিক কবি এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, কাব্যকে একেবারে নিরাভরণ করা তাঁহারা অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। ইঁহাদের মতে অলঙ্কারের অন্তরালে ভাবের সৌন্দর্য্য চাপা পড়িয়া যায়, সুতরাং মনোভাবকে যত সজ্জামুক্ত করিতে পারিবে ততই তাহার রূপ ব্যক্ত হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী; তাই তিনি উপমা-প্রয়োগসম্বন্ধে নিতান্ত কৃপণ ছিলেন। যদি কখনো তাঁহার কলমের মুখ দিয়া কোনও উপমা বাহির হইয়া পড়ে তবে তাহা "Phantom of delight"-গোছের,—অর্থাৎ একেবারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বর্জ্জিত।

উপমা ও অনুপ্রাসের প্রতি মনস্বী লেখকদের এতটা বীতরাগ হইবার কারণ, উহা মন্দকবির হাতে সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে। যাহারা উপমাকে কাব্যদেহে অর্পিত বাহ্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে, তাহাদের লক্ষ্য যে তাহার বাহুল্য ও গঠন-চাতুর্য্যের দিকেই থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক-শ্রেণীর কবিরা উপমাকে গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, অপর শ্রেণীর কবিরা সে গহনা খুলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা এখন এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছি যে, উপমা

ফরমায়েস দিয়া তৈরি করাইবার জিনিষ নয়;—কেননা, তাহা কাব্য-দেহের অলঙ্কার নয়, কিন্তু কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কেন আমরা এরূপ মনে করি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিতে চাই।

এ জীবনে বস্তুমাত্রেরই সহিত আমাদের দ্বিবিধ কারবার—এক শরীরের, আর এক মনের। আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি প্রভৃতি সকল জিনিস আমাদের চিন্তার সহিত, অনুভূতির সহিত, নানা প্রকারে জড়িত গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভাব ক্রমাগতই তাহাদের সাহায্যে বচনীয় হইতেছে। সেইজন্য কোনো কথা বলিতে গেলে, উপমা দিতে পারিলেই মনে হয় কথাটাকে যেন রূপ দেওয়া গেল,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে কথাটা মনের আকাশে বাষ্পের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত ছিল, এইবার যেন তাহাকে একটি সংহত সুন্দর স্পষ্ট আকার দেওয়া গেল। শুধু তাই নয়, ভাল উপমা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র মনে হয় যেন আমার কথার সায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া পাওয়া যায়। আমি যে ভাবনা ভাবিতেছি, সেই ভাবনা যেন নানা আকারে, নানা আভাসে, নানা ইঙ্গিতে, নানা ভঙ্গীতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর, এক ভাবের সহিত অপর ভাবের যোগসাধন করাই উপমার কার্য্য। কেবল তাহাই নহে, কবিরা নির্ভয়ে বস্তুর ধর্ম্ম মনেতে, এবং মনের ধর্ম্ম বস্তুতে আরোপ করেন। "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—এই উপমার সেতুর সাহায্যেই সাধিত হয়। উপমা রূপ হইতে ভাবে ক্রমাগতই যাতায়াত করিতেছে। যে বাধা বিজ্ঞানের কাছে, দর্শনের

কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—হিমালয়ের পর্ব্বত-প্রাচীরের অপেক্ষাও দুর্লঙ্ঘ্য —তাহা উপমার কাছে মস্‌লিনের তিরস্করণীর মতও নয়।

বিজ্ঞান একসময়ে মানব-মনের এই সহজ প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল, এবং তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কারণ বৈজ্ঞানিক মতে বিশেষ-বস্তুর বিশেষ-জ্ঞানের অভাববশতই কবি-কল্পনা, যাহা বস্তুত পৃথক তাহার ঐক্য-সাধন করিতে বৃথা চেষ্টা করিত। কিন্তু এ যুগের বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীতে ক্রমাগতই এক হইতে আরে, রূপ হইতে রূপান্তরে প্রাণের ও শক্তির যাত্রা চলিয়াছে। জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ ও বস্তুজগতে নব-আণবিক-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছে যে, বিশ্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই রূপান্তরিত হইতেছে, এখানে কিছুই স্থির হইয়া বসিয়া নাই। জীবজগতে প্রাণের রূপও স্থির নহে, জড়জগতে অণুর রূপও স্থির নহে।

যখন এই কথা চিন্তা করি যে, সৌরজগতের সেই অবিভক্ত অসংহত বাষ্পপিণ্ডের ঘূর্ণি, তৎপরে সংহত পৃথিবীগ্রহের মহাসমুদ্রের উন্মত্ত আলোড়ন, সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তপ্ত পর্ব্বতোচ্ছ্বাস, জীবপঙ্কের আবির্ভাব, খাদ্যরসের রক্তে পরিণতি ও জীবের প্রজনন-শক্তি, এবং ক্রমে বিচিত্র জীবদেহের অভিব্যক্তি,—এই সমস্ত যুগযুগান্তরের ক্রিয়াগুলি এই শরীরের অণুপরমাণুর মধ্যে মগ্ন-চেতনার অন্ধকার-রাজ্যে কত অস্পষ্ট সংস্কাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখনি বুঝিতে পারি বিশ্বের সর্ব্বত্র আমার মন কেন উপমার জাল ফেলিয়াছে।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে কিন্তু ইহার উল্টা কথাটাই লোকের

মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল বুঝি কবির অনুভূতির মধ্যে কোনো সত্যই নাই। কাব্যও হঠাৎ তাহার উপমার প্রদীপ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে বাস্তবকে যে ভাবে দেখিতে শিখিল, তাহাতে বুঝিল যে উপমা সত্যের শুভ্রজ্যোতিকে শুধু মলিন করে। বিজ্ঞান আজ আবার ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অতীন্দ্রিয় লোকের কত দ্বার বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সত্য যে স্থির পদার্থ নয়, তাহা যে উপমার নিদান,—রূপ হইতে রূপান্তরের মধ্য দিয়াই যে তাহার পরিচয় পূর্ণতর হইতেছে, এই জ্ঞানের প্রভাব আজ সাহিত্য-রাজ্যেও লক্ষিত হইতেছে। সত্যকে মানুষ একদিন স্থির জানিয়াছিল; এখন সে দেখে যে যাহা স্থির তাহাই মৃত্যু, অর্থাৎ সৃষ্টির বহির্ভূত, এবং এই সত্যের ব্যক্তি উপমায়। কারণ উপমা তো সত্যকে বাঁধে না;—সে কেবলি বলে, এই রকম, এই রকম। অনির্ব্বচনীয়কে সে কেবলি বচনগম্য করে, অনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করে;—কিন্তু সে বচন, সে রূপ যে স্থায়ী নয়, তাহাও সে নিজেই জানে।

ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয় লোকে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাহিত্যের মধ্যেও অধুনা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ জগতে কোনও নূতন সত্যের আবির্ভাবের সহিত যে আনন্দ ও যে ভয় জড়িত থাকে, তাহাকে একজন আধুনিক লেখক cosmic nervousness—বিশ্বের বেপথু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কারণেই ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রার মুখে আধুনিক সাহিত্যে একটি অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা

দিয়াছে। খ্যাতনামা ইংরাজলেখক এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ বলিয়াছেন, "মানুষ সংকীর্ণ দিক্‌চক্রবালের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগৎ হইতে আজ অনন্ত দৃশ্যময় ও ঘটনাময় এক বিশাল জগতে যাত্রা করিতেছে—সেখানকার অস্পষ্টতা ও অন্ধকার তাহার নিকট কি ভয়াবহ!" বিশ্ব যে অসীমের বিচিত্র কাব্য, এই কথাটার আভাসমাত্রে মানুষকে এমনি বিহ্বল করিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ সেই অস্পষ্ট অন্ধকারলোকের পথঘাট আবিষ্কার না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অস্থির ত্রস্ত ভাব পদে পদেই লক্ষিত হইবে।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অশান্ত উত্তেজিত ভাবের লক্ষণই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। টমাস হার্ডি হইতে জন্ গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি, বার্ণাড শ হইতে নিট্‌সে ও মেস্‌ফিল্ড প্রভৃতি সকল সাহিত্যিকের মধ্যে আধুনিক জীবনের যে সুতীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে একটি অদম্য অসন্তোষ বিদ্যমান। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইঁহারা প্রত্যেকেই একএকটি নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিতে চাহেন। নব-সাহিত্যের এই সকল সৃষ্টি বাষ্পলোকের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট ও ছায়াময়। কেননা বাহিরের ও ভিতরের মিলনে নয়—বিরোধের উপরেই এই সকল কবি-সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত।

কালিদাস প্রভৃতির রচনার তুলনায় ইঁহাদের কাব্য যে অসম্পূর্ণ এবং শ্রীভ্রষ্ট, তাহার কারণ পূর্ব্ব কবিদিগের মনে শিবশক্তির যে মিলন ছিল, নব্য-কবিদের মনে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই ইঁহারা ইঁহাদের কাব্যে কোনও নূতন সত্যকে সাকার করিয়া তুলিতে পারেন না, পারেন শুধু নিজ মনের বিকারকে প্রকাশ করিতে।

আধুনিক সাহিত্যের নবজীবনের এই ছটফটানিকে অনেকে দুর্গতির সূত্রপাত মনে করিয়া নিরাশ হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান্ যে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সকল সৃষ্টির বিকাশ। হঠাৎ একদিন এই সংকোচের বাধা অপসারিত হইলে দেখা যাইবে যে, যেখানে সংঘাত ছিল, সেইখানে সঙ্গীত বাজিতেছে, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, সেইখানে সৌন্দর্য্য জাগিতেছে।

মানুষের মন এখন সত্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতেছে —বাহ্যজগত ও মনোজগতের স্পষ্ট পার্থক্য ভুলিয়া উহাদের অস্পষ্ট সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে। এই নূতন অনুভূতির বলে কাব্যে উপমা আবার স্বীয় স্থান অধিকার করিবে, এবং এই নবজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সহজিয়া

ওরে সহজিয়া, কোন্ সহজে
মজেছে তোর প্রাণ !
লাগ্‌ল বুকে কোন্ সহজের
এত কঠিন টান ?
যে সহজ ঐ ফুট্‌ল ফুলে,
লতা-পাতায় উঠ্‌ল দুলে,
যে সহজের ঢেউ লেগেছে
পাখীর কণ্ঠে গান।
ছুট্‌চে নদী সাগর-পানে,
বারণ কারো নাইক মানে,
সহজ রসের ধারায় ভাসে
ধরার বক্ষখান।
অবোধ সুখের নেশার মুখে
এ উহারে টানচে বুকে,
মরণজয়ী প্রাণের চলে
অসীম অভিযান॥

কান্না-হাসির সহজ তানে
আকুল ভরপূর
বিশ্বযাত্রা বাজায় প্রাণে
রাখাল বাঁশীর সুর।
অন্ধ মূঢ় এই সহজে
মজুক যাহার পরাণ মজে,
শিশুর সহজ, কাছের সহজ,
নাই কিছু ওর দূর্।
আসুক ঝঞ্ঝা, লাগুক দ্বন্দ্ব,
বাজুক দ্বিধার দোদুল ছন্দ,
ভালো মন্দ এ ওর পানে
হানুক মরণ-বাণ,
জান্‌বো আমি, চিন্‌ব আমি,
হারবো আমি, জিন্‌ব আমি,
চাখ্‌বো আমি, রাখ্‌বো আমি,
করব খানখান্॥

দেহ মনের কণায় কণায়
চেতন হব আমি।
তারি পরে রঙীন মোহের
আলো আসুক নামি।

ঝড়ের সাথে নাচুক শান্তি,
সত্য সাথে মিলুক ভ্রান্তি ;
যে মরণের সহজ মাঝে
জাগে নূতন প্রাণ
সেই সহজে দুলুক দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের মহানন্দ,
ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার
করুক্ ছন্দ দান ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

দেবতা

ভাগ্যে তোমার নয়ক দেউল মস্ত ইমারত,
যেথায় লোকের হুড়াহুড়ি, রুদ্ধ সদাই পথ।
ভাগ্যে তোমার গৃহে যেতে পাণ্ডা প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুকতে না হয় কায়দাকানুন শিখে।
তাই ত মোরা নৃত্য করি তোমার আঙিনায়,
যখন খুসি দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়।
ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরাণ খুলে শ্রবণমূলে মনের কথা কই।

ভাগ্যে তোমার নয়ক ভোগের মস্ত আয়োজন,
বইতে জিনিস হয়না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার অর্ঘ্য আহরণের বিষম উপদ্রবে
প্রমাদ নাহি গণে দেশের দুঃখী লোকে সবে।
চাষের চালে ঘরের দুধে গাছের ফলে ফুলে
যেদিন যাহা জুটে তাহাই জোগাই চরণমূলে।
পৃথক আয়োজনের কোনো নেইক দাবিদাওয়া
এক থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।

ভাগ্যে তোমার নেইক খেয়াল দেমাক অভিমান,
মোদের চেয়ে অল্প পেয়ে তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মারীভয়ের দিনে তুমি ভাবো মোদের তরে,
বর্ষাকালে মোদের সনে ভিজো ভাঙা ঘরে।
বন্যা-দিনে উপোষ কর আমাদেরি সাথে,
মোদের সনে জেগে রহ উৎসবেরি রাতে।
মন্ত্র কোথা ? প্রাণের ভাষায় তোমার পূজা করি।
অবোধেরও ঠাকুর তুমি কাঙালেরও হরি !

শ্রীকালিদাস রায়।

পঞ্চম সংখ্যা]　　　　ভাদ্র ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

লোকহিত

লোক-সাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোক-সাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, ছোটর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ —যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান;—সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবী করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোক-হিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক্ যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের সয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে,— যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদিবা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না,— সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের ত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী দরিদ্রে পার্থক্য আছে—কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক্ দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের

বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশী-অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক একগ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে কেবলি পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্য্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্য্যন্ত তাহার বেদনাও অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কুপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধূলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আজ পর্য্যন্ত সেই কূপ-খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বারবার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোক-সাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়-দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গল-সাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম

তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড় ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত সুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোক-সাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গ-ভূমিতে প্রধান-নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এই জন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কি হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট-সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোট ছোট রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলি মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারিদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্তা। লোক-সাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতি-

কৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়; এখন বীর্য্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেক-কালের ক্ষত্রিয়-বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের ষ্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয়-নায়কের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানব-সম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্ম্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্ম্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম্ম কলা-সৌন্দর্য্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু ধন জিনিষটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত কর, কেহবা তাহাদের বাড়ীতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহবা আপন উদ্বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোক-সাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না—এবং তাহারা যে, কেহ বা কিছু তাহা কাহারো খবরে আসিত না। এখন ওদেশে লোক-সাধারণ কেবল সেন্সস্-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এই জন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্ব্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ একএকবার আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি চমক খাইয়া

উঠে। বলে, তবে ত আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্ত্তব্য।

ভুলিয়া যাই ওদেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে,—যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্ত-বিনোদন ও অবকাশ-যাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান্ দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজেদের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসার লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে ঐ সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিষের আমদানি

করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা ত প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা। অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোক-সাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিষ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল

সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড় জোর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্ত্তব্য কর, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্ত্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় ত অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞান শিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চ শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে,—সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট—কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্যযোগ বেদান্ত

পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারে, তাহার আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে—একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই ত দেশের অনুভব-শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি মানুষ ততখানি বড়। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে; এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে—তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোক-সাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয় ত আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় হইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাততঃ অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ

সেখানে লোক-সাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরীব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা ত সেই কাজেই লাগিয়াছি—আমরা ত নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি,—সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্ব্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি। সেই দাবী ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্ম্মের জোরের। কিন্তু লোক-সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে, যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি একথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট্ স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্যার

মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট্ স্কুল খোলা অশ্রু বর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনি যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইবে। সোনার আংটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোট হয়—দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই চার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মত এমন দুর্গতিকর

আর কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি;—নিম্নতনদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির পরে নহে, এই নিরন্তর সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন একরাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রাও নাই।

আশ্চর্য্য এই যে আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্ব্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে ঐ যে আতা-গাছের ডালে একটা গিরিগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব এটা তত কঠিন না—কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারি জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিলনা—এমন কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু আজ যখন আর পর্দ্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মত কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল!

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড় কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ স্বয়ং ধর্ম্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্যলোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত-ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার-ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল-জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না—এবং সাতসমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিষ বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি 'হকার'কে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া

মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা-ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁৎ। ইহাতে বাল্য-লীলায় মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্ত্তি হইত। আমাদের মাষ্টার হইতে মুদি পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্ত-বাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণ-শক্তির সবুজ্ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক—বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয়-বছরের ছোট। আমি তার শাসনকর্ত্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কি স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত ;—কেন জানি না তার মধ্যে বড়-একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারো হাত ধরিতে চায়—তার সেই কচি

আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম একথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাৎ একদিন কোনো-একদিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে ত সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্ব-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার-ঘরের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কি যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলি তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলি বলিতে হইত, "অনু, এ সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোট বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কি বাজে কথা বলিত—তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখী নাই সেখানেও পাখী আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো-খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি—বলিয়াছি, উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনি তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুসি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিল বাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল আমার মত ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারো মনে এটা ছিল কোনো কন্যার পিতার চোখ-এড়াইবার মত ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম বি-এল্ পাস-করা একটি টাট্‌কা মুন্সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরীব—আমি ত জানিতাম সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রাণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জ্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কি বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জ্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরো ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে ত চিরকাল ছোট করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরো ছোট করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না

সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড় অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক্—এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে, একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে বড় ঠকান ঠকিয়াছি। খুব কষিয়া কাজের-লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের-লোক হইবার সব-চেয়ে বড় সরঞ্জাম নিজের পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কম্‌তি ছিল না। এ জিনিষটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্‌ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামৎ, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্‌ জিনিষের কত দর, বাজার দর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান্‌, এষ্টিমেট্‌ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মত ওস্তাদি আমি এক-রকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না এমন ভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনি আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল্‌ না দিলে ব্যবসা চলে না এমন

কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্ল্যান, এষ্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক ত পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল, তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না। প্রসন্নর মুখটাকে বড় ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্ম্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, ভাই আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্য্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।

প্রসন্নর মুখে এত বড় কথাটা যে কতই বড় তাহা প্রসন্নর

সঙ্গে যারা এক-ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব-করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা—কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাৎ করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্ম্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ আবার কর্ম্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।

তখন ব্যবসা-ক্ষেপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে কেবলমাত্র মূল-ধনটার জোগাড় হইলেই উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপদাদা সকলেই একদিনেই সকল প্রকার ব্যবসা পূরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, আমার সম্বল নাই যে।

সে বলিল, বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কি?

তখন হঠাৎ মনে হইল প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, ঠাট্টা নয় দাদা! সততাই ত লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না—কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্ব্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান যতই আনাই বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পঙ্গপালের মত খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে কিছুই জানি না; টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয় টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল—ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল—যে, খুচরা-দোকানদারীর কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যবসা সেই ত ব্যবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মত অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে লাল এবং কালো কালীতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার

পায়ের ধূলা লইতে যায় আর কি ! সে বলিল—মনে বিশ্বাস ছিল আমি এসব কিছু-কিছু বুঝি .কিন্তু আজ হইতে দাদা তোমার সাক্‌রেদ্‌ হইলাম।

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য ---মনে আছে ত ? কি জানি হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও মুনফাকে কোনো মতেই শতকরা বিশ পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারীর সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়—তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল অথচ আমিই যে কারবারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মৎলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার

পৈতৃক খ্যাতি এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয় কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে। আমি জানিতাম ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মত এক-গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্য্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মত রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরো একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে, কেহ বলিত আরো অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই ত। অনু ত তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড় হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।

আমি বলিলাম, যে রকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।

প্রসন্ন কহিল—যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আসিয়াছে তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চল।

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা! দুর্ব্বলতার দিনে মানব প্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্ব্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ঙ্কর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না তাই নির্ব্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম আমি সর্ব্বনাশের শেষ-কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, খোল দেখি। খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়-রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, আমি ত আজ বাদে কাল মরিবই কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন?—এমনি করিয়া সে সুবোধকে এবং সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাৎ করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি আমার আর বেশি দিন নাই। পর্শু ভাই-ফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাই-ফোঁটা দিয়া যাইব।

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না।

সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মত। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব—পৃথিবী যেন তাকে পূরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, কি হইল?

আমি বলিলাম, আজ আর সময় হইল না।

সে কহিল, মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যু-সরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্ব্বনাশকে আমার তেমন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাই-ফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্ত্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড় খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়া ছিলাম। কথা ছিল আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল। আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, বৌদিদি এলেন না ?

আমি বলিলাম, শরীর ভালো নাই।

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়া ছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই সব অনেক দিনের অতি ছোট কথা আমার আসন্ন সর্ব্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড় হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাই-ফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের

যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, সুবোধের জন্য এই যা কিছু এতদিন আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।

আমি বলিলাম, অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখাশুনার কোনো ত্রুটি হইবে না কিন্তু টাকা আর-কারো কাছে রাখিয়ো।

অনু কহিল, এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যে রকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশি দিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাত-চল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে—আরো কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।

আমি কহিলাম, অনু আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মত শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে?

অনু কহিল, আমি যে জানি আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।

আমি কহিলাম, কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।

অনু কহিল, আমি তোমাকে জানি, ধর্ম্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে তবে বৌমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বৌদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুইদিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া টিনের বাক্স-হাতে গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেম্‌নি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, খবর ভালো ত?

আমি বলিলাম, এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।

প্রসন্ন কহিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—সে জানিনা—যা হয় তা হোক্, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।

প্রসন্ন বলিল, তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে মানুষের মনের বড় বড় পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টা। টীকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড় বড় আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড় ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর,—সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু, কিন্তু তার কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, খেলাধূলা সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড় খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল অথচ ও-টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগ্‌ড়াইয়া গেল যে সুবোধের

কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কি-এক-রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়, কি দেখে কি ভাবে তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ—সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না—তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই সব ছেলের মুস্কিল এই যে ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এই জন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিষপত্র সে কেবলি হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড় খারাপ। আবার মুস্কিল এই যে ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে—তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ,—ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্ম্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই

সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল,—সে আপনাকে এবং আপনার চারিদিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সাম্‌নেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কি-একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালী করাটা যে কত মিথ্যা ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়—আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে সুরু করে, এবং নিজেকে সামলাইবার মত বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে,—নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু' চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু' চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে,— কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলি বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এম্‌নি অভ্যাস হইয়াছিল যে সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অমু ত উঁইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে কিন্তু ও ত ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম্ম হয় না।

অল্পবয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছু দিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারিদিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারো শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্ব্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলি দিন ফিরায়। অবশেষে যে দিন নিশ্চিত দিবার কথা সে দিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, সুবোধকে ডাকিয়া দাও।

সে বলিল, সুবোধ শুইয়া আছে।

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে?

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।

সর্ব্বদা আমার ফাইফরমাস খাটিয়া সুবোধ এ সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাতদিন লাগে। এক একদিন দেখি বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে—সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়—চলিবার সময়ে যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্ম-কুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর? যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, সে হচ্চে তুমি, আলস্য-মহাসাগর।—পারৎপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্ম্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল—রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল হয় ত প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে—সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিষটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি বিশেষত ছোট ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ

ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল ইহার গতি কি হইবে ? আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কি করিয়া ? সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদ-মস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না। সুবোধ বলিল, টাকা পাই নাই।

আমি ত সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই তবে সে কেন বলিল টাকা পাই নাই। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে,—কোথাও লুকাইয়াছে। এই সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সয়তান। আমি বহুকষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, টাকা বাহির করিয়া দে !

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, না, দিব না, তুমি কি করিতে পার কর !

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনোমতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত !—ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত

হইতে লাগিল—ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারিদিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা-জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম;—আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল সন্ধ্যাতারাটি ভাই-ফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় একমুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন—মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কি করিলাম, এ কি করিলাম,—ভগবান আমাকে এ কি বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কি দরকার ছিল—আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্ত্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতর নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চির-দিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কি মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম তখনো রৌদ্র

আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়বাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হোক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কি সুন্দর তার মুখখানি, কি করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, আয় বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না—ভাবিল আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, এ যে একেবারে ক্লান্তির চরমসীমায় আসিয়াছে। কি করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল?

আমি বলিলাম, আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, এ ত একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন

করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় ত বাঁচিবে কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েক-দিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, এইটি তুমি রাখ।—বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় ত মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয়-ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাড়ি

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহনরাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল ক্ষেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দ্দিনে ভাবল মনে কি সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে?

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে ?
শাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেক্‌বে এসে কে জানে তার পাতী,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আস্‌বে রাতারাতী,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে ?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে ?
নাহি জানি পূর্ণ করে' কোন্ রতনের বোঝা
আস্‌চে তরী বেয়ে ?
নহে নহে, নাইক মাণিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে ?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপচে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরী হবে
আস্‌তে তরী বেয়ে।
বাজ্‌বেনাকো তুরী ভেরী, জান্‌বেনাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আস্‌বে নেয়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাজের জীবন

ব্যক্তিগতভাবে জীবনসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সমাজেরও যে একটি জীবন আছে একথা আমাদের অনেকেরই বড়-একটা মনে থাকে না। সমাজ যে একটা শৃঙ্খল বা পিঞ্জর-বিশেষ তাহা আমরা সকলেই জানি, কেননা আমরা সকলেই সেই শৃঙ্খল বা পিঞ্জরে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তোমার আমার সেই শৃঙ্খল বা পিঞ্জর ভাঙিবার ইচ্ছা হইতে পারে। সে ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং বোধগম্য। কিন্তু সমাজের অন্তরেও যে ঐরূপ কোনও ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে ইহা আমাদের অনেকেরই পক্ষে এতই অজ্ঞাত যে, সে সত্য আমাদের কল্পনারও অগম্য।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই বিশ্বসংসারকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ক্রমশঃ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছি। যাহা-কিছু হইয়াছে, বা হইতেছে, বা হইবে—সমস্তই গণ্ডীর মধ্যে। এই ভাবটি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি ঘুরিতেছে, কিন্তু নিজের নিজের বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া। সমুদ্র ও বেলাভূমির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, কিন্তু তাহাদেরও একটি সন্ধিস্থল আছে। নদী বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহারও একটি খাত আছে। এগুলিকে আমরা বলি প্রকৃতির নিয়ম। তুমি ভাল কবিতা লিখিতে পার, কিন্তু কবিতা-লিখিবার কতকগুলি নিয়ম আছে, তাহার ব্যতিক্রম করিলে চলিবে না। তুমি ভাল ছবি আঁকিতে পার, তাহারও নিয়মাদি আছে; সেগুলি তোমার শিরোধার্য্য। তোমার ইচ্ছা দানধ্যান করিবে, ধর্ম্মে মন দিবে,

বিশ্বের নিগূঢ় চিন্তায় আত্মহারা হইবে; সে সম্বন্ধেও ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থাদি আছে। যাহা কিছু করিবে, সেই ব্যবস্থা-অনুসারে করিবে। ফল-কথা—বিশ্বসংসার, মানবজীবন, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সমস্তই নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। গণ্ডীর পরপারে যাইবার কাহারও অধিকার নাই,—এমন কি গণ্ডীর সীমা বাড়াইবার বা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ধৃষ্টতামাত্র।

অনেকের মতে মানব-সমাজ উপরোক্ত একটি বৃহৎ গণ্ডীবিশেষ। ব্যক্তিমাত্রেরই ইচ্ছা—নূতন দেখিব, শুনিব, করিব ইত্যাদি। সমাজ সেই ইচ্ছার স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি আমি আজ আছি, কাল কোথায় থাকিব ঠিকানা নাই। কিন্তু সমাজ চিরন্তন। কাজেই তোমার আমার একটা নূতন-কিছু করিয়া, একটা ওলটপালট করিবার বা গোলমাল বাধাইবার কি অধিকার আছে? যে জমিদার সেই জমির মর্ম্ম বোঝে। দু'দিনের মেয়াদে আবাদ করিতে যে লোক জমির জমা লইয়াছে, তাহার প্রাণ কি জমির জন্য কাঁদে? তাহার ইচ্ছা কোনো-মতে দু'পয়সা করিয়া লয়। তার পর যা হয় তার ভাবনা, সেই জমিতে যার চিরস্থায়ী স্বত্বস্বামিত্ব আছে, সেই দুনিয়ার মালিক ভাবিবে।

আমাদের দেশে Hobbes-এর Leviathanএর ন্যায় কোন পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না জানি না। Hobbes Stateকে Leviathan-পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। Leviathan জন্তুটি কি তাহা জানি না, বোধ হয় অজগরের জুড়ি কোনও প্রকাণ্ড সর্ব্বগ্রাসী জীব হইবে। আমরাও এদেশে সমাজকে একটি মহামহিম Leviathan করিয়া তুলিয়াছি। তাহার ফল হইয়াছে, সমাজের পূর্ব্বে যে জীবন ছিল, তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। সমাজ মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, আজও প্রেতযোনির ন্যায় আমাদের চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবন্ত লোকের সংসর্গে আশা, বিশ্বাস ও সাহসের উদ্রেক হয়, আর মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে হয় ভয় ও উৎকণ্ঠা। সমাজের সংস্পর্শে আমাদের আশা, বিশ্বাস ও সাহস দূরে পলায়ন করিয়াছে; কেবল আছে ভয়, এবং কখন রাত্রি প্রভাত হইবে সেই উৎকণ্ঠা।

সমাজকে আবার সজীব করিতে হইলে, তাহাকে তাহার পুরাতন স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হইবে। এমন কি তাহাকে পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছা-চারিতার শক্তি দিতে হইবে। যথেচ্ছাচারিতা শব্দ শুনিয়া কানে হাত দিবেন না। যে দেশের ইতিহাস আছে সে দেশে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এক-যুগের যথেচ্ছাচারিতা, সমাজের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরযুগের সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বর্ত্তমানে সমাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ বাঁধিতে গিয়া নিজে বাঁধা পড়িয়াছে। সেই বন্ধন হইতে তাহাকে ছাড়াইতে হইবে। যে নিয়মাবলীর দ্বারা সমাজ আমাদিগকে এতদিন শাসন করিয়া আসিয়াছে, সে এখন নিজেই সেই নিয়মাবলীর শাসনে নিপীড়িত হইতেছে। সেই শাসন হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। ফলকথা, সমাজকে স্বাধীন করিতে হইবে। এস্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন,—সমাজ স্বাধীন হইলে চলিবে কেন? ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচারিতার দমনের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। তুমি আমি যদি কিছু বাড়াবাড়ি বা তাড়াতাড়ি করিতে যাই, অমনি সমাজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও বাধা দেয়। শাসন করিবার অধিকার একমাত্র সমাজেরই আছে—সুতরাং নির্ব্বিচারে শাসিত হওয়াই ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি সমাজকে স্বাধীনতা

দেওয়া হয়, সে যখন নিজের সীমা অতিক্রম করিবে, তাহাকে কে সামলাইবে? কাজেই সমাজকে স্বাধীনতা দিলে চলিবে না। গুটিপোকা যেমন নিজের গুটিতে আবদ্ধ, সমাজও সেইরূপ নিজের নিয়মে আবদ্ধ, এবং চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে।

যুক্তিতর্ক অনুসারে এ কথার কোনো উত্তর আছে কি না জানি না। স্বাধীনতা ভাল বটে, কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, আর তখন সমাজ আসিয়া তাহার প্রতীকার করে। কিন্তু সমাজ যদি প্রকৃত স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রতীকার কে করিবে? ইহা অবশ্য একটি বড়ই দুরূহ প্রশ্ন, এবং ইহার কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এখন কথা এই—আমরা কি চাই? চারিদিক আটঘাট-বাঁধা একটি দীর্ঘিকা? না দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে, জল থইথই করিতেছে, এমন একটি ভরা গাঙ? যাঁহারা প্রথমটি চান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু আর দশজনে চান একটি পর্ব্বত-বাহিনী স্রোতস্বিনী, যাহার গতি আছে লীলা আছে, এবং যাহার মাঝে মাঝে দুকূল ভাসাইয়া পার্শ্বস্থ গ্রাম জনপদ প্লাবিত করিবার শক্তি আছে। এক-কথায় যাহার প্রাণও আছে বানও আছে। আমি হয় ত নদীর ঢেউ দেখিলে ভয় পাই। কিন্তু আর দশজনে হয় ত সেই ঢেউয়ে গা ঢালিয়া দিয়া মরিয়া-হইয়া ভাসিয়া যাইতে চায়। আপনি হয়ত বলিবেন, কি পাগলামি! তাহার উত্তর "ভিন্নরুচির্হি লোকা"। এই দুয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ ঠিক, এই ত সমস্যা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তীমহাশয় "সমাজের জীবন" প্রবন্ধে যে সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মীমাংসা তর্কশাস্ত্র খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু জীবন নিজের বলে সে মীমাংসা নিজেই করিয়া লয়। সামাজিক জীবন লজিক অনুসরণ করে না—কিন্তু লজিক জীবনকে অনুসরণ করে। সমাজে নবজীবনের লক্ষণ তার্কিকের বিচার-বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া দেখা দেয়। ইহার প্রমাণ সকল দেশে, সকল কালে পাওয়া যায়। লজিকের উদ্দেশ্য জানা-পদার্থকে মনের ঘরে সাজাইয়া রাখা—কিন্তু জীবনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কিছু-না-কিছু অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব থাকেই থাকে। এই কারণেই লজিক জীবনের কাছে হার মানে। সমাজ যেমন জীবনকে একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করে, তেমনি মানুষের মনকেও একটি গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করে। সামাজিক-জীবন তাই নিয়ত সামাজিক-মন বলিয়া একটি পদার্থ গড়িয়া তুলিতে চায়। ব্যবহারিক-জীবন ব্যবহারিক-মন তৈরি করে। কোনও সমাজের সকল লোকের মন যদি কেবলমাত্র ব্যবহারিক মন হইত, তাহা হইলে অবশ্য স্বরচিত গণ্ডীর মধ্যেই সামাজিক জীবনের সমাধি হইত, কেননা একদিকে যেমন সামাজিক-জীবন সামাজিক-মনকে সীমাবদ্ধ করিতে চায়, অপরদিকে সামাজিক-মনও সামাজিক-জীবনকে তদ্রূপ সীমাবদ্ধ করিতে চায়। কে কাহাকে সঙ্কীর্ণতর করিতে পারে, এই লইয়া উভয়ের ভিতর রেষারেষি চলে। কিন্তু জীবন্ত সমাজ যেমন নিজের ব্যবহারিক গণ্ডী অতিক্রম করে—জীবন্ত মনও তেমনি তাহার ব্যবহারিক গণ্ডী অতিক্রম করে। সমাজ যখন উন্নতির পথে যাত্রা করে, তখন সমাজের মনের

এক-অংশ পিছনে পড়িয়া থাকে, আর-এক অংশ বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। সমাজ লইয়া যাহা-কিছু তর্ক তাহা এই দুই পক্ষের মধ্যেই হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তর্ক চলিতে থাকে, ততক্ষণ সমাজের জীবন অলক্ষিত ভাবে নিজের পথে অগ্রসর হয়। জীবন্ত সমাজের জীবন্ত সাহিত্যে এই দুই প্রকারের মনই প্রতিফলিত হয়। এদিকে সমাজের জীবন, যাহাদের মন অগ্রগামী ক্রমে তাহাদের নিকটে আসে, আর যাহাদের মন পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাদের নিকট হইতে আরও দূরে চলিয়া যায়। তাহার কারণ বহুলোকের মনে যা অস্পষ্ট আকারে রহিয়াছে, তাহাই আশার ভাষায় স্পষ্ট ও সাকার হইয়া উঠে। আর যে সমাজ মৃত্যুর পথে যাত্রা করে, স্মৃতির ভাষাতেই সে নিজেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক।

অনার্য্য বাঙ্গালী

বাঙ্গালী যে অনার্য্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে না। বছর-দশেক আগে যখন রিজলি-সাহেবের কেতাব বার হয়েছিল, তখন আমাদের অনেকের মন বিগড়ে গিয়েছিল—এবং কথাটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু কথাটাকে আর তো চাপা দেওয়া যায় না। সেদিন সাহিত্য-সম্মিলনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় তো স্পষ্টই বলে দিলেন যে, যদিওবা আমরা আর্য্য হয়ে থাকি, তবু অনার্য্য আমরা তার পূর্ব্বে এবং তার চেয়ে বেশি। খোট্টা, মারাঠা, ইংরেজ, জার্ম্মান আমাদের ভাই হ'লেও অনেক দূর-সম্পর্কের ভাই; তেলেগু, তামিল, চীনে, বর্ম্মান আমাদের নিকট-সম্পর্কীয় ভাই।

কিন্তু অভিমানের কথা এর মধ্যে কিছু নেই—বরং অনেকটা আশার কথা, অনেকটা সোয়াস্তির কথা আছে। এতকাল আমরা আর্য্য হ'বার বৃথা-চেষ্টায় কাটিয়েছি। আর্য্য-সভ্যতা যে আমাদের সভ্যতা, আর্য্য-ইতিহাস যে আমাদের ইতিহাস, আর্য্য-ধর্ম্ম যে আমাদেরই সহজ ধর্ম্ম, এই মিথ্যা কথার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের ঢের ভুগতে হয়েছে। আমাদের ধর্ম্ম যে অন্যরূপ, আমাদের স্বভাব যে খোট্টা, মারাঠা, জার্ম্মান, ইংরেজদের স্বভাব হতে ঢের স্বতন্ত্র—এর মধ্যে অনেকটা আরাম এবং শান্তি আছে।

আর্য্যদের নীতিশাস্ত্র, আর্য্যদের system of values বা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের পরীক্ষা করবার আর আমাদের দরকার নেই, আর্য্যদের কষ্টিপাথরে আর আমাদের আছাড়-খেয়ে মরবার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই;—এতে যে কত লাভ, তা আর্য্য এবং অনার্য্যের স্বভাব একটু বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যাবে না।

আর্য্যদের সম্বন্ধে প্রথম কথা এবং শেষ কথা হচ্চে এই যে, সংসারে আর্য্যদেরই জিৎ। এ কথাটা আর-এক-রকম করে সাধারণতঃ আমাদের কাছে খাড়া করা হয়। সে হচ্চে এই যে, আর্য্যদের চরিত্র-বল বা character আছে, আমাদের নেই। এই চরিত্র-বল নিয়ে আর্য্যদের চীৎকারের বিরাম নেই, শ্রান্তি নেই।

স্পষ্টবক্তা বন্ধুদের কাছ থেকে তো জন্মে অবধি শুনে আসছি—বাঙ্গালীর character নেই। কথাটা খুব শক্ত বলেই বোধ হ'ত, এবং এ কলঙ্ক যে অত্যন্ত অন্যায় এবং মিথ্যা, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমরা আমাদের বিচার-কর্ত্তাদের অমুক অমুক আর অমুক বাঙ্গালীর জীবন-চরিত আলোচনা করতে বরাবর ব'লে এসেছি। কিন্তু এখন এই চরিত্র-বল ব্যাপারটা কি, তা একটু খুঁটিয়ে দেখবার সময় এসেছে।

চরিত্র বা character হচ্চে মানুষের সেই জিনিষ, যা হ'তে মানুষটাকে এক-নিঃশ্বাসে পড়ে' ফেলা যায়। অমুক-অবস্থায় পড়লে অমুক-লোকটা কি করবে, তা আগে থেকে যা হ'তে বোঝা যায়—তারই নাম হচ্চে character। এই characterএর সঙ্গে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, দেমাক, অহঙ্কার ইত্যাদির কোনও

সম্বন্ধ নেই—অর্থাৎ বুদ্ধি কি বিদ্যা থাকলেই যে character থাকবে, তা বলা যায় না।

এই character জিনিষটার মূল্য সমাজের কাছে খুব বেশি। কারণ সমাজের পক্ষে যা সুবিধাজনক তাই মূল্যবান। প্রত্যেক মানুষের গতিবিধি যদি আগে থেকে নির্ণয় করতে পারা যায়, তা হ'লে সমাজের ঢের গোলমাল বেঁচে যায়। কাজেই character জিনিষটা সামাজিক গুণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

কিন্তু ব্যাপারটার আর-এক দিক আছে। জীবিত ও মৃতের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, মৃত বস্তুর character সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। একটা যন্ত্রের চলন যে কোন্-দিকে হ'বে, তা বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না। পরমাণুর সমষ্টি এবং জীবাণুর সমষ্টির মধ্যে তফাৎ হচ্চে এই যে, জড়-সমষ্টির পূর্ব্ব-ইতিহাস যদি জানা থাকে, তাহ'লে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বাহিরের জ্ঞাত শক্তি এবং নিয়মের ফলে তার চিরকালের ভবিষ্যৎ-ইতিহাস অঙ্কশাস্ত্রবিশারদগণ নির্ণয় করে দিতে পারেন;—কিন্তু জীবাণু-সমষ্টির সম্বন্ধে এ কথা খাটবে না। জীবাণুর পূর্ব্ব-ইতিহাস ভবিষ্যৎ-ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা খবর দিতে পারে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ খবর দিতে পারে না। যে পরিমাণে সে জীবাণুগুলি জড়গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ, সেই পরিমাণে সে খবর সঠিক হবে।

এ তো গেল "দার্শনিক গবেষণা।" এ কথাটাকে সহজ-কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, জীবন বলতে যে স্ফূর্ত্তি, যে স্বাধীনতা, যে আনন্দ বোঝায়, চরিত্র গঠন করতে গেলে তার কতকটা হ্রাস

করা দরকার। এবং যার যে পরিমাণে সেই স্বাধীন আনন্দের অভাব, তার চরিত্র সেই পরিমাণে গঠিত। *

এক-কথায় একগুঁয়েমি, একদেশদর্শিতা এবং অল্পবুদ্ধি, চরিত্র-গঠনের পক্ষে পরম উপযোগী। যদি তুমি সমুখে ও আশেপাশে বেশি দূর এক নজরে দেখতে পাও, যদি তোমার বুদ্ধি ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে থাকে, যদি তুমি নিজেকে চিনতে শেখ, তাহ'লে তোমার জীবনে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হবে না, কাজেই তোমার চরিত্রও দৃঢ় বা সীমাবদ্ধ হবে না। যদি তুমি প্রাণের আনন্দে অধীর হও, যদি তুমি পৃথিবীর গানে, গন্ধে, আঁধারে, আলোকে বিচলিত হও, তবেই তুমি "চরিত্রশূন্য" ;—যদি তুমি সংসারের ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব, এবং মানুষের মুখে, আকাশের গায়ে, লতায় পাতায়, সততপরিবর্ত্তনশীল নিত্য-নবশ্রী দর্শনে অভিভূত হও, তাহলে বলতে হবে তুমি চরিত্রহীন—তোমার character নেই।

অর্থাৎ মাতা বসুন্ধরার চিরপরিবর্ত্তনশীল, চির-অদ্ভুত, নিত্য-নূতন, অজস্র সৃষ্টি-লীলা যদি তোমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়; মুহূর্ত্তের জন্য যা সত্য তা যদি তুমি সেই-মুহূর্ত্তেরই জন্য সত্য বলে মান; যদি তোমার জীবন কবিত্বে ভরে উঠে থাকে,—তাহলেই তুমি চরিত্রহীন, সমাজের কাছে চির-দোষী।

পূর্ব্বেই বলেছি, আর্য্যজাতি চরিত্রবানের জাতি। এঁদের কাছে সমাজ মানুষের চেয়ে বড়। অন্ততঃ এঁরা মানুষকে সমাজ হতে

* এইখানে আর্য্যদের "সংযম" সম্বন্ধে অসংযত চীৎকারটা বোধহয় ধ্বনিত হবে! কিন্তু সংযম ও রিক্ততার মধ্যদেশ বড় পিচ্ছিল।

বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন না। ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে আরিষ্টটলের বচন ঃ—"মানুষ সামাজিক জীব।" ভারতবর্ষের আর্য্যগণ যদিও একথা এমন স্পষ্টভাবে ব'লে সমাজ গড়তে বসেন নি, তবুও বর্ণাশ্রম থেকে বোঝা যায়, এঁদের নিকট সমাজ কত আঢ্য ছিল, এবং দৃঢ় চরিত্রগঠনের জন্য কত-না কাণ্ড এঁরা করে গেছেন।

যাঁরা ভাবুক, যাঁরা কবি, যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা চরিত্রহীন; আর্য্য-সমাজ চিরকাল তাঁদের ঘৃণা করে এসেছে, সমাজ চিরকাল তাঁদের বাহিরে রেখেছে। তাই তাদের কাছে কালিদাস দুশ্চরিত্র, Shakespeare লক্ষীছাড়া, Michel Angelo গোঁয়ার, ইত্যাদি।

অনার্য্যগণ কিন্তু আর্য্যদের সমাজ-বন্ধনকে বন্ধন বলেই মনে করে এসেছে চিরকাল। বড়-সাধের, কত-কষ্টের সমাজকে অনার্য্যগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রমাগত ঘা দিয়েই এসেছে।—এর প্রমাণ তৈমুর, চেঙ্গিজ-খাঁ, সক, হূন, গথ ইত্যাদি—আর এর প্রমাণ হচ্চে বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা।

আসল কথা হচ্চে এই যে, আর্য্যেরা কর্ম্মী, জয়ী। কিন্তু অনার্য্যেরা বিজিত এবং সংসারে হীন হলেও স্বভাব-কবি—মাতা ধরিত্রীর কোলের সন্তান। আর্য্যদের চাইতে এঁরা মায়ের নিকটতর।

আর্য্যেরা ধীর, অনার্য্যেরা চঞ্চল। আর্য্যদের সর্ব্বোচ্চকীর্ত্তি দর্শনশাস্ত্রে, কিন্তু অনার্য্যদের সুন্দরতম কীর্ত্তি কবিতায়, কলায়। এঁরা পৌত্তলিক, এঁরা গায়ক, এঁরাই শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা। আর্য্যদের অভিমত যাই হোক, আমাদের অনার্য্যদের আত্ম-প্রসাদের যথেষ্ট কারণ আছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু।

ইউরোপে কুরুক্ষেত্র

ইউরোপে কুরুক্ষেত্র আজ যে বেধেছে, সেটি তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কাল তা বাধেনি। যে দেশের আপামরসাধারণ সকলেই সশস্ত্র,—সে দেশে "দিন যায় ক্ষণ যায় না" এ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ইউরোপের প্রতি রাজ্যের প্রায় সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয়িত হয়েছে। দেবতার আরাধনা নয়, বিজ্ঞানের সাধনা করে ইউরোপ যে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেছে, তা এদেশের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকদের উদ্দাম কল্পনারও অতীত। মানুষ-মার্‌বার এমন কল মানুষের হাতে পূর্ব্বে কখন তৈরি হয় নি। সে কল মাটির উপর ছুটে বেড়ায়, সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করে, জলে ভাসে, ডুব-সাঁতার দেয়, পাখীর মত আকাশে ওড়ে, বাজের মত মাথায় ভেঙে পড়ে। আর এই সকল কল চালাবার জন্য লক্ষ লক্ষ স্থলচর সৈন্য, সহস্র সহস্র জলচর সৈন্য এবং শত শত খেচর সৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এতদিন ধরে ইউরোপের বাহিরে শান্তি থাক্‌লেও, অন্তরে শান্তি ছিল না। যুদ্ধের এই বিরাট আয়োজন ইউরোপে সকল জাতির মনে একটি সর্ব্বনাশী মারী-ভয়ের মত চেপে ছিল। জীবনের আলোর পাশে এই মৃত্যুর ছায়া দিনের পর দিন এমনি ঘনীভূত হয়ে এসেছে যে, এ আশঙ্কা মানুষের মনে সহজেই উদয় হয় যে, একদিন হয়ত মানবের স্বহস্তরচিত এই অন্ধকার, ইউরোপীয়

সভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস কর্‌বে। এই কারণ ইউরোপ একদিকে যেমন লড়ালড়ির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি শান্তি-রক্ষার জন্যও লালায়িত হয়েছিল। যারা বারুদের ঘরে বাস করে, তারা আগুন নিয়ে খেলা কর্‌তে পারে না। যাতে ইউরোপের ঘরে আগুন না লাগে, সে ভাবনা ইউরোপের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। কিন্তু আজ সে আগুন লেগেছে। এ অগ্নিকাণ্ডের শেষ যে কোথায়, আজ তা কেউ বল্‌তে পারেন না। এ আগুনের আঁচ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির গায়ে লাগবে, আমরাও বাদ যাব না। ইউরোপের নানা দেশের নানা জাতির স্বার্থের সংঘর্ষে এই সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডেই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে।

(২)

এই যুদ্ধটি কতকটা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত ইউরোপের মাথার উপর এসে পড়েছে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে চিরদিন স্বার্থ নিয়েই লড়াই হয়। কিন্তু আজ একমাস পূর্ব্বে ইউরোপে এমন কোন রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হয় নি, যার মীমাংসা তরবারির সাহায্য ব্যতীত অপর কোন উপায়ে হতে পারত না। ইউরোপে গত দশ বারো বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুচারবার অতি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু দশে মিলে তার আপোষে মীমাংসা করে নিয়েছেন। সুতরাং দূর থেকে আমাদের মনে হয় যে নিতান্ত অকারণে, বা অতি তুচ্ছ কারণে এই প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আদার ব্যাপারী হলেও জাহাজের খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারিনে। কেননা আজকের দিনে জাহাজ বাদ দিয়ে কোনও ব্যাপার নেই।

সুতরাং পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ কর্‌বার জন্য কে দায়ী, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা নয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সার্ভিয়া, রাসিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড বলেন দোষী জার্ম্মানী। এমন কি জার্ম্মানীর মিত্ররাজ্য ইটালিও স্পষ্টাক্ষরে এই মতেই সায় দিয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি-বিচ্ছেদ করেছেন। অর্থাৎ ইউরোপে জার্ম্মানেতর সকল জাতিই একবাক্যে জার্ম্মানীর উপরই দোষারোপ কর্‌ছে। অপর-পক্ষে জার্ম্মান-সম্রাট ঈশ্বর সাক্ষ্য করে, মুক্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, অপরে জোর করে তাঁর হাতে তলোয়ার গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু সে অপর যে কে, তার কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ এ স্থলে অপর শব্দের অর্থ বিশ্বমানব। Prince von Bulow এই স্পর্দ্ধা করেছেন যে, যেহেতু পৃথিবীর অপর সকলে ভূতপ্রেত, সে কারণ তাঁরা সূর্য্যলোকে কিম্বা সূর্য্যালোকে বাস কর্‌বেন। আত্মশ্লাঘা করাটা হাল জার্ম্মান-রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। লোকে বলে এক হাতে তালি বাজে না, কিন্তু এক হাতে যে চপেটাঘাত করা যায় না, এ কথা কেউ বলে না। জার্ম্মানীই যে অকারণে সমগ্র ইউরোপের গণ্ডে চপেটাঘাত করেছেন, তার প্রমাণ Bulow-র সদ্য-প্রকাশিত Imperial Germany নামক গ্রন্থ হতেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বহুকাল জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর মুখেই জার্ম্মান-রাজনীতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে। Bulow-র মতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জার্ম্মানী অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল বলে, জার্ম্মান জাতির কোন রাষ্ট্রবল ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানী বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে ইউরোপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ইউরোপে আজ জার্ম্মানী যে

সর্ব্বাগ্রগণ্য সর্ব্বশক্তিশালী জাতি, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী সমগ্র পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাটা তার জাতীয় কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছে। শুধু ইউরোপে নয়, সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া জার্ম্মানীর কপালে লেখা আছে, এবং বিধাতার সে লিপি কেউ খণ্ডন করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে অদৃষ্ট ও পুরুষকার একত্রে মিলিত হয়েছে। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মান-জন-সাধারণের বীর্য্য আছে অতএব ধৈর্য্য আছে, শক্তি আছে অতএব সংযম আছে, সাহস আছে অতএব ভরসা আছে। অপর-পক্ষে জার্ম্মান রাজপুরুষেরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও দূরদর্শী, একাগ্র ও একনিষ্ঠ। বাহুবল এবং বুদ্ধিবলের এহেন মিলন পৃথিবীর কুত্রাপি আর হয় নি। পূর্ব্বোক্ত কারণে জার্ম্মানী তার মহত্ত্বের ও প্রভুত্বের ব্রত উদযাপন করতে বাধ্য। সমস্ত পৃথিবীর উপর Made in Germany এই ছাপ মেরে দেওয়াটাই হচ্ছে জার্ম্মান-রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

জার্ম্মানী যে মন্ত্রের সাধন করছে, Prince Bulow-র মতে তার সিদ্ধির পথে দুটি অন্তরায় আছে—এক ফ্রান্সের শত্রুতা, আর-এক ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

ফ্রান্স জার্ম্মানীর গৃহশত্রু; তার স্পষ্ট কারণ এই যে ফ্রান্স আজও আল্‌সেস্ লোরেনের কথা ভুলতে পারে নি, আর তার গূঢ় কারণ এই যে ফ্রান্স আজও তার পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলতে পারে নি। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে ফ্রান্স ইউরোপের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ছিল। এই অতীত গৌরবকাহিনী ফ্রান্সের মজ্জাগত হয়ে গেছে। সুতরাং জার্ম্মানীর বর্ত্তমান প্রাধান্য ফ্রান্সের নিকট অসহ্য, এবং তার

জাত্যভিমানে নিত্য আঘাত করে। তারপর ফরাসী জাতি স্বভাবতঃই অধীর ও চঞ্চল, উদ্যমশীল ও যুদ্ধপ্রিয়। ফরাসীদের জাতীয় স্বার্থজ্ঞানের চাইতে জাতীয় আত্মজ্ঞান অনেক বেশি। Prince Bulow-র মতে, এ জাতির মনে লাভের চাইতে ভাবের প্রভাব বেশি (It is a peculiarity of the French nation that they place spiritual needs above material needs); তা ছাড়া ফরাসী জাতির অন্তরে এমন অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি নিহিত আছে যে, ফ্রান্সকে যতই কেন আঘাত কর না, সে মর্‌তে জানে না। সুতরাং এরূপ চরিত্রের জাতির নিকট জার্ম্মানীর বিপদ আছে। যথেষ্টপরিমাণ শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে, ফ্রান্স আবার জার্ম্মানীকে সেই শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য যুদ্ধে আহ্বান করবে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্ব হতেই জার্ম্মানী ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস কর্‌তে বাধ্য। অতএব ফ্রান্সের শত্রুতা করা জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য এই ত গেল ফ্রান্সের কথা।

অপর-পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে জার্ম্মানীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে ইংলণ্ড চিরবাধা। কি বাণিজ্যে, কি রাজ্যে—আজ ইংলণ্ডের সমকক্ষ কোন দেশ পৃথিবীতে নেই। জার্ম্মানীর ইচ্ছা এ ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ হন ; সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীতে জার্ম্মানীর উন্নতি ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী। অতএব ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর সখ্য অসম্ভব কিন্তু তাই বলে ইংলণ্ডের শত্রুতা করা যে জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য তাও নয়। তার কারণ অর্থবলে ও নৌবলে ইংলণ্ড অদ্বিতীয় এত প্রবল ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতির সঙ্গে বিবাদ করা জার্ম্মানীর

পক্ষে বুদ্ধিবিবেচনার কাজ নয়—অথচ ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য জার্ম্মানীর প্রতিদিন প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় জার্ম্মানীর রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি সেই পরিমাণে উদ্রেক করা, যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে না পড়ে, কেননা আজও জার্ম্মানীর নৌবল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। (Patriotic feeling must not be roused to such an extent as to damage irreparably our relations with England, against whom our sea-power for years would be insufficient)। অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে জলযুদ্ধ কর্‌বার শক্তি যতদিন না সঞ্চয় কর্‌তে পারেন, ততদিন জার্ম্মান-রাজপুরুষেরা অনাহূত ইংলণ্ডের শত্রুতা করবেন না। এ ত শুধু সময়ের কথা। ইত্যবসরে জার্ম্মানী রণতরীর পর রণতরী প্রস্তুত করে, এবং সেই সঙ্গে দেশের লোককে পেট্রিয়টিজমের সুরাপান করিয়ে আস্‌ছে।

পূর্ব্বে যা বলা গেল সে সবই Prince Bulow-র কথা, এক বর্ণও আমার নিজের নয়। এর থেকেই দেখা যায় জার্ম্মানীর রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে শক্তিহীন করা। Prince Bulow বলেন যে, জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা এই নীতি অবলম্বন কর্‌তে বাধ্য। জার্ম্মানী অবশ্য আত্মরক্ষা অর্থে, যা আছে তাই রক্ষা করা বোঝেন না। যে ঐশ্বর্য্য যে প্রভুত্ব জার্ম্মানীর আজ নেই, তাই আয়ত্ত করাই হচ্ছে জার্ম্মানীর মতে আত্মরক্ষা। এখন জিজ্ঞাস্য, এই আত্মরক্ষার উপায় ও পদ্ধতি কি? Prince Bulow বলেন—

"The fleet as well as the army would, needless to say, in accordance with Prussian and German traditions, consider attack the best form of defence"— অর্থাৎ জার্ম্মান-মতে পরকে আক্রমণ করাই আত্মরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ইটালি বলেছেন যে, জার্ম্মানীর এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নয়—দস্যুতা। ইটালির কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ Prince Bulow-র গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে পাওয়া যায়। সুতরাং ইউরোপে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য প্রধানতঃ জার্ম্মানী দায়ী। ইউরোপের রাজনীতির একটি কথা আছে যে, জেরুজেলম্ পৌঁছতে হলে লোহিত-সমুদ্র পার হওয়া দরকার। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ এই শাস্ত্রবচনের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তাহলে জার্ম্মানী তার এই স্বখাদ রক্ত-সমুদ্রে ডুবে মরবে।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যাবে।

আজ তিন হাজার বৎসরে ইউরোপে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে —সে সভ্যতার লক্ষণ ও ধর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Seignobos নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমতঃ— বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে সমাজ সনাতন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নির্ব্বিচারে সে প্রথা রক্ষা করাই লোকে কর্ত্তব্য মনে করত। কিন্তু আজ

ইউরোপবাসীরা, যা চলে আস্‌ছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে, মানব-সমাজের উন্নতির জন্য চিন্তা করে ও চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সভ্যতার জপ-মন্ত্র হচ্ছে progress।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।

তৃতীয়তঃ—বর্ত্তমান সমাজ সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সমাজ উচ্চনীচ-হিসাবে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। এ যুগের আইনকানুনে এই অধিকারভেদ ও কর্ত্তব্য-ভেদের স্থান নেই। অর্থের তারতম্য ব্যতীত ইউরোপে মানুষমাত্রেই অধিকারে ও কর্ত্তব্যে একজাতীয়।

চতুর্থতঃ—বর্ত্তমানে রাজ্য স্বায়ত্ত-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ইউরোপে জাতি বল্‌তে কোনও দেশের জনগণকে বোঝাত না। সেকালে শাসক-সম্প্রদায় বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। রাজ্যশাসনের ভার তাঁদেরই হস্তে নিহিত ছিল। বাদবাকী লোকের শাসনকার্য্যের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। আজ মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রের (Body politic) অন্তর্ভূত। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলেরই ভোট আছে, এবং সকলের মতই সমান মূল্যবান।

পঞ্চমতঃ—ইউরোপীয় সমাজ নিরাপদ। পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু-ভয়ও

নেই, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারও নেই। এ যুগের রাজকর্ম্মচারীরা অধিকাংশই শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র, তা ছাড়া তাঁদের কার্য্যের উপর গভরমেণ্টের দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে।

ষষ্ঠতঃ—বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে আজও যুদ্ধবিগ্রহ আছে; কিন্তু ইউরোপের মতে যুদ্ধব্যাপার একটি পাপ—কেবল কোন কোন অবস্থায় কোন কোন জাতিকে দায়ে পড়ে এ কার্য্য করতে হয়। ইউরোপে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় বলে কোন মহামান্য এবং অসামান্য ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায় নেই। বর্ত্তমানে মানুষে কর্ত্তব্যের খাতিরে সৈনিক হয়,—সখের জন্যও নয়, মানের জন্যও নয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-ব্যাপারটি এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়েছে যে, যুদ্ধ একালে অতি কম হয়, এবং অতি কম দিনের জন্য হয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপরোক্ত বর্ণনা যে সত্য, তা যিনিই ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য।

(৪)

যে সকল মনোভাবের উপর বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডে তার উৎপত্তি, এবং ফ্রান্সে তার পরিণতি হয়েছে। নেপোলিয়ানের অধঃপতনের পর, রাসিয়া অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়া এই নূতন সভ্যতার উচ্ছেদ এবং মধ্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, কিন্তু সে সভ্যতা নষ্ট করবার ক্ষমতা সেকালে এই তিন-রাজ্যের মিলিত-শক্তিরও ছিল না। এ সভ্যতাকে ঘা-খাওয়াবার শক্তি

আজ একমাত্র জার্ম্মান-সাম্রাজ্যেরই আছে। কেননা রাসিয়া ইউরোপের ভূগোলের অন্তর্ভূত হলেও, তার ইতিহাসের বহির্ভূত। রাসিয়াকে ইউরোপ আজও একটি প্রাচ্যদেশ হিসেবেই দেখে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য একটি প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ মাত্র। নানা বিভিন্ন জাতি ও নানা বিভিন্ন দেশকে যোড়াতাড়া দিয়ে এ সাম্রাজ্যকে খাড়া করে রাখা হয়েছে।—অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মানীর সামন্তরাজ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—কেননা জার্ম্মানীর সাহায্য ব্যতীত অষ্ট্রিয়া একদিনও দাঁড়াতে পারে না। আমরা আজ যাকে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য বলি, সে হচ্ছে একটি যুক্তরাজ্য, এবং প্রশিয়ার রাজা সেই যুক্তরাজ্যের মণ্ডলেশ্বর। জার্ম্মান-রাষ্ট্রনীতির অর্থ হচ্ছে প্রশিয়ার রাজনীতি। বর্ত্তমান জার্ম্মান-সভ্যতার স্বরূপ বুঝতে হলে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। এই রাজ-শক্তি আজকের দিনে সমগ্র সভ্য-সমাজের নিকট একটি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জার্ম্মানী আজ ইউরোপে প্রবল পরাক্রান্ত, কিন্তু জার্ম্মানী, কি সমাজনীতিতে কি রাজনীতিতে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নি। জার্ম্মানীর ideal পূর্ব্ববর্ণিত ইউরোপীয় সভ্যতার ideal হতে পৃথক, এবং কোন কোন অংশে বিরোধী। সুতরাং এ যুদ্ধের মূলে কেবল স্বার্থের নয়, ideal-এর বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে।

(৫)

প্রথমতঃ—বর্ত্তমান জার্ম্মান-সাম্রাজ্য উচ্চ আদর্শের উপর নয়, উচ্চ আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির উন্নতি নয়, জার্ম্মানীর অভ্যুদয়ই

হচ্ছে জার্ম্মান সম্রাটের এবং জার্ম্মান রাজপুরুষদের কামনার ধন। কি রাজ্যে কি বাণিজ্যে দিগ্বিজয় করাই হচ্ছে জার্ম্মনীর ideal। জার্ম্মানীর জপমন্ত্র progress নয়,—self aggrandisement.

দ্বিতীয়তঃ—জার্ম্মানীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—ইউরোপের অপর সকল দেশের অপেক্ষা কম। জার্ম্মান রাজনীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা জার্ম্মান-আইন-অনুসারে দণ্ডনীয়। জার্ম্মানদেশে প্রতি ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসরের জন্য সৈনিক হতে বাধ্য। এবং পরে রাজার আদেশে যুদ্ধ করতে বাধ্য। ইংলণ্ড ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে এরূপ হস্তক্ষেপ করা বর্ব্বরতা মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কেবলমাত্র জার্ম্মানীর সৈন্যবলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই জার্ম্মান-প্রথা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত পোল, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি জার্ম্মানেতর জাতির নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার নেই। জার্ম্মান-আইন-অনুসারে তারা জার্ম্মান সভ্যতায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হতে বাধ্য। এমন কি নিজের নিজের ভাষা ব্যবহার করবার স্বাধীনতা হতেও তারা বঞ্চিত।

তৃতীয়তঃ—জার্ম্মানীতে আজও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রভেদ আছে। ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব জার্ম্মান-সমাজ নতশিরে গ্রাহ্য করে নিয়েছে।

চতুর্থতঃ—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য স্বায়ত্তশাসনের উপর নয়, রাজশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। Prince Bulow বলেন, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্ম্মানীতে ডিমোক্রাসী স্থাপন করা অসম্ভব। কেননা জার্ম্মান জাতি রাজনৈতিক বুদ্ধিহীন। আটশত বৎসর নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে

বিভক্ত থাকার দরুণ জার্ম্মান জাতির মনে স্বাতন্ত্র্যের ভাব অতি প্রবল। এই কারণে জার্ম্মান-জনসাধারণের মনে সমগ্র জার্ম্মানী সম্বন্ধে আজও দেশাত্মজ্ঞান জন্মলাভ করেনি। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মানদের মনে স্বজাতি-বাৎসল্য হয় অতি সঙ্কীর্ণ, নয় অতি উদার। হয় তা নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ, নয় তা বিশ্বমানবের ভিতর ব্যাপ্ত। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মানীর ইতিহাস জার্ম্মান জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত করে ফেলেছে। যদি প্রজাসাধারণের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়ে, তাহলে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য দুদিনেই আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। অতএব প্রশিয়ার রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যবলের সহায়তায় জার্ম্মান-সাম্রাজ্য আজও শাসন করছেন এবং চিরদিন করবেন। রাজশক্তি অবাধ ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জার্ম্মান-রাজনীতির মূলমন্ত্র।

পঞ্চমতঃ—জার্ম্মানীর জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। জার্ম্মানীতে অবশ্য দস্যুভয় নেই, কিন্তু রাজভয় আছে। প্রজাসাধারণের উপর রাজকর্ম্মচারীদের, বিশেষতঃ সেনাধ্যক্ষদের অবৈধ অত্যাচারের উপযুক্ত বৈধ শাস্তি নেই।

ষষ্ঠতঃ—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য যুদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, শান্তির উপর নয়। জার্ম্মান-কর্তৃপক্ষদের মতে যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, পাপ নয়। জার্ম্মানীর সৈনিক সাধারণ-মানব নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর জীব। জার্ম্মানীতে অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্যও বটে, গৌরবের কথাও বটে। Might is right (অর্থাৎ বাহুবলই ধর্ম্মবল) এই মতের ভিত্তির উপর জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণেই জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ইউরোপের সভ্য

সমাজে বর্ব্বরতার পুনরভ্যুদয় বলে গণ্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপের নব-সভ্যতার স্রষ্টা। আশা করি এই বর্ব্বরতার আক্রমণ হতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারবে। সে সভ্যতা যদি এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহলেই প্রমাণ হবে যে পশুবলই শ্রেষ্ঠ বল নয় আর সভ্যতাও শক্তিহীন নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ষষ্ঠ সংখ্যা]　　　　আশ্বিন ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুসি সেই আপন সাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগ্‌বে তা অতি বড় নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তা'রা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।—

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বল্লেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ, ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি

বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মত। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ করে' বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক!

আমার কথাটা হচ্চে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে ত তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখ্‌চ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারচ বলেই বল্‌চ ওরা চল্‌চে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উল্টো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা ত মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে

আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এই জন্যই ত আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহঙ্কার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে—অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বল্‌বে, তারাগুলো ছুটোছুটি করে মরচে? মধ্যাহ্নসূর্য্যকে চোখে দেখ্‌তে গেলে কালো কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ম্ময় দুর্দ্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখ্‌ব বলেই পৃথিবী এই কালো রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কি দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আস্‌তে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখচি তখন দেখচি তা'রা অবিচলিত স্থির। তখন তা'রা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে' কোনো তারাকে দেখে তখন দেখ্‌তে পায় সে চল্‌চে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল্ করে, গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুস্কিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্চে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর

কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দুই-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নীচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কি সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই সমস্ত এপ্রুভরদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত এপ্রুভররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড় বেশি। সমস্ত পৃথিবী বল্‌চে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বল্‌চে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যে-টুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়া দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারো প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়চ্চে তাতে দোষ কি? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা

ভয়ঙ্কর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেচেন :—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরো ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বল্‌তে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চল্‌চে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখচি নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থটা থাক্‌তই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাক্‌বে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্ত্তী, সেটা চল্‌চে; সমগ্র, যেটা দূরবর্ত্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্ব্বেই ব্যবহার করেছি, এখনো ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্ত্তে চল্‌তে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্ত্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা

গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই ত তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে এ'কে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ঐ পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বল্লেই হয়।

এই ত গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্ত্তী অবস্থা পর্য্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখ্‌তে পেতুম না। জগতে যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চল্‌চে তারা আমাদের চারদিকে থাক্‌লেও তাদের দেখ্‌তেই পাচ্চিনে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্ত্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় করে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল—সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে

তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখ্‌তেই পাইনে এমন কি তাঁরা নিজেরাই দেখ্‌তে পান্‌ না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘ-কালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমই নি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাক্‌তুম তাহলে, হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় ত সেই স্বপ্নবর্ত্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুণ স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মত বেগে পিছিয়ে যেতে থাক্‌ত; তার কোনো একটা জিনিষের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়চ্চে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তাহলে দেখ্‌ব তার পা উঠ্‌চেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়চে অথচ আমরা তা দেখ্‌তেই পাচ্চিনে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জান্‌তে পারি ঘাস বাড়চে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তাহলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড় পর্ব্বতের মতই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যেকালের তালে চল্‌চে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখচি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা

চল্‌চে। কালের পরিবর্ত্তন হলে হয়ত দেখ্‌তুম বটগাছটা চল্‌চে কিম্বা নদীটা নিস্তব্ধ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে, আমরা যাকে জগৎ বলচি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্ব্বত সূর্য্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখচি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌চি সেই মুহূর্ত্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্চে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিষকে এক রকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিষকে অন্য রকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে— এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখ্‌চে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখ্‌চে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখ্‌ত তাহলে দেখ্‌ত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করচে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্চে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই জন্যেই লোহা হচ্চে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্চে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে

সমস্তকে দেখ্‌তে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শ ই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি ত অণু পরমাণু নয়—দেশ-কালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখ্‌চে তাই সৃষ্টি। ঈথর-পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয়, আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখচি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখচি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন বলে। তিনি বল্‌বেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমারি বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর-এক কথা বলে।

আমি বলি, ঐ ত হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি ত কলের সৃষ্টি নয়—সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বল্‌বেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি করে বসে তাহলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা ত হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও ত দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই ত তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্চে, আমার এক-টুক্‌রো মন যদি বস্তুত কেবল

আমারই হত তাহলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই জন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না। মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করচেন, এই মন পদার্থটা কি শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈশ্বর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য্য এবং অনির্ব্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। ক্ষ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আস্‌চে। তাই পুরাতন ঋষি বল্‌চেন—

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বল্‌চেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কি করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তাহলেই বা সৃষ্টি হয় কি করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত করছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি, সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে একথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্ত্তায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রকাশ করচি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

•

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহৃত করেছেন সেখানেই অহঙ্কার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্চেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্চে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার

মধ্যেই অসীম বল্‌চেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্চে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, "সর্ব্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্ব্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাক্‌তে পারে না।" আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়-মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয়-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল

উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠে সেদিন সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে উঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য্য ঘনীভূত হয়— সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্চে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে; চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে,—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাক্‌ত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্যমাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বল্‌চে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বল্‌চে সে এক কথা, কিন্তু কবি বল্‌চে, আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্চেন সেই ত এই বিশ্বসঙ্গীত, নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর—কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণা-যন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়—এ যে প্রাণবান—এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্চে তা

নয়—এর সুর এগিয়ে চল্‌চে, এর সপ্তক বদল হচ্চে, এর তার বেড়ে যাচ্চে—এ'কে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্চে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই—কোথাও গিয়ে সে থাম্‌বে না,—সেই রসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ্‌ থেকে নব নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুল্‌বেন। ধন্য আমি এই যে, আমি পান্থশালায় বাস করচিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, এ আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষের রাত্রি

মাসী !

ঘুমোও যতীন, রাত হল যে ।

হোক না রাত, আমার দিন ত বেশি নেই। আমি বলছিলুম মণিকে তার বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্চি ওর বাপ এখন কোথায়—

সীতারামপুরে।

হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কত দিন ও রোগীর সেবা করবে? ওর শরীর ত তেমন শক্ত নয়।

শোন একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন?

ডাক্তারেরা কি বলেছে সে কথা কি সে—

তা সে নাই জান্‌ল—চোখে ত দেখ্‌তে পাচ্চে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইসারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।

মাসীর এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত মত।

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতত ভাই অনাথকে দেখ্‌লুম যেন।

হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন আস্‌চে শুক্রবারে আমার ছোট বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবচি—

বেশ ত বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুসি হবেন।

ভাবচি, আমি যাব। আমার ছোট বোনকে ত দেখিনি, দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

সে কি কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কি বলেছে শুনেছ ত?

ডাক্তার ত বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—

তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কি করে?

আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন্, বড় আদরের মেয়ে—শুনেছি ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন সে আমি বলে রাখচি।

তা জানি। তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মাসী, যে কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—

তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানিনে? কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখ্‌তেই হয় আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখ্‌ব।

আচ্ছা বেশ—তুমি লিখোনা। আমি ওঁকে গিয়ে বল্লেই উনি—

দেখ বউ অনেক সয়েছি—কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের

কাছে যাও কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালো রকমই চেনেন তাঁকে ভোলাতে পারবে না।

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একি সই, গোসা কেন?

দেখ দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।

ওমা সে কি কথা, যাবে কোথায়? স্বামী যে রোগে শুষ্‌চে।

আমি ত কিছুই করিনে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। এমন করে আমি থাক্‌তে পারিনে তা বলচি।

তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক্।

তা আমি ভাই তোমাদের মত লোক-দেখানে ভান করতে পারিনে। পাছে কেউ কিছু মনে করে বলে মুখ-গুঁজ্‌ড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম্ম নয়।

তা কি করবে শুনি?

আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখ্‌তে পারবে না।

ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচিনে। চল্লুম, আমার কাজ আছে।

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল

এবং একটু উঠিয়া হেলান্ দিয়া বসিল। বলিল—মাসী, এই জানলাটা আরেকটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মত রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা—সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসী নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—মাসী, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসেনি। কিন্তু দেখ—

না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম—সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।

মাসী!

যতীন, ঘুমোও বাবা।

আমাকে একটু ভাবতে দাও—একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়োনা মাসী!

আচ্ছা, বল বাবা।

আমি বল্‌ছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেলুম না তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—

না বাবা, অমন কথা বোলো না—আমিও সহ্য করেছি।

মন ত মাটির ঢেলা নয়—কুড়িয়ে নিলেই ত নেওয়া যায় না। আমি জানতুম মণি নিজের মন এখনো বোঝেনি—কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—

ঠিক কথা যতীন।

সেই জন্যই ওর ছেলে-মানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করিনি।

মাসী এ-কথার কোন উত্তর করিলেন না—কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া—একান্ত ইচ্ছা মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল-বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়োনা—ও একটু চাহিতে শিখুক—মানুষকে একটু কাঁদানো চাই। কিন্তু এসব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে

সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না। মাসী যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—

আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারিনি তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু মাসী সুখ জিনিষটা ঐ তারাগুলির মত, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি? কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে?

মাসী আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

আমি ভাবচি মাসী, ওর অল্প বয়স, ও কি নিয়ে থাকবে?

অল্প বয়স কিসের যতীন? এ ত ওর ঠিক বয়স। আমরাও ত বাছা অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি—তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের?

মাসী, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—

ভাব কেন, যতীন ? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য ?

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল।

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

মাসী, ঘড়িতে কটা বেজেছে ?

নটা বাজ্‌বে।

সবে নটা ? আমি ভাবছিলুম বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে ? সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপর রাত আরম্ভ হয়।—তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন ?

কালও সন্ধ্যার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্য্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না—তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমতে বলচি।

মণি কি ঘুমিয়েছে ?

না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সূপ তৈরি করে তবে ঘুমতে যায়।

বল কি মাসী, মণি কি তবে—

সেই ত তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে ?

আমি ভাবতুম মণি বুঝি—

মেয়েমানুষের কি আর এসব শিখ্‌তে হয় ? দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।

আজ দুপুরবেলা মৌরলা-মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড় সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারি হাতের তৈরি।

কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয় ? তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখ্‌তে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখ্‌তে পাবে মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে করে রেখে দিয়েছে। আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্ব্বদা আস্‌তে দিতুম তাহলে কি আর রক্ষা থাক্‌ত ! ও ত তাই চায়।

মণির শরীর বুঝি—

ডাক্তাররা বলে রোগীর ঘরে ওকে সর্ব্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড় নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখ্‌লে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।

মাসী, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কি করে ?

আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌তে হয়—ঐ আমার আরেক কাজ হয়েছে।

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্‌ করিয়া যতীন বলিল, মাসী, মণি যদি জেগেই থাকে তাহলে একবার যদি তাকে—

এখনি ডেকে দিচ্চি, বাবা।

আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখ্‌তে চাইনে—কেবল পাঁচ মিনিট—দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে আজ পর্য্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড় কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে—সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না? পারে না যে তাহাও ত নহে—নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ

করে না? কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা ত মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড় কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি-না খেয়াল না করিলেই হয়,—কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই;—বাঁশি একাই বাজিতে পারে কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এই জন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে এখনি কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুইজনে কথা কহা কঠিন, তিনজনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক রকম বড় হইয়া পড়ে—সে সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ তাহার জীবনে এমনতর নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে?

৩

একি বৌ, কোথাও যাচ্চ না কি?

সীতারামপুরে যাব।

সে কি কথা? কার সঙ্গে যাবে?

অনাথ নিয়ে যাচ্চে।

লক্ষ্মী-মা-আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।

তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে—তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো—আজ যেয়োনা।

মাসী, আমি তোমাদের তিথি বার মানিনে, আজ গেলে দোষ কি?

যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।

বেশত, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে বলে আসচি।

না, তুমি বল্‌তে পারবে না যে যাচ্চ।

তা বেশ, কিছু বল্‌ব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন—আজ যদি না যাই ত চল্‌বে না।

আমি জোড়হাত করচি বৌ, আমার কথা আজ একদিনের মত রাখ। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বস—তাড়াতাড়ি কোরো না।

তা কি করব বল, গাড়ি ত আমার জন্য বসে থাক্‌বে না। অনাথ চলে গেছে—দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

না, তবে থাক্‌—তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে ত সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে—কিন্তু যত দিন বেঁচে থাক্‌বি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখ্‌তে

হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।

মাসী, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলচি!

ওরে বাপ্‌রে, আর কেন বেঁচে আছিস্‌রে বাপ? পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারলুম না।

মাসী একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসী বলিলেন, এই এক কাণ্ড করে বসেছে।

কি হয়েছে? মণি এল না? এত দেরি করলে কেন মাসী?

গিয়ে দেখি সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরো ত দুধ আছে। কিন্তু অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে বৌয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক করে ঠাণ্ডা করে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আন্‌লুম না। সে একটু ঘুমোক্।

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত

হইয়া উঠিয়াছে ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

•

মাসী!

কি বাবা?

আমি বেশ জান্‌চি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।

না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় একথা আমি মনে করিনে।

মাসী তোমাকে সত্য বলছি মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্চে।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্ব্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল—জীবন-মরণের সঙ্গমতীর্থে ঐ নক্ষত্র-বেদীর উপরে সে বসিল—নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মত পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল।—যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে

কহিল, এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল—অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না !

৪

কষ্ট হচ্চে, মাসী, কিন্তু যত কষ্ট মনে করচ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আস্‌চে। বোঝাই-নৌকার মত এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল—আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে—সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চল্‌ল। এখনো তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি কিন্তু তাকে যেন আর আমার বলে মনে হচ্চে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখিনি মাসী।

পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন ?

আমার মনে হচ্চে, মাসী, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মত।

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আস্‌চে।

আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি—ঠিক মনে পড়চে না।

আমার দেখবার দরকার নেই যতীন।

মা যখন মারা যান আমার ত কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

সে আবার কি কথা ? আমার ত কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই ত তোমার নিজের রোজগার।

কিন্তু এই বাড়িটা—

কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

সে কি জানিনে, যতীন? তুই এখন ঘুমো।

আমি মাণিকে সব লিখে দিলুম বটে কিন্তু তোমারি সব রইল মাসী। ও ত তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।

সেজন্যে অত ভাবচ কেন, বাছা।

তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—

ওকি কথা যতীন? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব? আমার এম্‌নি পোড়া মন? তোমার জিনিষ ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারচ বলে তোমার যে সুখ সেই ত আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।

কিন্তু তোমাকেও আমি—

দেখ্ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি?

মাসী, টাকার চেয়ে আরো বড় যদি কিছু তোমাকে—

দিয়েছিস্, যতীন, ঢের দিয়েছিস্। আমার শূন্য ঘর ভরে ছিলি এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন ত বুক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে ত নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক,—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও —এ সব বোঝা আমার সইবে না।

তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু মণির বয়স অল্প তাই—

ও কথা বলিস্‌নে, ও কথা বলিস্‌নে। ধনসম্পদ দিতে চাস্ দে কিন্তু ভোগ করা—

কেন ভোগ করবে না মাসী ?

না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলচি ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, এমনিই বটে,—আমরা ত হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই সমস্ত আয়োজন এত-বড়ই ফাঁকি।

যতীন গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেবার মত জিনিষ ত আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারিনে।

কম কি দিয়ে যাচ্চ বাছা? এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কি দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝবে না? যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন এই আশীর্ব্বাদ ওকে করি।

আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল—আমার ঠিক মনে পড়চে না।

এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ বাতাস করে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।

আশ্চর্য্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম যেন মণি আমার ঘরে আস্তে চাচ্চে—দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে—ঠেলাঠেলি করচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুল্‌চে না। কিন্তু মাসী তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করচ—ওকে দেখ্‌তে দাও যে আমি মরচি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।

বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

না, মাসী, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগচে না।

জানিস্ যতীন এই শালটা মণির তৈরি। এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস—সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে—তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসী যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

কিন্তু মাসী, আমিত জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না—সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।

মন দিলে শিখ্‌তে কতক্ষণ লাগে? তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে—ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।

তা ভুল থাক্‌না। ও ত প্যারিস্‌ একজিবিসনে পাঠানো হবে না—ভুল-শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চল্‌বে।

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরো বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বার বার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে—এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড় করুণ বড় মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

মাসী ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে?

হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাক্‌বেন।

কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ ত ওতে আমার ঘুম হয় না কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো করে জেগে থাক্‌তে দাও। জান মাসী, বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আস্‌চে—কাল সেই দিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে

দিতে চাই ;—কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন? বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে আমার শরীর দুর্ব্বল এখন যাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি মাসী, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে—তাহলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বল্‌তে চাচ্চে বলেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয়নি। মাসী তুমি অমন করে কেঁদোনা। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে আমার জীবনে এমন আর কখনই হয়নি। সেই জন্যই আমি মণিকে ডাকচি। মনে হচ্চে আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বল্‌তে চেয়েছিলুম, বল্‌তে পারিনি কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না।—না মাসী, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারিনে। এতদিন ত শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল?

ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি এখনো বাকী আছে, আজ আর পারচিনে।

মণিকে ডেকে দাও—তাকে বলে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—

যাচ্চি বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।

মাসী মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ওরে আয়—একবার আয়—আয়রে, রাক্ষসী যে তোকে

তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—সে মরতে বসেছে তাকে আর মারিসনে।

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল—মণি!

না আমি শম্ভু, আমাকে ডাকছিলেন?

একবার তোর বৌ-ঠাকরুণকে ডেকে দে।

কাকে?

বৌ-ঠাকরুণকে।

তিনি ত এখনো ফেরেননি।

কোথায় গেছেন?

সীতারামপুরে।

আজ গেছেন?

না আজ তিনদিন হল গেছেন।

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসী যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসী ভাবিলেন সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, মাসী, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি?

কোন্ স্বপ্ন ?

মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল—কোনো মতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হলনা সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল কিন্তু কিছুতেই ঢুক্‌তে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক করে ডাকলুম কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।

মাসী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো—প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।

মাসী, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়। আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চল্লুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।

বলিস্ কি যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব ?—না হয়, তোরি কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্‌না।

না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আস্‌বে। আমার মনে আছে আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।

আর বকিস্‌নে যতীন বকিস্‌নে—একটু ঘুমো।

তোমার নাম দেব, লক্ষ্মীরাণী।

ও ত একেলে নাম হল না।

না, একেলে নাম না। মাসী তুমি আমার সাবেককেলে ;—সেই সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এস।

তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আস্‌ব এ কামনা আমি ত করতে পারিনে।

মাসী তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে কর,—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?

বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্ব্বল—সেই জন্যেই আমি বড় ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কি আছে ? কিছুই করতে পারিনি।

মাসী, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু এ সমস্তই জমা রইল, আস্‌চে বারে, মানুষ যে কি পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কি ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।

যাই বল বাছা, তুমি নিজে কিছু নাওনি, পরকেই সব দিয়েছ।

মাসী, একটা গর্ব্ব আমি করব আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করিনি—কোনো দিন এ কথা বলিনি যেখানে আমার দাবী আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাইনি তা কাড়াকাড়ি করিনি। আমি সেই জিনিষ চেয়েছিলুম যার উপরে কারো স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম ; মিথ্যাকে চাইনি বলেই এতদিন এমন করে বসে থাক্‌তে হল—এইবার সত্য হয় ত দয়া করবেন। ও কেও—মাসী, ও কে ?

কই, কেউ ত না যতীন।

মাসী, তুমি একবার ওঘরটা দেখে এস গে, আমি যেন—

না বাছা, কাউকে ত দেখ্‌লুম না।

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

কিচ্ছু না যতীন—ঐ যে ডাক্তার বাবু এসেছেন।

দেখুন আপনি ওঁর কাছে থাক্‌লে উনি বড় বেশি কথা কন্। কয়রাত্রি এমনি করে ত জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাক্‌বে।

না মাসী না, তুমি যেতে পাবে না।

আচ্ছা, বাছা, আমি না হয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসচি।

না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাক—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়চিনে—শেষ পর্য্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীন বাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—

সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করিনে। মাসী, যমের চিকিৎসা চল্‌চে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড় করেছ কেন—বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।

আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্চে না।

তাহলে তোমরা যাও—আমাকে উত্তেজিত কোরোনা। মাসী, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তাহলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।

আচ্ছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

না মাসী, ঘুমতে বোলোনা—ঘুমতে ঘুমতে হয় ত আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুন্‌তে পাচ্চনা? ঐ যে আস্‌চে। এখনি আস্‌বে।

৫

বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখ—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও!

কে এসেছে? স্বপ্ন?

স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে—তোমার শ্বশুর এসেছেন।

তুমি কে?

চিন্‌তে পারচ না বাবা, ঐ ত তোমার মণি।

মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে?

সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।

না মাসী, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।

শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ কর্।—অমন করে কাঁদিস্‌নে বৌ, কাঁদবার সময় আস্‌চে—এখন একটুখানি চুপ কর্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্য

উত্তরাপথের মানচিত্রের দিকে,—হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত, সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত,—বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে, একটি কথা মনে আসে। সে কথাটি এই যে,—সৃষ্টিকর্ত্তা যেন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ একচ্ছত্র অখণ্ড রাজ্যরূপে শাসিত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সুরক্ষিত খণ্ড-রাজ্যের দুর্ভেদ্য সীমান্তের বা প্রাচীর-পরিখার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, এমন পাহাড়-পর্ব্বত বা সাগর এই ভূভাগের ভিতরে কোথাও নাই। ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিতে গেলেই অন্তর্দ্রোহ এবং সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতির এই ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে প্রাচীনদিগের অনেক দিন লাগিয়াছিল, এবং অপ্রাচীনেরা এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এখানে প্রাচীনদিগের কথাই বলিব।

মনুষ্য-সমাজে যে সকল স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তাহার অবিকৃত বিবরণের নাম ইতিহাস। প্রত্যক্ষকারীর কথা বা প্রমাণ ঐতিহাসিক বিবরণের উপজীব্য। আমাদের দেশের ইতিহাসের উপদানের প্রাচীনতম আকর ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদই আমাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের অবলম্বন। এই প্রথম অধ্যায়ে উত্তরাপথব্যাপী কোনও অখণ্ড রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ;—উত্তরাপথের এক-কোণের গুটিকয়েক খণ্ড-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঋষিরা

গঙ্গা চিনিতেন,—সরযূ চিনিতেন,—মগধও (কীকট) জানিতেন ; কিন্তু তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র যমুনার পশ্চিমদিকেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঋগ্বেদের যুগের আর্য্য-ভূমি একস্থলে (৮ । ২৪ । ২৭) "সপ্ত-সিন্ধবঃ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন সেই দেশের নাম পঞ্জাব। এই সপ্তসিন্ধুর দেশও যে কখনও একজন রাজার একচ্ছত্র-শাসনাধীনে ছিল, ঋগ্মন্ত্রে এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। তখনও করভারবাহী বৈশ্য এবং ক্রীতদাসের ন্যায় সেবানিরত শূদ্রবর্ণের অভ্যুদয় হয় নাই। ঠিক নামতঃ না হউক, কার্য্যতঃ তখন ছিল—এক দিকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অপর দিকে অনার্য্য দস্যু (নিষাদ)। তখনকার ক্ষত্রিয়-সমাজ কতকগুলি "গণে" বিভক্ত ছিল। এক একটি "গণের" এক একজন রাজা ছিলেন। যদিও জনগণ বহু পূর্ব্বেই যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসী হইয়াছিল, তথাপি তখনকার নরপালগণকে রাষ্ট্রাধিপ না বলিয়া "গণাধিপ" বলাই সঙ্গত। ঋকসংহিতায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র "গণের" নাম আছে। তন্মধ্যে ভরত-তৃৎসু, পূরু, যদু, তুর্ব্বস, ক্রিবি (পঞ্চাল), মৎস্য, চেদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল "গণপালগণের" মধ্যে ভরত-তৃৎসু-গণের পতি সুদাস পৈজবন (পিজবনের পুত্র) একসময় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের একটি সূক্ত (৭ । ১৮) হইতে জানা যায়,—সুদাস পরুষ্ণী নদীর (বর্ত্তমান রাবি) তীরে পূরু, যদু, তুর্ব্বস প্রভৃতি গণাধিপগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ছিলেন। এই যুদ্ধ ঋগ্বেদে এবং অথর্ব্ববেদে "দাশরাজ্ঞ" বা "দশ জন রাজার সহিত যুদ্ধ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই একই সূক্তে সুদাসের যমুনানদীর তীরে যুদ্ধের জয়লাভের কথাও আছে। এই সকল যুদ্ধের ফলে সুদাস ইরাবতী (রাবি) হইতে যমুনার তীর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সুদাসকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৃৎসু-প্রাধান্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পূরুগণ সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন। পূরুরাজ পুরুকুৎস এবং সুদাস এক-সময়ের লোক। "দাশরাজ্ঞ" যুদ্ধে পূরুরাজও উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই হয়ত পূরুগণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল পূরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু তাহা হইতে স্বগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক সুদাসের পুত্রগণ পরাভূত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের রচনাকালে আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্র, সরস্বতী নদীর পশ্চিম দিক হইতে সরিয়া যমুনার এবং গঙ্গার সলিলধৌত "মধ্যদেশে" আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনকার আর্য্যাবর্ত্তও কতকগুলি খণ্ড-রাজ্যেই বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য মধ্যে কেকয়, উশীনর, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, বশ, সাত্বত, চেদি, কোশল, কাশী এবং বিদেহই প্রধান। উত্তর-পশ্চিমে গন্ধার এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণে মগধ এবং অঙ্গ বৈদিক-আর্য্যগণের সুপরিচিত হইলেও বাহ্যদেশ বলিয়া গণ্য হইত। ঋগ্বেদোক্ত ক্রিবিগণ পঞ্চালগণে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং তুর্ব্বসগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পূরুগণ কুরুগণে পরিণত হইয়াছিলেন এবং ভরতগণ তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে ছিলেন। ঋগ্বেদোক্ত যদুগণ সাত্বত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাভারতে যাদবগণকেই সাত্বত বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিকযুগের এই শেষ-ভাগেও কেহ যে কখন খণ্ড-রাজ্যনিচয়কে ভাঙ্গিয়াচুরিয়া উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে, এবং ব্রাহ্মণভাগে "সম্রাজ্"-শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এইসকল স্থলে সম্রাট্-শব্দ সার্ব্বভৌম বা একাধীশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; অধিকতর বা অসাধারণ পরাক্রমশালী রাজা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ-মণ্ডলে পার্থবগণের অধিপতি অভ্যাবর্ত্তী-চায়মানকে 'সম্রাট্' বলা হইয়াছে (২৭।৮)। এই অভ্যাবর্ত্তী-চায়মান বৃচীবৎগণের অধিনায়ক বরশিখকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই একই সূক্তে সৃঞ্জয়-দৈববাতকর্ত্তৃক তুর্বশ এবং বৃচীবৎগণের পরাজয়ের কথাও আছে। সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী-চায়মান যদি সৃঞ্জয়-দৈববাত হইতে অভিন্ন ব্যক্তিও হয়েন তথাপি তুর্বশগণ এবং বৃচীবৎগণকে পরাজিত করিয়াই যে তিনি ঋগ্বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধবঃ" দেশের একাধিপতি হইতে পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। শতপথব্রাহ্মণে (৫।১।১।১২—১৪) বাজপেয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে রাজায় এবং সম্রাটে, রাজ্যে এবং সাম্রাজ্যে, তুলনা করা হইয়াছে। যথা—

"রাজার (যজ্ঞ) রাজসূয়। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা হয়েন। ব্রাহ্মণ রাজ্যের অধিকারী নয়। রাজসূয় যজ্ঞ নিকৃষ্ট (অবর), বাজপেয় যজ্ঞ উৎকৃষ্ট (পর)।

"রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা হয়, বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট্ হয়। রাজ্য (রাজপদ) নিকৃষ্ট, সাম্রাজ্য (সম্রাজপদ) উৎকৃষ্ট। রাজা সম্রাট্ হইতে কামনা করেন; কারণ রাজ্য নিকৃষ্ট, সাম্রাজ্য উৎকৃষ্ট।

"যে বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হয়, সে এই সমস্ত বশীভূত করে (ইদং সর্ব্বং সংবৃঙ্‌ক্তে)।"

বাজপেয় সাত প্রকার "সোমসংস্থা" যজ্ঞের অন্যতম, সপ্তম যজ্ঞ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণ বাজপেয় যজ্ঞের অধিকারী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বাজপেয়কে "সম্রাট্‌সব" এবং রাজসূয়কে "বরুণসব" বলা হইয়াছে। আশ্বলায়ন বিধান করিয়াছেন, "রাজা বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন, এবং ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসব করিতে পারেন।" লাট্যায়ণের মতে "ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণ যাহাকে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিবেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন।" বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী একরাট্‌ সম্রাট হইবেন এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে, যজ্ঞাঙ্গরূপে দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু বাজপেয়প্রকরণে দিগ্বিজয়ের কোন ব্যবস্থা নাই। চারি ঘোড়ার রথে চড়িয়া "আজিধাবন" অর্থাৎ প্রতিযোগিগণকে দৌড়ে পশ্চাতে ফেলিয়া বাজি জিতিয়া লোক-জয়ের কথা আছে। বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞেও ঠিক দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। যজ্ঞের ঘোড়াকে এক বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। শতপথব্রাহ্মণে স্বচ্ছন্দে বিচরণকালে ঘোড়ার রক্ষার জন্য প্রহরীস্বরূপ ১০০ কবচধারী রাজপুত্র, ১০০ অসিধারী রাজন্য, ১০০ ধনুর্দ্ধর সূতপুত্র এবং গ্রামণীপুত্র, এবং ১০০ দণ্ডধারী সারথিপুত্র এবং ভৃত্যপুত্র নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ৪০০ শত যোদ্ধার পক্ষে তৎকালের কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করা সম্ভব ছিল না। ঘোড়া হারাইয়া গেলে অর্থাৎ শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইলে অন্য একটি ঘোড়া যজ্ঞে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থাও ছিল।

"সম্রাট্‌" বলিলে বৈদিক যুগে যে খণ্ডরাজ্যের অধীশ্বরকে বুঝাইত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "মহাভিষেক"-প্রকরণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে (৮।৩৮—৩৯)। কিন্তু "মহাভিষেকের" মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে, যিনি উহার অনুষ্ঠান করিবেন, এখন

আমরা "সম্রাট্" বলিলে যাহা বুঝি, তিনি সেইরূপ একরাট্ সার্ব্বভৌম হইবেন। যথা—

"ইহা (ইন্দ্রের মহাভিষেক বৃত্তান্ত) জানিয়া কেহ (কোন আচার্য্য) যদি ক্ষত্রিয় পক্ষে ইচ্ছা করেন, যে এই ক্ষত্রিয় সকল বিজয় লাভ করিবেন, সকল লোক জানিবেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিবেন এবং সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য পাইয়া সর্ব্বব্যাপী হইবেন ও (ভূমির) অন্তপর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ও পরার্দ্ধকালপর্য্যন্ত পূর্ণ আয়ুষ্মান হইবেন ও সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ (একমাত্র রাজা) হইবেন, তাহা হইলে তিনি সেই ক্ষত্রিয়কে এইরূপে শপথ করাইয়া ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন।" (শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ।)

ঐন্দ্রমহাভিষেক কর্ম্মটি অতি সংক্ষিপ্ত। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় যজমান শপথ করিবেন, তিনি আচার্য্যের বিরোধাচরণ করিবেন না। তৎপর আচার্য্য যজমানকে ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ ও প্লক্ষ এই চারিটি বনস্পতির ফল এবং ব্রীহি, মহাব্রীহি, প্রিয়ঙ্গু ও যব এই চারিটি ওষধি দ্রব্য অঙ্কুরার্থ সংগ্রহ করিতে বলিবেন। উডুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন্দী বা আসন আনা হইবে এবং উহার উপর যজমানকে আরোহন করাইয়া দধি, মধু, ঘৃত ও আতপযুক্ত বৃষ্টির জলদ্বারা অভিষেক করা হইবে। অভিষেকের পর যজমান অভিষেক-কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সহস্র স্বর্ণখণ্ড, ক্ষেত্র এবং পশু অথবা অসংখ্য ও অপরিমিত দক্ষিণা দিবেন, এবং স্বয়ং সুরা পান করিয়া যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিবেন। রাজসূয় বা বাজপেয় যজ্ঞের তুলনায় এই "মহাভিষেক" অতি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ কর্ম্ম,

অথচ ইহার ফল অতি বৃহৎ, সার্ব্বভৌমত্ব লাভ। যে সকল নরপাল ঐন্দ্রমহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া "সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন" ঐতরেয় ব্রাহ্মণকার তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—জনমেজয়, পারিক্ষিত, শার্য্যাত মানব, শতানীক সাত্রাজিত, আম্বাষ্ঠ্য, যুধাংশ্রৌষ্টি, ঔগ্রসেন্য, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, সুদাস পৈজবন, মরুত্ত আবিক্ষিত, অঙ্গ বৈরোচন, ভরত দৌঃষন্তি, দুর্ম্মুখ পাঞ্চাল এবং অত্যরাতি জানন্তপি। বশিষ্ঠের যজমান সুদাস পৈজবনের কীর্ত্তিকথা ঋগ্বেদের তৃতীয় এবং সপ্তম মণ্ডলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার "সর্ব্বদিকে পৃথিবী জয়ের" কোন আভাস নাই, ইরাবতী (রাবি) তীরে "দাশরাজ্ঞ" যুদ্ধ জয়ের কথা আছে। সুতরাং সুদাস পৈজবনকর্ত্তৃক পৃথিবী-জয়ের কথা ব্রাহ্মণকারের কল্পনামাত্র। এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত নৃপতিনিচয়ের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪) জনমেজয় পারিক্ষিত, মরুত্ত আবিক্ষিত, ভরত দৌঃষন্তি, শতানীক সাত্রাজিত অশ্বমেধযাজী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জনমেজয় পারিক্ষিত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে ;—তিনি আসন্দীবৎ নামক স্থানে অশ্বমেধ যাগ করিয়া সমস্ত দুষ্কার্য্য এবং ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। মরুত্ত আবিক্ষিত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—তিনি অশ্বমেধ যাগ করিয়া মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ এবং অগ্নিকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানীক সাত্রাজিত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—তিনি কাশিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই শতানীক সম্ভবতঃ ভরতগণের রাজা ছিলেন। একমাত্র ভরত দৌঃষন্তি সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণে সমস্ত পৃথিবী জয়ের কথা আছে। ব্রাহ্মণকারধৃত

একটি গাথায় এই "সমস্ত পৃথিবী জয়ের" কথা আছে। ব্রাহ্মণকার স্বয়ং এই মাত্র বলিয়াছেন,—"তদ্দ্বারা ভরত দৌঃষন্তি এক সময় যজ্ঞ (অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে ভরতগণের অধিকৃত যে বিস্তীর্ণ রাষ্ট্র তাহা লাভ করিয়াছিলেন।"

ভরতগণের রাজ্য যে কতটা বিস্তৃত ছিল তাহারও কতকটা আভাস শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। ভরত দৌঃষন্তি সাত্ত্বতগণের যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন, যমুনাতীরে ৭৮টি এবং গঙ্গাতীরে ৫৫টি যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধিয়াছিলেন, এবং ভরতরাজ শতানীক কাশিরাজের যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "মহাভিষেক"-প্রকরণে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে (৮।৩৮।৩) ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যমদেশের বশগণের, উশীনরগণের এবং কুরুপঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়েন। পাণিনির সূত্রানুসারে (৪।২।১১৮) উশীনরগণ এবং বাহীকগণ অভিন্ন বা একদেশবাসী এবং মহাভারতের কর্ণপর্ব্বানুসারে বাহীকগণ পঞ্চনদ (পঞ্জাব) বাসী ছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্জাবে প্রাচীন উশীনর জনপদ অবস্থিত ছিল। বৈদিক "বশ" পালিপিটকের "বংশ", এবং পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের "বৎস" সম্ভবতঃ অভিন্ন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কৌশাম্বী এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই মধ্যম-দেশের দক্ষিণে, কুরুজনপদের দক্ষিণে, সাত্ত্বত রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই তালিকায় ভরতজনপদই কুরুনামে অভিহিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে এই কুরু-ভরত-রাজ্য স্বাধীন উশীনর, পঞ্চাল, কোশল, কাশি, বশ বা বৎস এবং সাত্ত্বত জনপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণে এবং ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং কৌষীতকি উপনিষদে যে

সকল নরপতি এবং প্রধান প্রধান আচার্য্যের কথা আছে তাঁহাদের সময়েও কুরু-ভরত-রাজ্য এই সকল স্বাধীন রাজ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সকল গ্রন্থে দেখা যায়, কেকয়রাজ অশ্বপতি, পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি, কাশিরাজ অজাতশত্রু, বিদেহরাজ জনক এবং আচার্য্যগণের মধ্যে উদ্দালক আরুণি এবং যাজ্ঞবল্ক্য একসময়ের লোক ছিলেন। সুতরাং এই জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদির সময়ে ভরতরাজ্য যতটা বিস্তৃত ছিল তাহা যদি ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত ভরত দৌঃষন্তির দিগ্বিজয়শ্রমের ফল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণকারের উক্ত "পৃথিবী জয়" "একরাট" "সার্ব্বভৌম" প্রভৃতি কথা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে এতাদৃশ কথার উল্লেখ সপ্রমাণ করে যে, তৎকালের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ একরাট্ সাম্রাজ্যের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে বা শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময়ে উত্তরাপথে তেমন সাম্রাজ্য ছিল না। অবশ্যই একথা বলা যাইতে পারে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল সার্ব্বভৌমের নাম আছে তন্মধ্যে হয়ত কেহ, ঋগ্বেদের এবং ব্রাহ্মণ রচনার সময়ের মধ্যে যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তরাপথে একরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের প্রতিকূলে বক্তব্য এই,—বৈদিক সাহিত্যে উত্তরাপথের রাষ্ট্রীয় অবস্থার যে আভাস পাওয়া যায় তাহার সহিত রামায়ণ, মহাভারত, এবং পুরাণের রাজবংশাবলী একত্র বিচার করিলে মনে হয়,—কুরু, পঞ্চাল, কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যগুলি যেন বরাবরই পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বিদ্যমান ছিল।

বৈদিকযুগে উত্তরাপথ বিদেশীর আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল, এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনার সময়ে অভ্যন্তরেও শান্তি ছিল। সীমান্তরক্ষার দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি নরপালগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। ভরত দৌঃষন্তিকর্ত্তৃক সাত্বতগণের এবং শতানীক সাত্রাজিৎকর্ত্তৃক কাশীরাজের যজ্ঞের ঘোড়া কাড়িয়া লওয়া ভিন্ন অন্তর্দ্রোহের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই হয়ত উত্তরাপথে একরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কেহ তখন তীব্রভাবে অনুভব করিতেন না।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে এবং উপনিষদে যে সকল খণ্ড-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বৌদ্ধ পালিপিটক হইতে জানা যায় গোতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ও ঐ সকল রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পালিপিটকে উত্তরাপথের ষোড়শ মহা-জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ তৎকালে উত্তরাপথ ষোলটি খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি (বৃজি=বিদেহ), মল্ল, চেতি (চেদি), বংশ, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ (মৎস্য), সুরসেন, অস্সক, অবন্তী, গন্ধার, এবং কম্বোজ। গোতম বুদ্ধের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধের সিংহাসনে প্রথমতঃ শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার, তৎপর বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু উপবিষ্ট ছিলেন। পুরাণকারগণের মতে অজাতশত্রুর পরে যথাক্রমে দর্শক, উদয়ী, নন্দিবর্দ্ধন এবং মহানন্দী এই চারিজন শিশুনাগবংশীয় নৃপতি মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্য, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথিত হইয়াছে,—মগধে যখন শিশুনাগবংশীয় নৃপতিগণ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তিগণ রাজত্ব

করেন, তখন তাঁহাদের সমসময়ে ২৪ জন ঐক্ষ্বাকু নৃপতি, ২৭জন পাঞ্চাল নৃপতি, ২৪জন কাশীর নৃপতি, ২৮জন হৈহয় (চেদি) নৃপতি, ৩২জন কলিঙ্গ নৃপতি, ২৫জন অশ্মক নৃপতি, ৩৬ জন কুরু নৃপতি, ২৮জন মৈথিল নৃপতি, ২৩জন শূরসেন নৃপতি এবং ২০জন বীতিহোত্র নৃপতি রাজত্ব করেন। পালিপিটকের ষোড়শ-মহাজনপদের মধ্যে এখানে আটটি উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর পাঁচখানি পুরাণ (বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড) সমস্বরে বলিতেছে,—শিশুনাগবংশীয় মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম-নন্দ সকল ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া, একরাট্ একচ্ছত্র হইবেন। গ্রীকলেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়,—পঞ্জাব মহাপদ্ম-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত তাহা মাগধ-সাম্রাজ্যের সামিল করেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক এই সাম্রাজ্যের সহিত কলিঙ্গরাজ্য যুক্ত করিয়াছিলেন। মহাপদ্ম, চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক এই তিনজনের যত্নে উত্তরাপথে সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত মহাভারতোক্ত প্রমাণের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। মহাভারতের প্রমাণও এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। মহাভারতে সম্রাট্ অর্থ সার্ব্বভৌম এবং রাজসূয় যজ্ঞই "সম্রাট্সব।" সভাপর্ব্বে (১১ অঃ) উক্ত হইয়াছে, "রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র-প্রভাবে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন।" তারপর (সভা—প, ১৩ অ) কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"হে ভরত-সত্তম! তুমি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া

নিতান্ত আবশ্যক ; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল।”

এখানে দেখা যাইবে মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞ বেদের বিহিত রাজসূয় যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র। বেদে আগে যজ্ঞানুষ্ঠান, পরে সাম্রাজ্য বা সার্ব্বভৌমত্বলাভ। আর মহাভারতে আগে দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য বা সার্ব্বভৌমত্ব-প্রতিষ্ঠা, পরে যজ্ঞানুষ্ঠান। বেদের রাজসূয় যজ্ঞ রাজার অভিষেক-ক্রিয়ার নামান্তর ; ছোট বড় সকল রাজারই তাহাতে সমান অধিকার। মহাভারতের রাজসূয়ানুষ্ঠানের অধিকারী কেবলমাত্র একরাট্ সম্রাট। বেদে এবং মহাভারতে এরূপ বিধি-বিরোধের কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, মহাভারতের এই সকল অংশ মাগধ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে রচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইক্ষ্বাকুবংশধর হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের কথা আছে, কিন্তু পৃথিবীজয় করিয়া যজ্ঞের আয়োজনের কথা নাই (৮।৩৩)। হরিশ্চন্দ্র বরুণের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অভিষেক-অনুষ্ঠানের দিনে শুনঃশেফকে পুরুষ পশুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া উদররোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। দুই মাতার গর্ভ হইতে দুটি অর্দ্ধকলেবররূপে নির্গত, জরারাক্ষসীকর্ত্তৃক সন্ধিত বা সংযোজিত, জরাসন্ধকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। জরাসন্ধ মহাপদ্ম বা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের ছায়া লইয়া পরিকল্পিত

বলিয়া মনে হয়। মগধের জরাসন্ধের সাম্রাজ্যে এবং কুরুবংশীয় যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যে প্রভেদও বিস্তর। জরাসন্ধ খণ্ডরাজ্যের নৃপতিগণকে বশীভূত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ষড়শীতি জন নৃপতিকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং আর চতুর্দ্দশ জন সংগৃহীত হইলে ১০০জন নৃপতিকে একসঙ্গে সংহার করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতিনিধিরূপে অর্জ্জুনাদিও দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনও দিক্‌পালকে রাজ্যচ্যুত বা কাহারও স্বাধীনতা হরণ করেন নাই; যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য কর সংগ্রহ এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজারা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। অধীনতা স্বীকার করিলে কদাপি তাঁহারা অর্ব্বাভিহরণউপলক্ষে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইতেন না। মহাভারতকার রাজসূয়যাজী যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এরূপ যথেচ্ছাচারে অধিকারী নৃপতিসঙ্ঘকে যজ্ঞসভায় উপস্থিত করাকেই যদি সাম্রাজ্য স্থাপন বলিতে হয় তবে তেমন সাম্রাজ্য কখন কখন বৈদিক যুগে দৃষ্ট হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগেও প্রাদুর্ভূত ভরত দৌঃষন্তি বা দুর্ম্মুখ পাঞ্চালের মত কোন কোন রাজা স্বীয় যজ্ঞসভায় পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যনিচয়ের নৃপতিগণকে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। জরাসন্ধের আখ্যায়িকা এবং মহাপদ্ম ও মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে মগধেই উত্তরাপথে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সাহিত্যে আভিজাত্য

কিছুদিন হইতে দেশে একটি কথা উঠিয়াছে যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য "ইংরাজী গন্ধী" ;—দেশের নাড়ীর সহিত ইহার সংযোগ নাই ; দেশের জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা—এককথায় তাহাদের প্রাণের কথা ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা কেবলমাত্র একটি সংকীর্ণ অহিন্দু বা বিজাতীয়ভাবাপন্ন (de-nationalised) সম্প্রদায়ের অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণের ফল। সুতরাং ইহা "স্রোতের শৈবালের মত" অদূর ভবিষ্যতেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তাহার স্থানে দাশুরায়ের পাঁচালি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতির রচনা রাজত্ব করিবে। বড়জোর ঈশ্বর গুপ্ত (বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে) এই সাহিত্যের রাজ্যে স্থান পাইবেন, কারণ তিনিই "শেষ খাঁটি বাঙ্গালীর কবি।"

"ইংরাজী গন্ধী" ভিন্ন বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের—প্রধানতঃ কাব্যের—বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে তাহা অত্যন্ত aristocratic অর্থাৎ আভিজাত্যভাবাপন্ন এবং তাহা "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" ও "ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব"। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দেশের অভাব-অভিযোগের কথা না ভাবিয়া, সমাজের হিতাহিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র নিজের মন হইতে "লূতাতন্তুর মত" কতকগুলি ভাব সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান কালের

লেখকগণ তাহা সাহিত্যে আমদানি করিতেছেন। ইহাতে না আছে "বস্তুগত-সত্য," না আছে সমাজরক্ষার প্রতি দৃষ্টি। দেশের "জনসাধারণের নিকট" ইহার না আছে কোনো অর্থ, না আছে কোনো মূল্য।

অভিযুক্ত সাহিত্যিকগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকলেই আছেন। তবে রবীন্দ্রনাথকেই যে প্রধান আসামী করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ বিস্তর। কেননা বিশেষ-করিয়া কাব্যের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ আনা হইয়াছে।

যাঁহারা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে "ইংরাজী গন্ধী" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন তাঁহাদের প্রকৃত সাহিত্যসম্বন্ধে ধারণা কিরূপ তাহা জানি না। কিরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হইলে প্রকৃত বাঙ্গলা সাহিত্য হয় তাহার বিশেষ উল্লেখ তাঁহাদের রচনার মধ্যে কোথাও নাই। তবে তাঁহাদের রচনার ইঙ্গিত হইতে যাহা বুঝা যায় তাহার মর্ম্ম এই যে, যাহা বহুকাল হইতে দেশে আছে—দেশের সমুদায় লোকের যাহা সাধারণ ভাব ও সম্পত্তি তদতিরিক্ত যাহা-কিছু তাহা সে দেশের সম্পত্তি নহে। এই হিসাবে পাঁচালি, কবির গান, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এবং আর যাহা ঐ সকলের অনুকরণ হইতে উদ্ভূত তাহাই বাঙ্গলার সাহিত্য।

ইহাদের নিকট সাহিত্যের মূল্য তাহার জাতীয়তা লইয়া এবং জাতীয়তার criterion অথবা প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি লইয়া। যে সাহিত্যে দেশের এবং সামাজের কথা প্রচুর পরিমাণে নাই তাহা তাঁহাদের নিকট আদরণীয় নহে এবং যে সাহিত্য দেশের জনসাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং আয়ত্বাধীন নহে তাহা সে

দেশের জাতীয় সাহিত্য নহে। সুতরাং সেরূপ সাহিত্য হয় একেবারে সাহিত্যই নহে, না হয় বড়জোর বিদেশীভাবাপন্ন এবং আভিজাত্যাভিমানী অকিঞ্চিৎকর স্বল্প-কালস্থায়ী সাহিত্য।

আমাদের মনে হয় ইঁহাদের কোনো ধারণাই সত্য নহে। সাহিত্যকে—প্রধানতঃ কাব্য-সাহিত্যকে জাতীয়তার মাপকাটি লইয়া বিচার করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। যিনি প্রকৃত কবি তিনি সত্যের দ্রষ্টা। তিনি আপনার রচনার মধ্য দিয়া সত্যকে ফুটাইয়া তুলেন। যাহা-কিছু ঘটিতেছে, যাহা-কিছু হইতেছে তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া তাহার অন্তরালে যে পরম সত্য পদার্থ রহিয়াছে তাহাকেই তিনি নিয়ত ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি রসের মধ্যে দিয়া আনন্দময়ের—*সুন্দরের* প্রকৃত রূপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন। দৈনিক জীবনের কর্ম্মের মধ্যে মানুষ অন্ধভাবে যাহার অনুসরণ করিতেছে অথচ পাইতেছে না, নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া মানুষ যে মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অথচ আপনাকে ক্রমাগতই নব নব বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে—কবি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে সেই সত্যের ও সেই মুক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্রের মধ্যে যাহা মহৎ, ক্ষণিকের মধ্যে যাহা অনন্ত, পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা সনাতন, বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা এক কবি তাহাকেই আপনার অনুভূতির মধ্য দিয়া মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন।

এই সত্য শিব সুন্দরের বার্ত্তা প্রচার করেন বলিয়া কবি সাম্প্রদায়িক নহেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের। কারণ সত্য শিব সুন্দর ত কোনো দেশকালের গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে।

তাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বসমাজের সর্ব্বমানুষেরই প্রাণের সম্পত্তি ;— তাহাতেই মানুষের স্থিতি এবং পরিণতি। কবি যখন তাহা প্রচার করেন তখন বিশ্বমানবের অনন্তকালব্যাপী অনন্ত সম্পদের কথাই প্রচার করেন। Emerson এই জন্যই একস্থলে বলিয়াছেন "The poet is not a contemporary but an eternal man।" সুতরাং যিনি প্রকৃত কবি তিনি কোনো জাতিবিশেষের অথবা কোনো দেশবিশেষের লোক নহেন। তাঁহার বার্ত্তা কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর জন্য নহে—তাহা মানুষের আত্মার মুক্তির বার্ত্তা ; তাহা সার্ব্বজনীন, তাহা সর্ব্বসাধারণের।

কবি এই সার্ব্বজনীন সত্যকে রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন ; সেই জন্যই তিনি কোনো সামাজিক অথবা ব্যবহারিক (conventional) প্রয়োজনের নিকট আপনার মস্তক অবনত করিতে বাধ্য নহেন। এইখানেই তাঁহার স্বাধীনতা। তিনি যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করেন তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার খাতিরে খর্ব্ব করিয়া প্রকাশ করেন না। তিনি বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র এক সত্য ভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারাই আবদ্ধ নহেন। তাঁহার বাণীর প্রভাব দেশের উপর কিরূপ হইবে, তিনি যে সত্যের আলোকপাত করিবেন তাহাতে সমাজের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিবে কিনা, তিনি যে মুক্তির অমৃতময়ী গাথা প্রচার করিবেন তাহা জনসংঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনিবে কিনা—এ সকল কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বিষয় নহে। প্রয়োজনের সহিত বাস্তবের সন্ধি করিয়া কবি সত্যের মর্য্যাদা হানি করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাঁহার কবির দিব্যদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতলোকে যে সত্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিবেন

ছন্দের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া তাহাকেই প্রকাশ করিবেন। সেই প্রকাশের ফলাফল তাঁহার দর্শনীয় নহে। কারণ তাঁহার এই প্রকাশ ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে। এই বৈচিত্র্যময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী এবং অনন্ত রহস্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইয়া আত্মহারা হইয়া কবি যখন গাহিয়া উঠেন তখন সেই গীতি স্বতঃউৎসারিত। কবি টেনিসন সত্যই বলিয়াছেন—"I sing because I must"। কবি গাহেন, কেননা না-গাহিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। সুতরাং কবি যাহা প্রকাশ করেন প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্যেরই স্বতঃপ্রকাশ।

এই জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় যে যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার সহিত তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কারণ তাঁহার দৃষ্টি সমাজের আপাতপ্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়; সাময়িক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিপ্লবের বাহিরে যেখানে চির-সামঞ্জস্য বর্ত্তমান সেখান হইতে তিনি শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন। এইজন্য গেটে, সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সহিত তাঁহাদের দেশের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

ইহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবেরই কথা—লজ্জার কথা নয়। বর্ত্তমানের কুহেলিকা যে তাঁহাদের দৃষ্টিকে বাধা দিতে পারে নাই—আপাতপ্রয়োজনের প্রতি নিজের শক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া তাঁহারা যে সনাতন সত্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দার কথা নহে—শ্লাঘারই পরিচায়ক।

এই জন্যই সাধারণতঃ যাহাকে জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় কবিতা বলা হয় প্রকৃতপক্ষে যিনি কবি তাঁহার রচনা সেই শ্রেণীভুক্ত নহে; কিন্তু যাহা প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য বা জাতীয় কবিতা তাহার সহিত উহা অভিন্ন। জাতীয় সাহিত্য বলিতে যদি জাতীয় কোনো বিশেষ সমাজ রক্ষা ও সংস্কারের উপযোগী সাহিত্য বলা যায় তবে তাহা যে বিশ্ব-সাহিত্য হইবে এমন কোনো কথা নাই। কবি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবেন, সত্যকে প্রকাশ করিবেন, মঙ্গলকে জীবনে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহার সমসাময়িক সমাজের উপকার হয়, হইল; আর যদি তাহার ফলে দেশবাসী অপকার হইয়াছে মনে করে তাহাতেও তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ তাঁহার সৃষ্টি ত কোনো সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যমূলক নহে—তাহা অহেতুক অনাবিল আনন্দ হইতে উৎপন্ন। তবে কবির যাহা বিশিষ্ট বাণী, তাহা যদি কবির দেশের বাণী হইয়া থাকে, কবির যাহা প্রাণের কথা তাহা যদি তাহার দেশের প্রাণের কথা হইয়া থাকে তবে তাঁহাকে আমরা জাতীয় কবি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে যিনি প্রকৃত কবি তিনি জাতীয় কবি হইতে বাধ্য নহেন; এবং যখন তিনি জাতীয় কবি তখনও তিনি অন্যভাবে বিশ্বকবি। মহাকবি গেটে বলিয়াছিলেন —বিশ্বসাহিত্যই কবিদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করা অথবা না করা কবিদের স্বেচ্ছাধীন নহে।

পৃথিবীতে কবিরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত;—তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন যাহাদের জীবনের কাজ কেবলমাত্র সত্য ও মঙ্গলকে রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা।

কালিদাস, সেক্ষপীয়র, গেটে, দান্তে, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাই ভাবের দিক দিয়া ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ।

কিন্তু তাই বলিয়া এই সম্প্রদায়কে যাঁহারা aristocratic অর্থাৎ আভিজাত্যাভিমানী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বলিয়া মনে করিবেন তাঁহারা মস্ত ভুল করিবেন। কবি একহিসাবে যে অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি যাহা প্রকাশ করেন আপামরসাধারণে তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। সংসারের সাধারণলোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ; জীবনসংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে তাহারা এমনি ভাবে নিত্য নিষ্পিষ্ট হইতেছে যে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশমাত্র তাহাদের নাই; ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় এরূপ অন্ধভাবে নিশিদিন তাহারা পরিচালিত যে জীবনকে বৃহৎভাবে দেখিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাহাদের লুপ্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল-মাত্র বর্ত্তমানকে লইয়াই জীবন কাটাইতেছে; কেবল আপাত-প্রয়োজনের দিক্‌চক্ররেখার দ্বারাই তাহাদের জীবন আবদ্ধ। সুতরাং এই সকল বদ্ধ সাংসারিকের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবি যখন ঊর্দ্ধে নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অমৃতরাজ্যের চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন মহাবার্ত্তা ঘোষণা করেন—যখন তিনি মানুষকে মুক্তির অভয় মন্ত্র শুনাইয়া, জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার আশা প্রদান করিয়া মোহ ও জড়তার জাল ছিন্ন করিয়া দিতে চান তখন প্রথমে সাধারণ মানব তাঁহার সে বাণীর অর্থ ও মর্য্যাদা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহার কথা ও কার্য্যের সহিত সে আপনার জীবনের কোনো সম্বন্ধ

দেখিতে পায় না। বরং সে দেখে সে যাহাকে শ্রেয় ও প্রেয় মনে করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কবি অন্যভাবে অভিহিত করিতেছেন। তাই কবির রচনাকে সে অর্থহীন বাক্য-সমষ্টি অথবা আভিজাত্য-ভাবাপন্ন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। গড্ডলিকাপ্রবাহে কবি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া গতানুগতিক হন নাই বলিয়া কবিকে aristocratic বল ক্ষতি নাই—কিন্তু তাঁহার aristocracy নিন্দনীয় নহে।

প্রকৃত সাহিত্যে যে আভিজাত্যের লক্ষণ দেখা যায় তাহার আর একটি কারণ আছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে ভাবের দিক ছাড়া শিল্পের একটি দিক্ আছে। কবিতা একহিসাবে কবির আনন্দ হইতে স্বভাবতঃ জন্মগ্রহণ করিলেও উহার পশ্চাতে কবির বহুদিনের সাধনা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুন্দরকে যে আকার প্রদান করিয়া তিনি মানুষের সম্মুখে বাহির করেন তাহার মধ্যে কবির শিল্পচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় থাকে। তাই বলিয়া যাঁহারা কবিতার এই form বা আকারকে নিরবচ্ছিন্ন কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে ইহার মধ্যেও কবির স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট অবকাশ ও স্থান আছে। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা করেন আপনার বাণীকে প্রকাশ করিতে পারেন;—কবির এই যে স্বাধীনতা ইহাকে খর্ব্ব করিলে কবির আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে, তাহার হৃদয়ের আবেগ বাধা পাইবে।

সুতরাং কবিকে পাঠকের মনের মত করিয়া রচনা করিতে বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যদি তাঁহার বাণী বুঝিতে চাও তোমাকে তাঁহার মত হইতে হইবে। মিল্টনের কবিতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া একজন বিখ্যাত সমালোচক ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সুবিখ্যাত সমালোচক Walter Raleigh সেক্ষপীয়রের কবিতা

সমালোচনা করিতে করিতে একস্থানে বলিয়াছেন—"কবিকে বুঝিতে হইলে কবির স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহা দেখিতে হইবে।" অতএব যদি কোনো কবির রচনা সাধারণপাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য হয় তাহা হইলে সে পাঠকেরই দুরদৃষ্ট। ইহাতে যাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাচ্ছিল্য করিতে চান করিতে পারেন ; তাহাতে কবির কোনও ক্ষতি নাই। কারণ তিনি জানেন যে যদি তাঁহার রচনার মধ্যে সত্য সুন্দর মঙ্গলের কোনো বার্ত্তা থাকে তবে তাহা একদিন-না-একদিন কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেই।

অধিকারীভেদ সর্ব্বত্রই আছে ; জ্ঞানের ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে সৌন্দর্য্য-উপভোগের যে প্রভেদ হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায় সকলেই বুঝিতে পারিবে এরূপ আশা করা অন্যায়। Mark Patison একস্থানে Paradise Lost-এর সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"The true apprecia tion of Paradise Lost is the last result of consummate scholarship." অতএব মুদির দোকানে যে খাতা লেখে, কিম্বা ডাকঘরে বসিয়া যে মণিঅর্ডারের ফরম্ পূরণ করে সে যদি হঠাৎ একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া বলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অকবি তাহাতে হাস্য ভিন্ন অপর কোনো রসেরই উদ্রেক হয় না। কারণ জগতের মধ্যে কি সাহিত্যে, কি শিল্পে কি ভাস্কর্য্যে যাহা শ্রেষ্ঠ—তাহার মূল্য সাধারণের আদর অথবা অনাদর দ্বারা যদি বিচার করা যায় তবে মূঢ়তাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

এস্থলে অনেকে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড প্রভৃতির কথা

উল্লেখ করিয়া যে বকাবকি আরম্ভ করিবেন তাহা জানি। কিন্তু লোকসাহিত্য এবং আসল সাহিত্যের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা যে স্থায়ী সাহিত্যের কথা বলিতেছি তাহার মধ্যে জনসাধারণের সাহিত্য থাকিতে পারে—কিন্তু জনসাধারণের সাহিত্য ভিন্ন যে অন্য-কোনোরূপ সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারে না এরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র।

কিন্তু এই সাহিত্য—যাহাকে আভিজাত্যাভিমানী বলিয়া অনেকে উপহাস করেন—তাহাকে 'আত্মসর্ব্বস্ব' বলিতে পারি না। সাহিত্যে তাহাই 'আত্মসর্ব্বস্ব' যাহা আদ্যোপান্ত কবির fancy অথবা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা হইতে উদ্ভূত; তাহাই "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" যাহার মূলে কোনো সত্যের অনুভূতি নাই। দেশের বর্ত্তমান কোনো ঘটনার সহিত, সমাজের কার্য্যকলাপ ও গতির সহিত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই বলিয়া কবির রচনাকে বস্তুবিহীন "আত্মসর্ব্বস্ব" বলা অন্যায় হইবে। যিনি সমাজের কর্ম্মের সহিত যোগদান করেন, যিনি দেশের সেবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য গান রচনা করেন, যিনি সমাজের প্রয়োজনানুসারে আপনার বীণার ঠাট বদলাইয়া লন্ তিনি কবি হইতে পারেন, তিনি বরেণ্য সন্দেহ নাই, তিনি দেশের ও জাতির অশেষ উপকার করিতেছেন তাহাও মানিতে পারি, কিন্তু যিনি বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যেও স্থির আত্মসমাহিত থাকিয়া আপনার দিব্য দৃষ্টিতে ঋষির মত সত্য শিব ও সুন্দরকে দর্শন করিতেছেন এবং সেই দিব্যলোকের দিব্য রাগিণীতে আপনার বীণা বাঁধিয়া গান করিতেছেন তাহাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না; তিনি সাময়িক কবি নহেন, তিনি চিরদিনকার বিশ্বের কবি; মানুষ তাঁহার মধ্যে আপনার বর্ত্তমানের

প্রয়োজনসাধনোপযোগী বস্তু না পাইলেও মানুষের যাহা অন্তরের ধন, যাহা তাহার প্রিয় হইতে প্রিয়তম বস্তু তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে।

অতএব বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা নাই বলিয়া আক্ষেপের কারণ নাই; যদি এখনকার কাহারও রচনার মধ্যে সত্য প্রকাশ হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা আনন্দের দিব্যধাম হইতে কিছু আনিতে পারিয়া থাকেন তবেই তাঁহাদের রচনা সার্থক। তাঁহাদিগকে গালি দিলে শুধু আমাদেরই কাব্য-উপভোগের অক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে।

যাঁহারা সাহিত্যকে ইংরাজী গন্ধী বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিত্যই ভাবের আদানপ্রদান চলিতেছে। তাঁহারা মনে করেন প্রত্যেক জাতিরই যে বিশেষত্ব আছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ প্রাণহীন। বাহ্যজগতের সহিত সংঘর্ষে, বিভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতে জাতীয় জীবন যে জাগিয়া উঠে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সজীব ও নির্জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নির্জীবের পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কিন্তু সজীব নিয়ত বাহিরের জগৎ হইতে বস্তু আহরণ করিয়া আপনার প্রাণশক্তির রসে তাহাকে নিষিক্ত করিয়া আপনাকে পুষ্ট করে।

অতএব পশ্চিমের সহিত সংঘাতে আমাদের জাতীয় চেতনা যদি নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়া থাকে এবং পশ্চিমের শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছিল তাহা হইতে জীবনকে একটু অন্যভাবে পরিচালিত করিয়া থাকে তবে তাহাতে ক্রোধের অথবা বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। হয়তো পশ্চিমের অপরিচিত সভ্যতার প্রথম আলোকপাতে

চোখে ধাঁধাঁ লাগিবে—হয়তো দেশের প্রাচীন গণ্ডিবদ্ধ জীবন হইতে বাহিরে আসিয়া প্রথমে পথভ্রষ্ট হইতে হইবে; কিন্তু তবুও তাহাতে সমাজের ক্ষতির অপেক্ষা বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

জাতীয় জীবন গতিহীন জড়পদার্থ নহে। শিক্ষার সাহচর্য্যে সময়ের সহিত তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—তবে সজীবতার যাহা লক্ষণ, বাহিরের জিনিষকে নিজের মত করিয়া লওয়া, পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনার সত্বাকে বিকাশ করা—তাহা অবশ্য তাহার মধ্যে থাকিবে।

জাতীয় জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন অথবা পরিপুষ্টি প্রথমে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পায় না। নবজীবনের অরুণ কিরণ সংস্পর্শে সমাজের যাঁহারা বিশাল মহীরুহস্বরূপ তাঁহারাই প্রথমে জাগিয়া উঠেন এবং নবজীবনের বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করেন। তাঁহাদের বার্ত্তার সহিত, তাঁহাদের রচনার সহিত, তাঁহাদের জীবনের সহিত দেশের প্রাচীনতম কালের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা মূঢ়তা মাত্র। কারণ তাঁহারা সমাজের অগ্রগামী দূত—সমাজকে যাহা হইতে হইবে সেই কথাই তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন।

একথা মনে করা অন্যায় হইবে যে পাঁচালি, কবির গান, অথবা রামায়ণ-মহাভারতই চিরকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের ও বাঙ্গলার সাহিত্য এবং জাতীয়তার একমাত্র নিদর্শন হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে যে শিক্ষা ও সাধনা, যে জীবনের অভিজ্ঞতা ও উদারতা রহিয়াছে মুদী অথবা পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহা নাই বলিয়াই তাহারা ইঁহাদিগকে আদর করিতে পারে না। ইহাতে বঙ্কিম অথবা রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা না করিয়া বরং আমাদিগের লজ্জায় মস্তক অবনত করা উচিত।

যাঁহারা ইঁহাদিগকে বিজাতীয়ভাবাপন্ন বলেন তাঁহাদিগকে আর একটি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ভাবেন দেশের প্রকৃত যে spirit ও temper তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত; অতএব জনসাধারণ যাহা প্রত্যাখ্যান করে তাহা যে বিদেশীয়ভাবাপন্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা যে সত্য নহে তাহার বিস্তর প্রমাণ ইতিহাসে আছে। যাহার সহিত দেশের সাময়িক অবস্থার কোনো সম্পর্ক নাই তাহা একহিসাবে অবশ্য দেশের কথা নহে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় কবির কথা দেশের সেই প্রাণের কথা যে প্রাণ দেশের অতীত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ও চিরন্তন, বাস্তব ও আদর্শ এই তুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ভুলিলে চলিবে না। দেশের সাধারণলোক বর্ত্তমানের মধ্যে এমন আত্মহারা হইয়া নিমজ্জিত থাকে যে তাহারা অনেক সময় সনাতনের কথা ভুলিয়া যায়। দেশের কবি, দার্শনিক প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই তখন তাহাদিগকে দেশের প্রকৃত যে লক্ষ্য, দেশের প্রকৃত যে আদর্শ তাহা বলিয়া দেন। দেশের সাধারণলোক তাঁহাদের কথা দেশের নহে বলিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা জানেন যে দেশকে তাঁহাদের কথাই একদিন-না-একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। দার্শনিক Emerson কবি সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন—

"He is isolated among his contemporaries, by truth and by his art, but with this consolation in his pursuits that they will draw all men sooner or late"

শ্রীমহীতোষকুমার রায়চৌধুরী।

সপ্তম সংখ্যা]　　　　কার্ত্তিক ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সন্ধ্যার যাত্রী

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুঃখের প্রীতি,
বিদায়-বেলায় আজিও রহিল বাকী।

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

২ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মত যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মত গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোট—তাহাকে ছোট করিয়াই লিখিব। ছোটকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম—কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরীব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মা'র হাতেই আমি মানুষ। মা

গরীবের ঘরের মেয়ে, তাই, আমরা যে ধনী একথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে-কোলেই মানুষ—বোধ করি সেইজন্য শেষপর্য্যন্ত আমার পূরাপূরি বয়সই হইল না। আজো আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়-জোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মত তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্য্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মত করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি—যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়-ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেণ্ট, বিবাহসম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর

করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্ত্তে বাঁধা-হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে৷

কিছুদিন পূর্ব্বেই এম্ এ, পাস করিয়াছি। সাম্‌নে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই, নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই,—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল,—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্ম্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, মেয়ে যদি বল, তবে—। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মত কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ধুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত্ত। আমি হরিশকে বলিলাম, একবার মামার কাছে কথাটা পড়িয়া দেখ।

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্ব্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি।

এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গল-ঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্য্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরীব গৃহস্থের মতই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে ত কোনো দোষ নাই? না দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে ত বরের হাট মহার্ঘ্য, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলি সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক্, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আণ্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা,—আমার পিস্‌তুত ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর

করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে। বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি চমৎকার, সেখানে তিনি বলেন চলনসই। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

(২)

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মত চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুসি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পূরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে সহরের কারো চেয়ে কম নয় সেইটেকেই তিনি নানাপ্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত

নিৰ্জ্জীব,—একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্ তেজ থাকাটা দোষের—অতএব মামা মনে মনে খুসি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণসম্বন্ধে দুইপক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্ত্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক ত স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না—জানিতাম না, দেনা-পাওনা কি স্থির হইল। মনে জানিতাম এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ—এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্ব্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্ব্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন এ একেবারে ধরা কথা। এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্যপক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব আমাদের সংসারের এই জেদ, ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারী করিতে হইলে কেরাণী রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপরপক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশী, সখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ

শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্ব্বর কোলাহলের মত্তহস্তি-দ্বারা সঙ্গীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি ত বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুসি হইলেন না। একে ত উঠানটাতে বরযাত্রিদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথ বাবুর ব্যবহারটাও নেহাৎ ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে ত কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকীল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে সুরু করিয়া বরকর্ত্তাদের প্রত্যেককে বারবার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কি কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, বাবাজি, একবার এই দিকে আস্তে হচ্চে।

ব্যাপারখানা এই :—সকলের না হউক কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য

ছিল তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়ি-ভাড়া, সওগাদ, লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন দেওয়া-থোওয়াসম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে, এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ সুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন ইহাতে তুমি কি বল?

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, ও আবার কি বলিবে? আমি যা বলিব তাই হইবে।

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

আচ্ছা তবে বোস, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি, —এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, অনুপম এখানে কি করিবে? ও সভায় গিয়া বসুক।

শম্ভুনাথ বলিলেন, না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা,—হাল ফেসানের সূক্ষ্ম কাজ নয়,—যেমন মোটা, তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, এ আর দেখিব কি? ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোট্‌বইয়ে গহনাগুলির ফর্দ্দ টুকিয়া লইলেন,—পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, এইটে একবার পরখ করিয়া দেখ।

স্যাকরা কহিল, ইহা বিলাতী মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে

চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন—অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া বোস গে।

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।

মামা বলিলেন, সে কি কথা ? লগ্ন—

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন—সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।

লোকটি নেহাৎ ভালোমানুষ-ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন সে কি কথা ? বিবাহের পূর্ব্বে বর খাইবে কেমন করিয়া ?

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল ? বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে ?

মূর্ত্তিমতী মাতৃআজ্ঞাস্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে

পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—

মামা বলিলেন,—তা সভায় চলুন, আমরা ত প্রস্তুত আছি।

শম্ভুনাথ বলিলেন, তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই ?

মামা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ঠাট্টা করিতেছেন নাকি ?

শম্ভুনাথ কহিলেন—ঠাট্টা ত॰ আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

মামা দুই চোখ এতবড় করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব একথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়-লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্ত্তব্যের বরাৎ দিয়া কোথায় যে মহানির্ব্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে ত রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর ! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল ! সকলে বলিল, দেখি, মেয়ের

বিয়ে দেন কেমন করিয়া ? কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি ?

সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত-বড় সৎপাত্রের কপালে এতবড় কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল ? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল,—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান-মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্‌সোশ মিটিত।

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবীতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পূরা হইবে।

বলা বাহুল্য আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল সাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কি যে তা

কেমন করিয়া বলিব ? আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল।—হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু একমুহূর্ত্তে অসীম হইয়া উঠিল !

এতদিন যে প্রতিসন্ধ্যায় • আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মত আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড় আশ্চর্য্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল;—বাহিরে ত সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই কি। না করিবার ত কোনো কারণ নাই। আমার মন্ বলে সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না ? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুইধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না ? হঠাৎ বাহিরে কারো পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না ?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা ত লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন? হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, মা তোর কি হইয়াছে বল্ আমাকে।—মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, কই, কিছুই ত হয় নি বাবা!—বাপের এক মেয়ে যে,—বড় আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মত মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মত রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, বেশ ত, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক্, আলো জ্বলুক, দেশ বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক্, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।—কিন্তু

যে ধারাটি চোখের জলের মত শুভ্র, সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসিগে।—তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর, আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তারপরে আমার কথাটি ফুরালো।

(৪)

কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেল-গাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ ষ্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন:—কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট;—ষ্টেশনের দীপ কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহুদূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন—

আলোর নীচে সবুজ পর্দ্দা টানা—তোরঙ্গ বাক্স জিনিষপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্ন-লোকের উলটপালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল —শীগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।

মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা—শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, এমন ত আর শুনি নাই।

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য। রূপ জিনিষটি বড় কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্ব্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারি চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম—কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্ম্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল,—আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সাম্‌নে কোনো মূর্ত্তি ছিলনা—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মত, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো স্বর, অচেনা কণ্ঠের স্বর, এক নিমেষে

তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ তুমি—চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মত ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল—আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া —"গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি? জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনেনা। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়? জায়গা আছে, আছে—শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি প্ল্যাটফর্ম্মে সাহেবদের আর্দ্দালিদল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্ এক ফৌজের বড় জেনেরালসাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম ফার্ষ্টক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম।

সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।

আমি ত চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্য্যমধুর কণ্ঠ, এবং সেই গানেরই ধুয়া—"জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিষপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মত অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তারপরে—কি লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোথায় সুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে,—কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্ম্মল, সৌন্দর্য্যের শুচিতা অপূর্ব্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে

অসম্ভব। এমন কি, সে যে কি রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক—রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মত সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে, সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে ত সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষী কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না—ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশপঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয় তাহাকেই শোনে, তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্য্যকিরণকে

সজীব করিয়া তুলিল, আমার মনে হইল আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের ষ্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসঙ্কোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না? হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না?

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দো-মনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই বিশেষত এমন লোভীর মত খাইতেছে সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারো সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনেরালসাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই ষ্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়ীতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা ত ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্ব্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্ম্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া, আমাকে বলিল, এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।

আমি ত তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, না আমরা গাড়ি ছাড়িব না।

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, না ছাড়িয়া উপায় নাই।

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি দুঃখিত কিন্তু—

শুনিয়া আমি কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, না আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা একথা মিথ্যা কথা—বলিয়া নামলেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দ্দালিসমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দ্দালিকে প্রথমে ইসারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কথা হইল জানি না। দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও

আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানামুঠ খাইতে সুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত—ষ্টেশনে একটি হিন্দুস্থানী চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি মা?

মেয়েটি বলিল, আমার নাম কল্যাণী।

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

তোমার বাবা—

তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি—শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, আমি বিবাহ করিব না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন?

সে বলিল, মাতৃআজ্ঞা।

কি সর্ব্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে না কি?

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে," সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই ত জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই ত আমি জায়গা পাইয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ প্রণাম

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত ! তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

যৌথ-পরিবার

প্রাচীনেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, হিন্দুর পরিবার ভাঙ্গায় হিন্দুজাতির অধঃপতন হইতেছে। যদি জাতির পুনরুদ্ধার করিতে হয়, যদি সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সনাতন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কিন্তু সমাজের ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের যৌথ-পরিবারের পূর্ব্ব পরিসর, বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার পীড়নে বাধ্য হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সহিত পরিবারের অন্তর্নিহিত একীকরণ-শক্তির বিকাশ কতকটা নূতন-রকমের হইতেই হইবে। সুতরাং জাতীয় শক্তিসংযোগের চেষ্টা, ভবিষ্যতে ঠিক অতীতের আদর্শে করিলে চলিবে না।

আমাদের সনাতন পরিবার যে আজ নূতন করিয়া ভাঙ্গিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ মনে করা ভুল। প্রাচীন-সমাজনীতি সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন-সাহিত্যে যে. পরিচয় পাই তাহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, সে সাহিত্য যে যুগযুগান্তের সৃষ্টি সেই-সমুদয় যুগে পরিবারসম্বন্ধে যে, কোন-একটি চিরস্থায়ী সংস্কার বা আদর্শ ছিল এমন নহে। বরং ইহাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, পরিবারের গঠন ও আদর্শ নানা যুগে নানারূপে বিকশিত হইয়াছে; এবং আজ যেমন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার গতিকে পরিবারের মূর্ত্তি ফিরিতেছে, তেমনি অতীত কালেও জাতির

সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবারের গঠন ও আদর্শের নানা প্রভেদ দেশকালভেদে ঘটিয়াছে।

সুদূর অতীতে, বেদের যুগে; সমাজের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ ছিল এবং তাহা সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত এবং আর্য্যেতর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে নানা দেশে নানা যুগে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সমুদয় সূত্রগুলি অনুসরণ করিয়া দেখান সাধ্য হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমি এ প্রবন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে হিন্দুজাতির পরিবার-গঠনসম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের দেশকালভেদে কিরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছিল তাহারই কয়েকটি নিদর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্ত্তমান অভিশপ্ত যুগেও আমরা নিতান্ত একা থাকি না, আমাদেরও এক-একটা পরিবার আছে। তবে নব্যদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমাদের পরিবারের গণ্ডী ক্রমশঃ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের পরিবার স্বামী স্ত্রী এবং পুত্রকন্যায় পর্য্যবসিত। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়াও আমরা বড় থাকিতে চাই না, দূর-কুটুম্বের তো কথাই নাই।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিবারের আদর্শ অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্য হইতে দেখান যাইতে পারে যে, সেকালে আর্য্যেরা প্রায়ই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়াই থাকিতেন। বৈদিক সাহিত্যে যে-সমুদয় উপাখ্যান আছে তাহাতে বহুকুটুম্বপরিবৃত বিপুল সংসারের বড় অধিক পরিচয় নাই। অধিকাংশ পরিবারই স্বামীস্ত্রী পুত্রকন্যা ও দাসদাসীতে পর্য্যবসিত। ব্রাহ্মণাদিতে এবং প্রয়োগগ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জীবনের

যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই তাহাতে এই আদর্শই যেন যথার্থ সনাতন আদর্শ বলিয়া মনে হয়। সেকালে ব্রাহ্মণগৃহে এবং সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গৃহেও সকলেরই উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরু-গৃহবাস অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। সে গুরুগৃহের যে-সকল বর্ণনা আছে তাহাতে অন্তেবাসী যতই অধিক থাকুক, সেখানে বহুগোষ্ঠীর কোনও পরিচয় পাই না। তাহা ছাড়া গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও গুরুকন্যার প্রতি কর্ত্তব্যের যথেষ্ট উপদেশ থাকিলেও তাঁহাদের অধিকতর দূর-কুটুম্বের প্রতি কর্ত্তব্য বা সম্মানাদি প্রদর্শন সম্বন্ধে কোন বিধান পাই না। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্যগণ পত্নী পুত্র ও অনূঢ়া কন্যা লইয়াই সংসার করিতেন, অন্য পরিবার তাঁহাদিগের ছিল না।

তারপর বিধি আছে যে, গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিষ্য গুরুকে বরপ্রদান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে স্নান করিবে। স্নাতক গৃহে ফিরিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থে এবং অতি আধুনিক গ্রন্থেও আমরা এই বিধান বার বার দেখিতে পাই। এখন এই গৃহপতির অগ্নি-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা কেবলমাত্র স্বতন্ত্র পরিবার-প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। এই অগ্নি আজিকার বস্তু নহে। সকল দেশেই আর্য্যগণ গৃহে গৃহে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীস, রোমপ্রভৃতি সকল দেশেই দেখিতে পাই এই অগ্নি গৃহের দেবতা এবং গৃহের একত্বের লিঙ্গ। এক গৃহে এক অগ্নি ব্যতীত দুই অগ্নি যে থাকিতে পারে না তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নূতন অগ্নি-

প্রতিষ্ঠা নূতন এবং স্বতন্ত্র গৃহ-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এইরূপ যখনই নূতন সংসার পাতিবার পরিচয় পাই, তখনই নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠা তাহার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই। স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে সংসার ঘুচিয়া যাওয়ার নিদর্শনস্বরূপ অগ্নিতে পত্নীকে দাহ করিয়া পুনরায় নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠার—অর্থাৎ বিবাহের ব্যবস্থা আছে। যৌথ-পরিবারের বিভাগ হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, নূতন অগ্নি সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র সংসারস্থাপনের পরিচায়ক। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্নাতকের বিবাহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ব্যবস্থা যে-যুগের, সে-যুগের সাধারণ ধর্ম্ম ইহাই ছিল যে, লোকে বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপন করিত।

উক্ত শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, পুত্র পুত্র-বধু পৌত্র পৌত্রবধু ভ্রাতা ভ্রাতৃবধু প্রভৃতি নানা পরিবার লইয়া ভিড় করিয়া একগৃহে থাকাটা সে সময়ে আর্য্যদিগের রীতি ছিল না। ইহা সম্ভবতঃ শূদ্ররীতি; এবং সামাজিক অনুষ্ঠান ও আচারাদির পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ শূদ্র বা অনার্য্যরীতি আর্য্য-পরিবারে সংক্রান্ত হয়। কি কারণে ঐরূপ ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন দ্বিজগণ অধিকাংশ আচারভ্রষ্ট হইয়া গুরুগৃহে বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিল তখন তাহাদিগের সহিত পিতৃপরিবারের বিচ্ছেদ তত সহজ হইত না। হয় তো বা জীবনসংগ্রামের পীড়নে, অন্নবস্ত্রসংগ্রহের অক্ষমতাবশতঃ

অনেকে স্বতন্ত্র গৃহ করিয়া উপবাসী থাকা অপেক্ষা পিতৃগৃহে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিত। ধনী-পিতার পুত্র সহসা পিতার সংসারের ধনদৌলত ফেলিয়া নিজের এক দরিদ্র-সংসার পাতা সুবিধাজনক মনে করিত না। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন আর্য্যজাতির ভিতরে সনাতন ক্ষুদ্র পরিবারের স্থলে ক্রমে বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এ সমুদয় কারণ সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং এ সম্বন্ধে যে কোনো প্রমাণ আছে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

(২)

যাহা হউক, প্রাচীন আর্য্যপরিবারের গঠন-সম্বন্ধে যেমন আমরা একদিকে এই আদর্শ দেখিতে পাই, তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্রে আর-একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শও দেখিতে পাই। তাহা একটি বৃহৎ পরিবার; তাহাতে পিতা-পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্র একত্রে বাস করে, অবশ্য সপরিবারে। দায়গ্রহণবিষয়ক ত্রৈপুরুষিক সপিণ্ডতা পরিবারের এই আদর্শের পরিচয় দেয়। দায়বিভাগ-সম্বন্ধীয় বিধানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সেই বিভাগের অংশী কেবলমাত্র ভ্রাতৃগণ নহে, মৃত ভ্রাতার পুত্র, পৌত্র পর্য্যন্ত অংশ পায়। এই প্রথা হইতে ইঙ্গিতজ্ঞ বুঝিবেন যে, যে-কালে এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সে-কালে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত লইয়া এক-সংসার পাতা সম্ভব ছিল। তথাপি এই সমুদয় বিধান আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, এই বৃহৎ পরিবারের সম্মিলনের সূত্র পিতা মাতা; এবং পিতার মৃত্যুর

পর এইরূপ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ভ্রাতৃগণের স্বতন্ত্র পরিবার-প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক ছিল। তবে সংসৃষ্টি বা ভ্রাতৃগণের বা পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের একত্র বাস একেবারে ছিল না, এমন বলা যায় না।

এই বৃহৎ পরিবারে যে কেবলমাত্র পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র থাকিত তাহা নহে, অপরাপর ব্যক্তিও থাকিত; তাহারা দায়াধিকারী নহে কিন্তু ভরণাধিকারী। এই ভরণাধিকারীগণ যে পরিবারভুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা ও পরিচয়সম্বন্ধে স্মৃতিকারদিগের নানা মতভেদ আছে। এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, ভরণাধিকারীসম্বন্ধে এই মতভেদ দেশকালভেদে ভরণাধিকারীর সংখ্যাভেদের পরিচায়ক। সকল দেশে বা সকল কালেই একই কুটুম্ব বা আশ্রিত ব্যক্তি ভর্ত্তব্য ছিল এরূপ নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশ ও কালের সমাজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় দিতে গিয়াই যে এরূপ মতভেদে উপনীত হইয়াছেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

এই বৃহৎ পরিবার হিন্দুশাস্ত্রের সনাতন পরিবার নহে। ইহা বৈদিকযুগের পরবর্ত্তীযুগের সৃষ্টি। এই দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, উভয় আদর্শের প্রধান প্রভেদ ধন লইয়া। প্রাচীন পরিবার নির্ধন বা অল্পধন; অর্ব্বাচীন যৌথ-পরিবার ধনী। ইহা হইতে এ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ধনের তারতম্যের কারণেই এই আদর্শের তারতম্য; এবং পরবর্ত্তীকালে আর্য্যগণের ধনবৃদ্ধি, আর্য্য-পরিবারে এই পরিসর-

বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। অপরাপর কারণসম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান এত অল্প যে, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না।

ঔরসপুত্র ছাড়া আর একাদশবিধ পুত্রের পরিচয় আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হই। বৈদিক ও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ নানাবিধ পুত্রের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণও আমরা পাই। ইহারা পরিবারভুক্ত ছিল কিন্তু সকলযুগেই যে দ্বাদশবিধ পুত্র পরিবার-ভুক্ত ছিল এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। সকল স্মৃতিকার সকলপ্রকার পুত্রের উল্লেখ করেন নাই এবং মনুসংহিতাপ্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি ব্যতীত অতি প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দ্বাদশবিধ পুত্রের পরিচয় পাই না; আবার কোনও কোনও স্থলে পুত্র কাহার হইবে তাহা লইয়া মতভেদও দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্থলে ক্ষেত্রজ পুত্রের কথা বলা যাইতে পারে। মন্বাদির মতে ঐ পুত্র মাতার স্বামীর পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে; স্থলবিশেষে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা দ্বিপিতৃক হইতে পারে। কিন্তু আপস্তম্বের মতে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মদাতার পুত্র। এই সমুদয় মতভেদ এবং পরি-গণনা-ভেদের তাৎপর্য্য আমি ইহাই বুঝি যে, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকার আপন-আপন কালের সমাজে যে-যে সন্তান যাহার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। এবিষয়ে সমাজভেদে আচারভেদ ছিল। অপরের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন বহু সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ছিল না। কোথাও বা তাহার উদ্দেশ্য অপুত্র বিধবার পুত্রলাভ, কোথাও বা অপুত্রক পুরুষের পুত্রলাভ; এই উদ্দেশ্যভেদে সমাজব্যবস্থায় পিতৃত্বের প্রভেদ দেখা যায়। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন

সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

কন্যাগণ পরিবারের মধ্যে সাধারণতঃ পরিগণিত না হইলেও স্থলবিশেষে হইত। পুত্রের ন্যায় পুত্রিকা পিতার পরিবারভুক্ত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর কন্যাও অবস্থাবিশেষে পিতৃগৃহে বাস করিতেন। পতিকুল নির্ম্মনুষ্য হইলে বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতেন—শাস্ত্রে ইহার বিধান আছে। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার প্রশস্ত বিবাহ ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে কন্যা ভর্ত্তৃযুক্ত হইলে পিতৃকুলে তাহার বাস করা অসম্ভব ছিল না। স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার বিবাহেই গোত্রান্তর হয়; গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয় না। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ঠিক যে কোনও স্মৃতি বা শ্রুতির বচন আছে এরূপ বলা যায় না। তথাপি এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ গোত্রান্তর হওয়া একটি অদৃষ্ট ফল, ইহা অদৃষ্টার্থ কার্য্যব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না; শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-বিধির অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রাদিসংযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হয়; এবং ঐ বিবাহবিধি কেবল ব্রাহ্মাদি বিবাহেই প্রযুজ্য, নিন্দিত বিবাহে ঐ বিধির প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং রাক্ষসাদি বিবাহে গোত্রান্তর হইতে পারে না। সুতরাং এই সমুদয় বিবাহে কন্যার পিতৃগোত্রচ্ছেদ হয় না। এই ব্যবস্থার গোড়ার কথা তলাইয়া দেখিলে এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয় যে, এ প্রকার বিবাহে ভর্ত্তৃযুক্ত কন্যা অনেকস্থলে পিতৃকুলেই বাস করিত।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দৌহিত্রের মাতামহের পরিবারভুক্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া

স্বাভাবিক। এবং এইরূপ কোনও আচারের ফলেই বোধ হয় কন্যা ও দৌহিত্রের দায়াধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কন্যা ও দৌহিত্রের দায়াধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। সামাজিক অবস্থার পীড়নে কন্যা পিতৃকুলে ও দৌহিত্র মাতুলগৃহে কিরূপ অচল হইতে পারে তাহার পরিচয় বঙ্গের কুলীন সমাজে। মেলবন্ধনাদি কারণবশতঃ বিবাহযোগ্য পুরুষের অসদ্ভাবই বঙ্গদেশে এইরূপ পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাববশতঃ দক্ষিণাপথে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্য প্রকার আচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। নম্বুদ্রিগণ যে আর্য্য ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদিগের স্বীকৃত অনার্য্য আচার এবং অদ্ভুত পরিবার-গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অবস্থা-হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে দেশভেদে ও কালভেদে পরিবারের আয়তন কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত হইয়াছে। সকল দেশে সকল সময়ে একই শ্রেণীর ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না। যাহাদিগকে আমরা যৌথ-পরিবারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করি তাহারা যে সকল সময় পরিবারভুক্ত ছিল এরূপ নহে। এবং পূর্ব্বপক্ষগণ যাহাদিগকে পরিবারভুক্ত বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন না তাহারা পূর্ব্বে কোনও কোনও সমাজে পরিবারভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইত।

(৩)

পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরস্পর-সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমরা আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব যে, পরিবারের ব্যক্তিবর্গের

পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকারসম্বন্ধে দেশকালভেদে কত গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে দেখিতে পাই যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাসের উপর গৃহপতির সমান অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব! দান আধান ও বিক্রয় যে পুত্র সম্বন্ধে ঘটিতে পারে তাহার পরিচয় স্মৃতিবাক্যেই পাই। বৈদিক উপাখ্যানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নচিকেতা পিতাকর্ত্তৃক বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিলেন; শুনঃশেফকে তাহার পিতা যজ্ঞে বলির জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীকে অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন; হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। যজ্ঞাদি বিধানেও এই ধারণা সুস্পষ্ট। মন্ত্র বলিতেছেন, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্ব্ব“স্ব” দান করিবে, ভার্য্যা ও পুত্র দান করিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় পত্নী ও পুত্র “স্ব” বা সম্পত্তির ভিতর গণ্য হইলেও এই বিশেষ বাক্যের দ্বারা তাহার দান প্রতিষেধ হইয়াছে। অবশ্য শবরস্বামীপ্রভৃতি মীমাংসকেরা এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্ত্রীপুত্রকে যে দান করা যায় এই ধারণাই যে এই মন্ত্রের মূলে আছে ঐতিহাসিক তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং পিতার, এবং গৌতমাদির বচন-মতে মাতারও যে, পুত্রকে দানাধান বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল এবং স্বামীর যে স্ত্রীকে ঘোড়া গোরুর মত বেচিবার অধিকার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনঃশেফের উপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় যে, পুত্রকে বধ করিবার অধিকারও পিতার ছিল, এবং সে অধিকার ক্রেতা পাইতে পারিত; —শারীরিক দণ্ডাদি সম্বন্ধে তো কোনও কথাই নাই।

ভার্য্যা-পুত্রাদির যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে তাহাদের যে, গৃহপতির অর্থে কোনও অধিকার ছিল না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অপর পক্ষে পুত্র বা পত্নী যদি কোনও ধন স্বয়ং উপার্জ্জন করিত তাহাও গৃহপতির নিজস্ব হইত। ইহার পরিচয় পরবর্ত্তী স্মৃতিকার-ধৃত অতি-প্রাচীন কয়েকটি বচনে পাই; তাহা হইতে ভার্য্যা পুত্র ও দাস যে সমভাবে গৃহপতির-অধিকৃত বা স্বোপার্জ্জিত ধনে অধিকার-বিহীন তাহা প্রমাণ হয়। পুত্র বা স্ত্রীর ধনাধিকার পরবর্ত্তী স্মৃতিতে ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণ, গৃহস্বামী জীবিত থাকিতেও ভিন্ন ভিন্নরূপ ধনে পুত্র ও পত্নীর অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়ন, বৃহস্পতিপ্রভৃতি পরবর্ত্তী স্মৃতিতে এই সমুদয় স্ত্রীধন ও পুত্রের স্বতন্ত্র ধনের পরিগণনা দেখিতে পাই। ইহাদিগের এই অধিকার একদিনে বা একস্থানে স্বীকৃত হয় নাই;—যুগযুগান্তের অবস্থানুরূপ-ব্যবস্থার চেষ্টার ফলে এই অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছিল।

কালক্রমে কিরূপ ভাবে একটির পর একটি এই সমুদয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, সামাজিক কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ফলে এই সব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমি এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের মোটামুটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

শরীরসম্বন্ধে গৃহপতির অধিকার ক্রমশঃ অনেক খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল দেখিতে পাই। পুত্রকে দত্তক-স্বরূপে দান করিবার অধিকার সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইলেও তাহাকে বা পত্নীকে সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ দান-বিনিয়োগ

মীমাংসক এবং নিবন্ধকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই অভিমতের সপক্ষে স্মৃতি-প্রমাণের অভাব নাই। পুত্রকে বধ করা দূরে থাকুক, তাহাকে যথেচ্ছ শাস্তি দিবার অধিকারও স্মৃতিতে স্বীকৃত হয় নাই। অপরাধ করিলে পুত্র বা শিষ্যকে কিরূপে তাড়ন করিতে হইবে এবং কি প্রকার বেত্রদ্বারা কোথায় আঘাত করিতে পারিবে তাহা স্মৃতিতে উক্ত আছে। তদতিরিক্ত শাস্তি দিবার ক্ষমতা কেবল রাজারই ছিল।

স্বোপার্জ্জিত অর্থে পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, স্মৃতিতে ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমে দেখিতে পাই কেবলমাত্র শৌর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জিত ধনের স্বত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য "পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতং" বলিয়া এক সাধারণ সূত্রে সকলপ্রকার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া নিবন্ধকারদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে; সে সমস্ত মতভেদ তাঁহাদিগের সমসাময়িক ও স্বদেশস্থ সমাজের ব্যবস্থা-ভেদমূলক। বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিকে খর্ব্ব করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন এবং পৈতৃক অর্থ বা উপাদানের সামান্যমাত্র সাহায্যে যাহা-কিছু অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা স্বোপার্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এমন কি মৈত্র্য এবং ঔদ্বাহিক সম্পত্তিসম্বন্ধেও তিনি পিতৃদ্রব্যের বিরোধ সম্ভাবনা দেখিয়াছেন। মিতাক্ষরা-কার একদিকে যেমন পুত্রের স্বোপার্জ্জন ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছেন অপর দিকে তাহার পারিবারিক সম্পত্তিতে অতিরিক্ত অধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

পিতার সম্পত্তি পরম্পরাগতই হউক, আর স্বোপার্জ্জিতই হউক,

অতি প্রাচীনকালে, তাহাতে যে পুত্রদিগের কোনও স্বত্ব ছিল না তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তার পরবর্ত্তী কালে পারিবারিক সম্পত্তিতে পুত্রাদির অধিকারসম্বন্ধে স্মৃতিগ্রন্থে নানাজাতীয় বাক্য দেখা যায়, সেগুলিকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা —

প্রথম স্তর—পারিবারিক সম্পত্তিতে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু দায়-বিভাগে পিতা পুত্রদিগের মধ্যে অসমান বিভাগ করিতে অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয় স্তর—পারিবারিক পরম্পরাগত সম্পত্তির মধ্যে কয়েক প্রকার সম্পত্তিতে পিতা পুত্রদিগের সম্মতি ব্যতীত দানবিক্রয়ের অধিকারী নহেন ; তবে সম্পত্তিতে অধিকার পিতারই।

তৃতীয় স্তর—পরম্পরাগত স্থাবরাদি সম্পত্তিতে পিতার একার স্বামিত্ব নহে, তাহাতে পিতা ও পুত্রের সমান স্বামিত্ব। স্বামিত্ব সমান হইলেই অধিকার সমান হয় না, পরিবার যতদিন পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তির ব্যবহারসম্বন্ধে পিতার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ।

চতুর্থ স্তর—তৃতীয় স্তরের আনুষঙ্গিক ; ইহাতে পুত্রের বিভাগাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোনও বাক্যে বিভাগাধিকার পিতার ইচ্ছায় হইতে পারে বলিয়া উল্লিখিত, কোথাওবা পিতার অনিচ্ছায়ও অবস্থাবিশেষে বিভাগ হইতে পারে, এরূপ স্বীকৃত।

সুতরাং প্রাচীন হিন্দুপরিবারের সম্পত্তিতে পুত্রপৌত্রাদির অধিকার নানাযুগে নানাবিধ ছিল এরূপ অনুমান করা সঙ্গত। একযুগে দেখিতে পাই পুত্রের কোনই অধিকার নাই ; আর এক সময়ে দেখিতে পাই পুত্র পিতার সহিত সমান স্বামী বলিয়া স্বীকৃত

হইয়াছে। বিধিসমূহের এই ভেদ, দেশভেদ ও কালভেদে, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও আদর্শের ভেদ-অনুসারেই যে হইয়াছিল সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে-কালে সম্পত্তি যৎসামান্য, এবং পুত্র পিতার গৃহে কেবল বিবাহকাল পর্য্যন্ত বাস করিত, সে-কালে, সমাজে সনাতন পৈতৃক-অধিকার অব্যাহত ছিল; এবং যে-কালে পরিবারের ক্রমাগত-সম্পত্তির পরিমাণ অধিক ছিল এবং পুত্রপৌত্রাদি এক-পরিবারভুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল সে-কালে পিতাকর্ত্তৃক পরম্পরাগত সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার সঙ্কুচিত করিয়া পুত্রদিগের ন্যায্য অধিকার নানা-রূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পিতার সহিত পুত্রগণের সমান স্বমিত্ব এবং পিতার অনিচ্ছায় বিকৃতচেতা বা অতিবৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার পুত্রের অধিকার দান, এই চেষ্টার শেষ সীমা।

ব্যবহারশাস্ত্রে আমরা পারিবারিক আদর্শ ও গঠনভেদের যে পরিচয় পাই স্মৃতিসাহিত্যে তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ নিজনিজ সমাজের অবস্থা-অনুসারে শ্রুতিস্মৃতির বিধান ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ব্যবস্থার ভেদ করিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার পুত্রদিগকে পারিবারিক সম্পত্তিতে পিতার সহিত সমান স্বাম্য দান করিয়াছেন এবং কোনও কোনও অবস্থায় পিতার অনিচ্ছায়ও সম্পত্তি-বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপরপক্ষে জীমূতবাহন পিতার সম্পূর্ণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। এ প্রভেদ সকলের সুপরিচিত। কিন্তু কেবল মিতাক্ষরা দায়-ভাগে যে এই প্রভেদ তাহা নহে। উভয় গ্রন্থেই আমরা

বিশ্বরূপ, ধারেশ্বরাদি বহু পূর্ব্বাচার্য্যের পরিচয় পাই এবং এই প্রভেদ যে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া গৌণ-নিবন্ধাদিতেও ছোটখাট বিষয়ে পিতাপুত্রের অধিকারসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী-বিলাস, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও ব্যবহারময়ূখ এ বিষয়ে মিতাক্ষরার সহিত সম্পূর্ণ একমত নহে।

(৪)

পরিবারের ভিতর নারীর অধিকারসম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিতে যে ব্যবস্থার তারতম্য দেখা যায় তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবস্থায় স্ত্রী অধন, নিরিন্দ্রিয় ও অদায়াদ। অর্থাৎ স্ত্রী কোনও সম্পত্তি স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারে না, এবং কোনও মতে দায় গ্রহণ করিতে পারে না। স্মৃতিসাহিত্যে দেখিতে পাই, ক্রমে স্ত্রীর ধনার্জ্জনের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে; কয়েকপ্রকার বিশিষ্ট ধনসম্বন্ধে স্ত্রীর অর্জ্জনক্ষমতা স্বীকার করিয়া সেগুলিকে স্ত্রীধন বলা হইয়াছে। স্ত্রীধনের পরিগণনা হইতে দেখিতে পাই যে, রিক্থ, ক্রয়, সংবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ উপায়ে স্ত্রীর কোনওরূপ ধনাধিকার প্রথমে ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে স্ত্রীর দায়াধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; তাহা লইয়াও নানারূপ মতভেদ। পত্নী কন্যা প্রভৃতির দায়াধিকার এবং তাহাদিগের সম্পত্তির উপর তাহাদিগের স্বতন্ত্র অধিকারসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। স্মৃতিকারদিগের পরবর্ত্তী টীকা ও নিবন্ধকারগণ দেশ কাল ও সামাজিক অবস্থাভেদে এ-সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিতাক্ষরাকার

নারীর দানাধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং যে-প্রকারেই নারী সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকুক তাহা স্ত্রীধন হইবে এবং তাহাতে তাহার সমান অধিকার হইবে, - বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাকারগণ স্ত্রীলোকের সমুদয় সম্পত্তিতে দানবিক্রয়ের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। জীমূতবাহন স্ত্রীলোকের দায়াধিকার এবং অপরাপর উপায়ে লব্ধ ধনে অধিকার স্বীকার করিয়া বিভিন্ন প্রকার ধনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাওবা তাহার যথেষ্ট বিনিয়োগের অধিকার আছে, কোথাওবা তাহা নাই। ব্যবহারময়ূখে এবং সংস্কারকৌস্তুভে স্ত্রীগণের অধিকার আরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমুদয় গ্রন্থে কেবল যে স্ত্রী দায়াদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে, মিতাক্ষরাকার বিনিয়োগাদিতে পিতা স্বামী প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রক্ষাকর্ত্তাদিগের যে নিষেধাধিকারের ইঙ্গিত করিয়াছেন কমলাকরভট্ট তাহাও প্রায় উড়াইয়া দিয়াছেন। অপরপক্ষে স্মৃতিচন্দ্রিকায় স্ত্রীলোকের অধিকার অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। স্ত্রীজাতির এই প্রকার অধিকারভেদ বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন যুগে স্ত্রীজাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই প্রকার অন্যান্য কুটুম্বের দায়াধিকার ও ভরণাধিকারসম্বন্ধে অসংখ্য তারতম্য দেখা যায়। সে সমুদয় তারতম্য দেশকালভেদে পরিবারের গঠন ও আদর্শ-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। একটি দৃষ্টান্ত দত্তকপুত্র। দত্তকের দায়াধিকার এক্ষণে সকল দেশে সমানভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সকল স্মৃতিকারদিগের বচনে ঐক্য নাই। কোনও কোনও স্মৃতিকার দত্তককে মুখ্য দায়াধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাকে অপরাপর জাতীয় পুত্রের পর বসাইয়া-

ছেন, আবার কেহবা তাহাকে অদায়াদ বান্ধবের দলে ফেলিয়াছেন। দত্তকগ্রহণানন্তর পুত্র হইলে দত্তকের স্থান এবং অসিদ্ধ-দত্তকের অধিকারসম্বন্ধেও গোলোযোগ আছে। কোনও কোনও স্থলে দত্তক আংশিক উত্তরাধিকারী, কোথাও বা ভরণাধিকারী, কোথাও বা দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এবং অতীত যুগের ব্যবহার-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গৌণপুত্রগণের মধ্যে দত্তকের স্থান পাইতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগতিকে পরিবারের আদর্শ বা গঠনসম্বন্ধে যে সমুদয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র গৌণ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অত্যন্ত মৌলিক বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থার ভেদ ঘটিয়াছে। কি কি কারণে কোন্ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সামাজিক অবস্থা-ভেদ, ধর্ম্ম ও নীতিগত তারতম্য, অর্থশাস্ত্রীয় সম্পর্কভেদ, অন্যান্য জাতি ও অন্যান্য সমাজের সংঘর্ষ, নরনারী সংখ্যার তারতম্যপ্রভৃতি বিবিধ কারণে দেশকালভেদে হিন্দুপরিবার ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া নানারূপ হইয়াছে। আজ আবার রেল-টেলিগ্রাফের দিনে, সহরের বৃদ্ধির দিনে, নূতন নূতন ধনাগমোপায়ের দিনে, নানাবিধ নৈতিক রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাভেদে সমাজে পরিবারের এক নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা পুরাতন হইতে ভিন্ন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সেই পুরাতনও সনাতন নহে বা তদপেক্ষা অধিক পুরাতন পারিবারিক আদর্শ হইতে অভিন্ন নহে। এ পরিবর্ত্তন ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে সে বিচার আমি করিতে চাই না। ইহার যে একটা

মন্দ দিক আছে তাহাও আমি অস্বীকার করিতে চাই না, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন যে স্বাভাবিক, এবং হিন্দুসমাজের পক্ষে পরিবর্ত্তন যে একটি অপূর্ব্ব ভয়াবহ পদার্থ নয়, ইহা প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকিলেই আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, যুগে যুগে অবস্থাভেদানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াই হিন্দুসমাজ তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

হাসি

এদেশে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার অনুযায়ী দর্শন নাই। এমন কি সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে আমরা পারদ-দর্শনেরও পরিচয় পাই—অথচ উক্ত জড়-পদার্থের সহিত, কি ঔজ্জ্বল্যে, কি চাঞ্চল্যে, যে ভাব-পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ—সেই হাসির দর্শন আমরা ভারতবর্ষে পাই না।

ভারতমাতার মুখে আজ হাসি নাই—পূর্ব্বে ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

আমাদের এ দেশ দার্শনিক দেশ। এবং চিরকালই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে হাস্যরস অপেয়, অদেয় এবং অগ্রাহ্য। যে দেশের মাথার উপর বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-আদি ড্যামোক্লিসের তরবারির ন্যায় অষ্টপ্রহর ঝুলিতেছে—যে দেশের দর্শনপুরাণে বলে ঐহিক সুখের কোনরূপ মূল্য নাই, কারণ সুখ দুঃখানুবিদ্ধ, এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ; যে দেশের সামান্য কৃষকেরাও মায়া-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যান করে—সে দেশে হাসির ফুটিয়া উঠিবার অবসর কোথায়? হাসির মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিলে এদেশের লোকে গাম্ভীর্য্যের শিলমোহর-মারা মুখকে জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিত না, ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রবীনতায় পক্ককেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিত না, এবং নিরপরাধী বালকবালিকাদিগকে "যত হাসি তত কান্নার" কাল্পনিক বিভীষিকা দেখাইত না। যৌবনসুলভ ক্রীড়াকৌতুককে চপলতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করা এদেশে বুদ্ধিমান লোকে একটি নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে

গণ্য করেন। ইঁহারা যখন অতি গম্ভীরভাবে বলেন যে "শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ না"—তখন ইচ্ছা হয় এই উত্তর দিই যে, তোমার বিজ্ঞতার শিং লইয়া তুমি বসিয়া থাক—পরের উদরে সেটি প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টাটা না করিলেই ভাল হয়, কেননা তাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

এতদ্ব্যতীত আর-একটি কারণে অনেকে হাসির চর্চ্চা করিতে অনিচ্ছুক। ইঁহাদের বিশ্বাস হাসি পদার্থটি বিদেশী—অতএব এই স্বদেশীয়তার দিনে তাহা বয়কট করাতে জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া হয়।

হাসি জিনিষটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় না হইলেও এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, অদ্যাবধি পাশ্চাত্য দেশবাসীরাই একাগ্র মনে তাহার চর্চ্চা করিয়াছে। আরিষ্টফেনিসের বক্ত্রে উৎসারিত হাস্যের নির্ঝর উত্তরোত্তর স্ফীত হইয়া বর্ত্তমানে ইউরোপে উত্তালতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা হাস্যরসে প্রাণবন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিন ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হাসি অন্তর্ধান হইবে—সেদিন ইউরোপীয় সভ্যতাও হিন্দু সভ্যতার ন্যায় ঝুনো হইয়া যাইবে।

ইউরোপে হাসি আছে বলিয়া হাস্যের দর্শনবিজ্ঞানও আছে। দর্শন, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নির্ণয় করিতে চাহে, তাই দার্শনিক সমাজে নানা মুনির নানা মত—কেননা এ বিশ্বের আদি ও অন্তের সঠিক খবর কেহই জানেন না। অপর পক্ষে বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি ও Law-এর কারণ নির্ণয় করিতে চাহে—তাই এ ক্ষেত্রে সকলেই একমত। এই কারণে

হাস্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এ বিষয়ে দার্শনিক মতের বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক মতে হাস্য জীবজগতে ক্রমবিকশিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনুষ্যেতর প্রাণী ছিলেন। তাঁহারা কোনও আহার্য্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইবামাত্র, ভোজন করিবার পূর্ব্বেই ভোজনক্রিয়ার অভিনয় করিতেন যথা, মুখব্যাদান দন্তবিকাশ ইত্যাদি। তাঁহাদের বংশধরেরা কালক্রমে যখন ইভলিউ-সানের উন্নত স্তরে আরোহণ করিল—তখন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভোজনানন্দের ভঙ্গীগুলি অন্যান্যরূপ আনন্দের সহিত জড়িত হইয়া গেল। মূল কারণ হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সকল পশুভাবগুলি মানব-সংস্কারে পরিণত হইল। অর্থাৎ যে চাঞ্চল্যের উৎপত্তি উদরে, তাহা হৃদয়ে স্থিতি লাভ করিয়া হাস্যরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। এককথায় বীভৎসরস হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ এই কারণে অদ্যাবধি অনেকে রসিকতা করিতে হইলে বীভৎস-রসের অবতারণা করেন।

পূর্ব্বোক্ত মত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। সুতরাং ইহা চূড়ান্ত মত নহে। বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। এই কারণে জড়বিজ্ঞান ক্রমে পরমাণু-বিজ্ঞানে পরিণত হয়, এবং জীবতত্ত্ব জীবাণুতত্ত্বে উপস্থিত হয়—Biology Bacteriologyতে পরিণত হয়। যতক্ষণ প্রটো-প্লাজমের মুখে হাসি না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ হাস্যবিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যে হাস্যের যে সূক্ষ্মশরীর

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি ও পরিচয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

হাসির বীজাণু শুভ্রবর্ণ এবং প্রেম ও ক্রোধের বীজাণু অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র এবং অতিশয় দ্রুতগামী। ইহাদের জন্মভূমি হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে ফুস্‌ফুসে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয় এবং আলোকের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে গমন করে। এই জীবাণু অতিশয় সংক্রামক। এই জীবাণু মিথ্যার জীবাণুর জাতশত্রু, এবং শেষোক্ত জীবাণুর সাক্ষাৎ পাইলেই ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করে ও অবলীলাক্রমে পরাভূত করে। এই জীবাণু দধির জীবাণুর ন্যায় স্বাস্থ্যকর, এবং যাহার ধমনীতে ইহারা অবস্থিতি করে তাহার আর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হয় না। হাস্যের বীজাণু মরিয়া ভূত হইলে তাহা বিষাদের বীজাণুতে পরিণত হয়। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সাধ্যের অতীত। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি যে হাস্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তাদের আর যে জ্ঞানই থাকুক না কেন, হাস্যরসের জ্ঞান নাই, নচেৎ তাঁহারা একটি প্রত্যক্ষ কার্য্যের উপর এত অপ্রত্যক্ষ কারণের ভার চাপাইতেন না।

আসল কথা, হাস্য কোনরূপ দর্শন কিম্বা বিজ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়ে না। কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা আবিষ্কার কিম্বা উদ্ভাবনা করাই উক্ত উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হাসি কিন্তু স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল। সকল প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই হাসি জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বাধীনতাই তাহার লক্ষণ ও ধর্ম্ম। হাসির যদি কোনরূপ বাহ্য কারণ থাকে,

তাহা হইলে কোনও বস্তুর আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ই সেই কারণ। উদাহরণস্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, যদি কোনও স্থূলকায় ব্যক্তি পিচ্ছিলপথে অগ্রসর হইতে গিয়া সহসা পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া সশব্দে ভূপতিত হন, তাহা হইলে অদার্শনিক দর্শকের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইহার একমাত্র কারণ স্থূলদেহের ঐরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে, তাহার যে একটা পরিচিত গাম্ভীর্য্য আছে তাহা একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হাস্যরসের যে-কোন উদাহরণ দাও না, তাহা এই একই মূলসূত্র অনুসরণ করে। অপর পক্ষে পৃথিবীতে যাহা-কিছু নিজের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হাসি একমুহূর্ত্তেই তাহাকে ভূতলশায়ী করিতে পারে। চার্ব্বাকের হাসি, যুগসঞ্চিত বিধিনিষেধের স্তূপ, অবলীলাক্রমে ধূলিসাৎ করিয়াছিল। এই কারণেই হাস্যের সহিত দর্শনের চিরদিনই দা-কুমড়ার সম্বন্ধ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা বৃথা। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—হাস্য করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।

সনাতন মত যাহাই হউক, মানুষের পক্ষে হাসা যে কর্ত্তব্য তাহার প্রথম কারণ এই যে, জীবজগতে একমাত্র মানুষই এই ক্রিয়ার অধিকারী। পশুপক্ষী ক্রন্দন করিতে পারে, কিন্তু হাসিতে পারে না। সুতরাং হাস্যচর্চ্চা করার অর্থ—মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করা। এ স্থলে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার বিপরীত কার্য্য করা,—সংক্ষেপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি দমন করাই মানবের পক্ষে শ্রেয়ঃ অতএব কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে বলা

যাইতে পারে যে, মানুষ যখন কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মিয়াছে তখন তাহার হাসিতে হাসিতে মরাই কর্ত্তব্য।

আর-একটি কারণেও মানুষের হাস্য করা কর্ত্তব্য। জগতে যাহা-কিছু সুন্দর তাহাই হাসে। আকাশে চন্দ্র তারকা হাসিতেছে, সমুদ্র-বক্ষে ফেনপুঞ্জ হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে ফুলের দেহ গাছের উপর হেলিয়া পড়িতেছে, নদীর গালে টোল-খাইতেছে। কালিদাস বলিয়াছেন যে, হিমালয়-শিখরশায়ী তুষাররাশি ত্র্যম্বকের অট্টহাস্য। আধুনিক কবিদিগের মতে কেবল তুষার নয়, সমগ্র সৌরজগৎ সৃষ্টিকর্ত্তার হাসি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবিতে কবিতে যাহা-কিছু মতভেদ তাহা এই লইয়া যে, সে হাসি বিদ্রূপের কি আনন্দের। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, হাসিতেছে বলিয়াই জ্যোৎস্না, ফুলইত্যাদি সুন্দর। হাসির সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ হাসিলে যে তাহাকে সুন্দর দেখায় শুধু তাহাই নহে, তাহার মনের ময়লাও কাটিয়া যায়। সাহিত্য-দর্পণকার বহুপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হাসি পদার্থটি শুভ্র, সুতরাং তাহার অন্ধকার বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং নির্ভয়ে অপরকে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে, "যে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চায় সে থাকুক, কিন্তু তুমি নিজের আলোতে নিজে খেলা কর।" চির-অন্ধকার ত একদিন সকলকেই গ্রাস করিবে--তাই বলিয়া ইতিমধ্যে তুব্‌ড়ির ফুল কেন কাটিবে না?

অতএব যখন স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্য করা কর্ত্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং যেহেতু শাস্ত্র ব্যতীত জনসমাজকে শিক্ষা

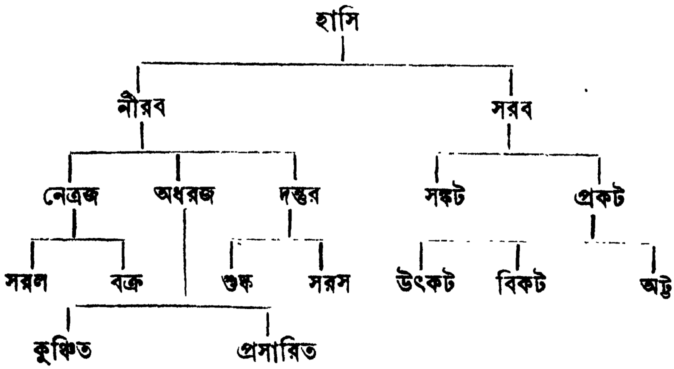
দিবার অপর-কোনও উপায় নাই, সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্য-শাস্ত্র রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হাসিসম্বন্ধে কোনরূপ দর্শন বিজ্ঞান রচিত হইতে পারে না—কারণ হাস্য করা একটা আর্ট। এই আর্ট কিরূপে চর্চ্চাদ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদেরা, অর্থাৎ যাঁহারা শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোনও বিশেষ ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে সেই ভাবও মনের ভিতর জন্মগ্রহণ করে। যদি কেহ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তারস্বরে কাহারও উপর কটুকথা বর্ষণ করেন—তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইবে; অপর পক্ষে যদি চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া গদ্‌গদস্বরে কাহারও নিকট প্রিয়কথা বলা যায়, তাহা হইলে মনে প্রেমের-বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধ্য। সুতরাং হাস্যোচিত মুখভঙ্গীগুলি কস্ত করিতে পারিলে তোমার মনে হাস্যরসের উৎস খুলিয়া যাইবে। অবশ্য একদিনে এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। দিনের পর দিন এই ভঙ্গীগুলি অভ্যাস করিতে হইবে, দস্তুরমত কসরৎ করিতে হইবে। থিয়েটারে কমিক-পার্টের অভিনেতাগণ যেরূপ রিহার্শলের পর রিহার্শল দিয়া মুখের হাসিটি বেমালুম স্বাভাবিক করিয়া তোলেন—তোমাদিগকেও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সংসার-রঙ্গভূমিতে আমরা সকলেই "কমিক একটার"—এই সত্যটি স্মরণ রাখিলে তোমাদের পক্ষে হাস্যের বাহ্য লক্ষণগুলি শিক্ষা করা তত কঠিন হইবে না।

হাসির আর্ট একবার শিক্ষা করিতে পারিলে, সমাজে তাহা অনায়াসে প্রচার করিতে পারিবে। তুমি ভালবাসিলে যে অপরকে ভালবাসাইতে পারিবে, এমন কোনও কথা নাই—কিন্তু তুমি হাসিতে পারিলে অপরকে হাসাইতে পারিবে; কেননা হাসি সংক্রামক—প্রেম নয়।

শিক্ষার্থীদিগের সাহায্যার্থে হাসির বাহ্য লক্ষণগুলি নির্ণয় করা আবশ্যক। হাসি নানাজাতীয়, এবং বিভিন্ন জাতির হাস্যের আবির্ভাবের স্থানও স্বতন্ত্র। সুতরাং আমি উপসংহারে সংক্ষেপে হাসির জাতিভেদের পরিচয় নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দিতেছি।



অর্থাৎ হাসি প্রধানতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত—দৃশ্য ও শ্রাব্য। ইহার প্রথমটি স্ত্রীজাতির অধিকারভুক্ত—দ্বিতীয়টি পুরুষের। ধর্ম্মের ন্যায় হাসিও অধিকার-অনুসারেই চর্চ্চা করা উচিত। তবে দৃশ্যহাস্যের দন্তুর শাখায় পুরুষেরও অধিকার আছে—এবং কোন-কোনও অবস্থায় স্ত্রীজাতিকেও বাধ্য হইয়া গুরুজনের সম্মুখে শ্রাব্যহাস্যের অন্তর্ভূত সঙ্কট হাসিরও অনধিকার চর্চ্চা করিতে হয়। যে হাসি শত চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ চাপা যায় না, এবং যাহা ইচ্ছা ও চেষ্টার বিরুদ্ধে ফিক্‌ফিক্‌

ধ্বনিসহকারে গৃহশত্রুর ন্যায় বহির্গত হইয়া পড়ে,—সেই হাসির নাম সঙ্কট—কারণ উভয়সঙ্কট স্থলেই এই অবাধ্য হাসি জন্মলাভ করে। এক সরলজাতীয় ব্যতীত উপরোক্ত সকলপ্রকার হাসিই যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা শিক্ষা করা যায়।

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ সরল নেত্রজ হাসি—চোখের উপরই ভাসিতে থাকে। এ অনির্ব্বচনীয় হাসির সাক্ষাৎকার লাভ করাই মহা সৌভাগ্যের কথা। এ হাসি অনুকরণ করিবার নয়—অনুসরণ করিবার বস্তু।

পূর্ব্বোল্লিখিত সকল প্রকার হাসি সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং জীবনে যদি হাসির চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কেননা ভারত-উদ্ধারের অপর কোনও উপায় নাই। চোখের জলে চোখ ফোটে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

নারীর পত্র

(বীরবলের মারফৎ প্রাপ্ত)

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধের বিষয় মতামত প্রকাশ করা যে নিতান্ত হাস্যকর জিনিষ তা আমি বিলক্ষণ জানি, অথচ আমি যে সেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ, যখন অনেক গণ্যমান্য লোক এই যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে কথায় ও কাজে নিজেদের উপহাসাস্পদ করতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, তখন নগণ্য আমরাই বা পিছ্পাও হব কেন ?

এ কথা শুনে হয় ত তোমরা বল্‌বে, পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে তা নয়, অতএব পুরুষের অনুকরণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। পুরুষালি-মেয়ে যে একটি অদ্ভুত জীব এ কথা আমরা মানি, কিন্তু মেয়েলি-পুরুষ যে তার চাইতেও বেশি অদ্ভুত জীব একথা যে তোমরা মানো না তার প্রমাণ তোমাদের কথায় ও কাজে নিত্য পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, যুদ্ধসম্বন্ধে যে এদেশে স্ত্রীপুরুষের কোনও অধিকারভেদ নেই সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। যুদ্ধ তোমরাও কর না, আমরাও করি নে। পল্টন তোমরাও দেখেছ, আমরাও দেখেছি কিন্তু যুদ্ধ তোমরাও দেখ নি, আমরাও দেখি নি। এ বিষয়ে যা-কিছু জ্ঞান তোমরাও যেখান থেকে সংগ্রহ করেছ, আমরাও সেইখান থেকেই করেছি—অর্থাৎ ইতিহাস-নামক কেতাব থেকে।

তবে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে রামায়ণ মহাভারত আর তোমাদের ইংরাজি ও ফরাসি। ভাষা আলাদা হলেও দুইই শোনা কথা এবং সমান বিশ্বাস্য। লড়াই অবশ্য তোমরা 'কর, কিন্তু সে ঘরের ভিতর ও আমাদের সঙ্গে, এবং তাতেও জিৎ বরাবর তোমাদেরই হয় তা নয়। বরং সত্যকথা বল্‌তে হলে, বাল্য-বিবাহের দৌলতে, বালিকা-বিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেঁট করেই থাক্‌তে হয়। সুতরাং ইউরোপের এই চতুরঙ্গ খেলা সম্বন্ধে তোমরা যদি উপর-চাল দিতে পার, তবে আমরা যে কেন পারব না তা বোঝা শক্ত।

কিন্তু ভয় নেই, আমি এ পত্রে কোনরূপ অধিকার-বহির্ভূত কাজ কর্‌তে যাচ্চিনে—অর্থাৎ তোমাদের মত কোন উপর-চাল দেব না, কেননা কেউ তা নেবে না।

আমাদের মতের যে কোন মূল্য নেই তা আমরা অস্বীকার করিনে, অপরপক্ষে আমাদের অমত যে মহামূল্য, তাও তোমরা অস্বীকার কর্‌তে পার না। আমরা তোমাদের মতে চলি, তোমরা আমাদের অমতে চল না। আমাদের "না"র কাছে তোমাদের "হাঁ" নিত্য বাধা পায়। আসল কথা, এই অমতের বলে আমরা তোমাদের চালমাৎ করে রেখেছি।

এক্ষেত্রেও তাই আমি এই যুদ্ধসম্বন্ধে আমার মত নয়, অমত প্রকাশ কর্‌তে সাহসী হচ্ছি—কেননা "যুদ্ধ কর"—এ কথা যদি পুরুষে জোর করে' বলতে পারে তাহলে "যুদ্ধ কর'না"এ কথা জোর করে বলতে স্ত্রীলোকে কেন না পারবে? আমরা কাপুরুষ না হলেও না-পুরুষ ত বটেই।

যুদ্ধ যে কস্মিনকালে কোনও দেশে স্ত্রীলোকের অভিপ্রেত হতে পারে না এ বিষয়ে বেশি কথা বলা বৃথা। যুদ্ধ জিনিষটি চোখে না দেখলেও ব্যাপারখানা যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্গভাষার মহাকাব্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পড়া যায় আসল ঘটনা অবশ্য তার অনুরূপ নয়। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মিলে আজ যে খেলা খেল্‌ছে সে আর যাই হোক ছেলেখেলা নয়। সূর্য্যগ্রহণ ভূমিকম্প, ঝড়জল অগ্ন্যুৎপাতের একত্র আবির্ভাবে পৃথিবীর যে রকম অবস্থা হয়—এই যুদ্ধে ইউরোপের তদ্রূপ অবস্থা হয়েছে। এই মহাপ্রলয়গ্রস্ত কোটি কোটি নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রনার ও প্রাণভয়ের আর্ত্তনাদ আমাদের কানে অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পৌঁছয়;—সম্ভবতঃ তা তোমাদের শ্রুতিগোচরই হয় না। অপর কোন কারণ না থাকলেও এই এক কারণে মানুষের হাতে-গড়া এই মহামারী-ব্যাপার আমাদের কাছে চিরকালের জন্য হেয় হয়ে থাকত। মায়ের জাত এমন করে লোক-কাঁদাবার কখনই পক্ষপাতী হতে পারে না। আমরা নবজীবনের সৃষ্টি করি, সুতরাং সেই জীবন রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম এবং তার ধ্বংস করা মহা পাপ। তারপর, এই মহাপাপের সৃষ্টি করে পুরুষে, আর তার পুরো শাস্তি ভোগ করি আমরা। অতএব যুদ্ধব্যাপারটি আমাদের কি প্রকৃতি, কি স্বার্থ, উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

তোমরা হয় ত বলবে যে, যুদ্ধের প্রতি স্ত্রীজাতির এই সহজ বিদ্বেষের মূলে কোনওরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সেই কারণে পুরুষে যুদ্ধসম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তে বাধ্য। পৃথিবীর বড় বড় জিনিষের ঔচিত্যানুচিত্য কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে

যাচাই করে নেওয়া যায় না। এসব ঘটনার সার্থকতা বোঝবার জন্য বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই।

বিদ্যা যে আমাদের নেই—সে ত তোমাদের গুণে কিন্তু সেই জন্যে বুদ্ধি যে আমাদের মোটেই নেই এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারি নে। কারণ, ও-ধারণাটি তোমাদের প্রিয় হলেও সত্য নয়। সুতরাং যুদ্ধ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত—তা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করতে বাধ্য।

যুদ্ধের সকল সাজসজ্জা সকল রঙচঙ ছাড়িয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ও-ব্যাপারটি হত্যা ও আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথচ এটি প্রত্যক্ষ সত্য যে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিম্বা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়।

মানুষ পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয় তার প্রমাণ তার দেহ। আমরা হাতে, পায়ে, মুখে, মাথায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে' ভূমিষ্ঠ হইনে, তোমরাও হও না। মানুষের অবশ্য নখদন্ত আছে কিন্তু সে নখ ভালুকের নয় এবং সে দাঁত সাপের নয়। অনেকের অবশ্য মস্তকে গোজাতির মগজ আছে এবং অনেকের দেহে গণ্ডারের চর্ম্ম আছে কিন্তু তাই বলে এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ললাটে শৃঙ্গ এবং নাসিকায় খড়্গ ছিল। শুনতে পাই যে, আদিম মানবের বৃহৎ লাঙ্গুল ছিল—বর্ত্তমানে ও-অঙ্গটি অনাবশ্যক-বিধায় সেটি আমাদের দেহচ্যুত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি যথার্থ মানবধর্ম্ম হয় তাহলে পুরুষ-মানুষের অন্ততঃ বীর-পুরুষের মাথায় শিং এবং নাকের খাঁড়া খসে পড়বার কোনও কারণ ছিল না। মানুষের কেবল

একটিমাত্র ভগবদ্দত্ত মহাস্ত্র আছে—সেটি হচ্ছে রসনা। সুতরাং মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য।

তারপর, মানুষ যে আত্মহত্যা করবার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি, তার প্রমাণ মানুষের সকল কাজ, সকল যত্ন, সকল পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ধারণ করা। ওই এক মূল-প্রবৃত্তি হতে মানুষের শুধু সকল কর্ম্মের নয়, সকল ধর্ম্মেরও উৎপত্তি। ইহজীবনের পরিমিত সীমা অতিক্রম করবার অদম্য প্রবৃত্তি থেকেই মানুষে দেহাতিরিক্ত আত্মা এবং ইহলোকাতিরিক্ত পরলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। এই কারণে, যে কর্ম্মের দ্বারা জীবন-রক্ষা সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যে ধর্ম্মের চর্চ্চায় আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট গ্রাহ্য ধর্ম্ম। তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শনবিজ্ঞান হাজার প্রমাণাভাব দেখালেও মানুষের মন থেকে যে ধর্ম্মবিশ্বাস দূর হয় না তার কারণ মস্তিষ্ক মজ্জার বিকারমাত্র,—মজ্জা মস্তিষ্কের বিকার নয়। এবং বাঁচবার ইচ্ছা মানুষের মজ্জাগত। মানুষের কাছে সব জিনিষের চাইতে প্রাণের মূল্য অধিক বলেই প্রাণবধ করাটাই মানবসমাজে সব চাইতে বড় পাপ বলে গণ্য।

এই কারণেই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এই বাক্যটিই ধর্ম্মের প্রথম না হোক, শেষ কথা। এই কথাটি সত্য বলে' গ্রাহ্য করে' নিলে যুদ্ধের স্বপক্ষে বলবার আর কোনও কথাই থাকে না। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয় তাহলে অনেকে মিলে অনেককে বধ করা যে কি করে' ধর্ম্ম হ'তে পারে তা আমাদের

ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য অকর্ত্তব্যকে যোগ দিয়ে একটি মহৎ কর্ত্তব্যে পরিণত করা হয় সে শাস্ত্র আমাদের জানা নেই।

যুদ্ধের মূল যে হিংসা, এবং বীরত্ব যে হিংস্রতার নামান্তরমাত্র সে বিষয়ে অন্ধ থাকা কঠিন।

বীরপুরুষনামক জীবের সঙ্গে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। যাত্রাদলের ভীম আর থিয়েটারের প্রতাপাদিত্য হচ্ছে আমাদের বীরত্বের আদর্শ। কিন্তু রঙ্গভূমির বীরত্ব এবং রণভূমির বীরত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা প্রভেদ আছে। কেননা, অভিনয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আমোদ দেওয়া আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে পীড়ন করা। সুতরাং আসল বীররস যে পরিমাণে করুণ-রসাত্মক নকল বীররস সেই-পরিমাণে হাস্য-রসাত্মক। এর এক থেকে অবশ্য অপরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে-সকল গুণের সমবায়ে বীরচরিত্র গঠিত হয় তার একটি বাদ আর সব গুণই আমাদের শরীরে আছে বলে, বীরত্বের বিচার করবার পক্ষে আমরা বিশেষরূপে যোগ্য।

শুনতে পাই, ধৈর্য্য হচ্ছে বীর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এ গুণে তোমাদের অপেক্ষা আমরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রত নিয়ম উপবাস জাগরণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত সুতরাং কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। বিনা-বিচারে, বিনা-ওজরে, পরের হুকুমে চলা নাকি যোদ্ধার একটি প্রধান ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম আমাদের মত কে পালন করতে পারে? আমাদের মত কলের পুঁতুল জর্ম্মাণীর রাজ-কারখানাতেও তৈরি হয় নি। তার পর, কারণে কিম্বা অকারণে,

অকাতরে প্রাণ-দেওয়া যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হয়,—তাহলে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ, কারণ তোমাদের পিতামহেরা যখন জ্বরে মর্‌তেন সেই সঙ্গে আমরা পুড়ে মরতুম। এসব গুণসত্বেও যে আমরা বীরজাতি বলে গণ্য হই নি তার কারণ আমরা পরের জন্য মর্‌তে জানি কিন্তু পরকে মার্‌তে জানিনে। যে প্রবৃত্তির অভাববশতঃ স্ত্রীধর্ম্ম হেয় আর সদ্ভাববশতঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রেয়ঃ—সে হচ্ছে হিংসা। বীরপুরুষ কিছুই সাধ করে ত্যাগ কর্‌তে চান না;—সবই গায়ের জোরে ভোগ কর্‌তে চান। শাস্ত্রে বলে —"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। বীরের ধর্ম্ম হচ্ছে, পৃথিবীর সুবর্ণ-পুষ্প চয়ন করা—অবশ্য আমরাও তার অন্তর্ভূ্ত। তাই আমাদের সঙ্গে বীরপুরুষের চিরকাল ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ। বীর প্রাণ দান কর্‌তে পারেন না—যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবাৎ তা হারান ত সে তাঁর কপাল আর তাঁর শত্রুর হাতযশ। বীরত্বের মান্য আজও যে পৃথিবীতে আছে তার কারণ বীরত্ব মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নয়। সুতরাং যুদ্ধের মাহাত্ম্য মানুষের বল নয় দুর্ব্বলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে কাজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, মানুষের ভীরুতাই যার মূলভিত্তি, যে কর্ম্মের ফলে সমাজের অশেষ ক্ষতি হয়—তা যে কি করে ধর্ম্ম হতে পারে তা আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানে আসে না।

পুরাকালে পুরুষ-মানুষে যুদ্ধ করাটাই ধর্ম্ম মনে কর্‌তেন এবং স্ত্রীলোকে চিরকালই তা অধর্ম্ম মনে করত। কালক্রমে পুরুষের মনেও এ বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান জন্মেছে। এখন যুদ্ধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—এক ধর্ম্মযুদ্ধ আর এক অধর্ম্মযুদ্ধ। শুনতে পাই, এ কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম, তার কারণের উপর নির্ভর করে। সভ্য

জাতির মতে আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ একমাত্র তাই ধর্ম্ম ;—বাদ-বাকি সকল কারণেই তা অধর্ম্ম। এ মতের প্রতিবাদ করা অসম্ভব হলেও পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেন না, কথাটা শুন্‌তে যত সহজ আসলে তত নয়। এই দেখ না, ইউরোপে কোনো জাতিই এই যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চান না এবং পরস্পর পরস্পরকে অধর্ম্মযুদ্ধ কর্‌বার দোষে দোষী কর্‌ছেন—অথচ এঁরা সকলেই সভ্য, সকলেই বিদ্বান ও সকলেই বুদ্ধিমান। এই মতভেদের কারণ কি এই নয় যে, আত্মরক্ষা-শব্দের অর্থটি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট নয়। "আত্ম"-শব্দের অর্থ কে কি বোঝেন, আত্মজ্ঞানের পরিসরটি কার কত বিস্তৃত—তার দ্বারাই তাঁর আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসারও নির্ণীত হয়। পরদ্রব্যে যে মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মাতে পারে তার প্রমাণ পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি এবং বহু জাতি নিত্যই দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন্ পক্ষ যে সুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছেন আর কোন্ পক্ষ যে সুদ্ধ পরদ্রোহিতার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছেন—নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে তা বলা কঠিন।

আত্মরক্ষা-শব্দের অবশ্য একটা জানা অর্থ আছে; সে হচ্ছে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজের প্রাণ ও নিজের ধন রক্ষা করা; এবং সে ধনও বর্ত্তমান ধন,—ভূত কিম্বা ভবিষ্যৎ নয়। কেননা, গত ধন পুনরুদ্ধার কিম্বা অনাগত ধন আত্মসাৎ কর্‌বার জন্য পরকে আক্রমণ করা দরকার।

পৃথিবীর সকল জাতিই যদি উক্ত সহজ ও সঙ্কীর্ণ অর্থে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনও কারণে যুদ্ধ করতে গররাজি হন তাহলে যুদ্ধ কালই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কেউ যদি আক্রমণ

না করে ত আর কাউকেও আত্মরক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়াই যদি পুরুষজাতির মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহলে নিরস্ত্র হওয়াই তার অতি সহজ উপায়। সুতরাং যতদিন দামামাকাড়া ঢালতলোয়ার গুলিগোলা ইত্যাদি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে থাকবে, ততদিন আত্মরক্ষা করা যে যুদ্ধের একমাত্র কিম্বা প্রধান কর্ত্তব্য এ কথা বলা চলবে, কিন্তু মানা চল্‌বে না।

আসল কথা, যুদ্ধের দ্বারা আত্মরক্ষা করা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে অসম্ভব এবং প্রবল জাতির পক্ষে অনাবশ্যক।

দুর্ব্বলের পক্ষে ও-উপায়ে আত্মরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করার অর্থ আত্মহত্যা করা। হাতে হাতে প্রমাণ—বেল্‌জিয়াম।

যুদ্ধ আমাদের মতে একমাত্র সেই-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম যে-ক্ষেত্রে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপে, দুর্ব্বল এই উপায়ে আত্মরক্ষা নয়, আত্মবিসর্জ্জন করে। উদাহরণ—বেল্‌জিয়াম।

সত্য কথা বল্‌তে গেলে, মানুষে হয় অর্থের জন্য নয় প্রভুত্বের জন্য, হয় রাজ্যের জন্য নয় গৌরবের জন্য—পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। পরার্থ-নাশ এবং স্বার্থসাধনের জন্যই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়। যুদ্ধের মূলে আত্মজ্ঞান নেই, আছে শুধু অহংজ্ঞান। যুদ্ধের উৎপত্তি থেকেই তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্য এ প্রমাণ করতে হলে, তৎপূর্ব্বে "হিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তোমরা অবশ্য এ কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হও নি। বুদ্ধের ধর্ম্ম যে বুদ্ধির ধর্ম্ম নয় এই প্রমাণ কর্‌বার জন্য, শুন্‌তে পাই, বুদ্ধিমান পুরুষে নানা দর্শন ও বিজ্ঞান রচনা করেছেন।

বাঙ্গলার মাসিকপত্রের প্রসাদে এসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধানগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরাও লাভ করেছি। দেশের ও বিদেশের এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মাথার না হোক, বুকের মাপ আমরা নিতে জানি। বড় বড় কথার আড়ালেও তোমাদের হৃদয়-বিকার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তাই তোমাদের দর্শনবিজ্ঞানে তোমাদের ঠকাতে পারে, আমাদের পারে না।

শুন্‌তে পাই, অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষ পুচ্ছ-বিষাণহীন হলেও পশু। এবং যেহেতু পশুর জীবন সংগ্রাম-সাপেক্ষ অতএব দুর্ব্বলের উপর আক্রমণ এবং প্রবলের নিকট হতে পলায়ন করাই মানুষের স্বধর্ম্ম। ছল ও বল প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ তার অন্তর্নিহিত মানসিক ও শারীরিক শক্তির পূর্ণ পরিণতি লাভ কর্‌তে পারে। সুতরাং পশুত্বের চর্চ্চা করাই হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করা। যে-সভ্যতা নিষ্ঠুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-সভ্যতা শক্তিহীন ও প্রাণহীন, কেন না হিংসাই হচ্ছে জীবজগতের মূল সত্য। এবং সেই সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাতই মানবের উন্নতির একমাত্র কারণ। এবং নিজের নিজের উন্নতি সাধন করাই যে পরম পুরুষার্থ—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমরা অজ্ঞযুগের উত্তরাধিকারীসর্ত্তে যে সকল নীতিজ্ঞান লাভ করেছি তার চর্চ্চায় মানুষকে শুধু দুর্ব্বল করে। সুতরাং নবনীতির বিধান এই যে, নির্ম্মমভাবে যুদ্ধ কর, অবশ্য দুর্ব্বলের সঙ্গে।

এতটা নগ্ন সত্য মানুষে সহজে বুকে তুলে নিতে পারে না ;—কেননা তা তার যুগসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যায়। সাধারণ

লোকের সে পরিমাণ বুদ্ধিবল নেই, যাতে করে' জীবজগতে অবরোহণ করাই যে আরোহণ কর্‌বার একমাত্র উপায়—এ সত্য সহজে আয়ত্ত কর্‌তে পারে। তা ছাড়া, সকলের সে পরিমাণ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নেই যার সাহায্যে নিজের বুকের ভিতর হিংস্র পশুর সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌তে পারে।

সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য করাতে হলে তাকে ধর্ম্ম ও নীতির সাজে সজ্জিত করে বার করা দরকার। অতঃপর বৈজ্ঞানিকরা সেই উপায়ই অবলম্বন করেছেন।

সুনীতির ছদ্মবেশধারী বৈজ্ঞানিক মত এই। প্রতি লোক নিরীহ হলেও তাদের সমষ্টিতে সমাজনামক যে বিরাট-পুরুষের সৃষ্টি হয়, সে একটি ভীষণ জীব। এই বিরাট-পুরুষের প্রাণ আছে, আত্মা নেই—রতি আছে, বুদ্ধি নেই—গতি আছে, দৃষ্টি নেই। সমাজ শুধু বাঁচতে চায় ও বাড়্‌তে চায়, এই তার জীবনের ধর্ম্ম; —অন্য কোনও ধর্ম্মাধর্ম্ম তাকে স্পর্শ করে না। সমাজ হচ্ছে একমাত্র অঙ্গী এবং ব্যক্তিমাত্রেই তার অঙ্গ। সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের অধীন কিন্তু সমাজ কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধীন নয়। এবং যেহেতু সমাজের বাইরে আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই—সে কারণ সমাজকে রক্ষা করা এবং তার অভ্যুদয় সাধন করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সহস্র সহস্র লোকের আত্মবলিদানের ফলে এই বিরাট-পুরুষের দেহ পুষ্ট হয়। লোকে বলে যে, যে মণ্ডপের আঙ্গিনায় লক্ষ বলি হয়, সেখানে একটি কবন্ধ-ভূত জন্মায়;—যার নরবলি ব্যতীত আর-কোনও উপায়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না; এবং সে বুভুক্ষিত থাকলে সাধকের

ঘাড়-মটকে খায়। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সমাজ-নামক বিরাট-পুরুষ এই জাতীয় একটি প্রেতযোনি বই আর কিছুই নয়। এই বিরাট-কবন্ধের শোণিত-পিপাসা নিবারণার্থ নরবলি দেওয়া ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে যতগুলি বিভিন্ন সমাজ আছে, ততগুলি পৃথক বিরাট-পুরুষও আছে। এবং এই সকল নরমাংস-লোলুপ দৈত্যদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—নিজ-সমাজের নিকট পর-সমাজকে বলি দেওয়া—অর্থাৎ যুদ্ধ করা। এই মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকরা মানবের নৈতিক বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, শুধু তার বিকার সাধন করে' সেটিকে বিপথে চালাতে চান্। এঁদের সাদা কথা এই যে—নিজের স্বার্থের জন্য কর্‌লে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য কর্‌লে সেই একই কাজ মহাপুণ্য। সমাজনামক অপদেবতাকে নিবেদন করে দিলে খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি—ফুলের মত শুভ্র, দীপের ন্যায় উজ্জ্বল, ধূপের ন্যায় সুরভি হয়ে উঠে। বহু মানবকে একত্রে যোগ দিলে কি করে' একটি দানবের সৃষ্টি হয় তা আমাদের স্ত্রীবুদ্ধির অতীত। আর এই কথাটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায় যে, লোকসমষ্টিকে সমাজ নাম দিয়ে তার উপরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করার যদি কোনও বৈধ কারণ থাকে তাহলে এই ব্যক্তিটির অন্তরে একটি আত্মার আরোপ করা কি কারণে অবৈধ? এই বিরাট-পুরুষকে মানবধর্ম্মী কল্পনা কর্‌লে আমাদের সহজ ন্যায়বুদ্ধিকে ডিগবাজি-খাওয়াবার জন্য তোমাদের আর এত গলদঘর্ম্ম হতে হত না।

বিজ্ঞান মানুষকে মর্‌তে শেখালেও মার্‌তে শেখাতে পারে

না। এই জন্যই দর্শনের আবশ্যক। মানুষে সহজে দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা-পাখীটিকে মুক্তি দিতে চায় না, কেননা ভবিষ্যতে তার গতি কি হবে সে বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। আত্মার সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে এবং তার ভবিষ্যৎ-অস্তিত্বের আশা আমরা সকলেই পোষণ করি। এর বেশি আমরা আর-কিছুই জানি নে। অপর-পক্ষে, দার্শনিকেরা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের সকল খবরই জানেন। সুতরাং অমরত্বের আশাকে বিশ্বাসে পরিণত করবার ভার তাঁদের হাতে। এবং তাঁরাও তাঁদের কর্ত্তব্যপালন করতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য মারা, মরা নয়; তবে হত্যা করতে গেলে হত হবার সম্ভাবনা আছে বলে' দার্শনিকেরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করলে আত্মা একলম্ফে স্বর্গারোহণ করে এবং সেদেশে উপস্থিত হবামাত্র এত ভোগ-বিলাসের অধিকারী হয় যে, তা এ পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরেরও কল্পনার অতীত। কিন্তু অধ্রুব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের লোভে ধ্রুব ত্যাগ করা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সকাল-সকাল স্বর্গপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যোদ্ধাদের তাদৃশ উৎসাহ না থাকায়, তাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে নরকেরও ভয় দেখান হয়। কিন্তু তাতেও যদি ফল না হয় ত সেনাপতিরা যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ সৈনিকদের বধ করতে পারেন—এ বিষয়েও দার্শনিক বিধি আছে। অর্থাৎ মৃত্যুভয় দেখিয়ে মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অত কাঁচা ওষুধ সকলের ধরে না। পৃথিবীতে এমন লোক দুর্লভ নয়, যাঁরা মানুষকে মারতে প্রস্তুত নন,—

স্বর্গের লোভেও নয়, নরকের ভয়েও নয়। এঁদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উপযোগী দর্শনও আছে। যাঁরা নিজের স্বার্থের জন্য পরের ক্ষতি করতে প্রস্তুত নন—তাঁদের নিঃস্বার্থতার দিক্ দিয়ে বাগাতে হয়। যিনি মর্ত্ত্যরাজ্য, কি স্বর্গরাজ্য—কোন রাজ্যই কামনা করেন না—তাঁকে নিষ্কাম হত্যা করবার উপদেশ দেওয়া হয়। হত্যা পাপ নয়;—কারণ ও একটি কর্ম্ম। কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, তার ফল কামনা করাই অধর্ম্ম। হত্যা করা যে পাপ এ ভ্রান্তি শুধু তাদেরই হয় যারা আত্মার ভূতভবিষ্যতের বিষয় অজ্ঞ। আত্মা যখন অবিনশ্বর তখন কেউ কাউকে বধ করতে পারে না। দেহ আত্মার বসনমাত্র। সুতরাং প্রাণবধ করার অর্থ আত্মাকে পুরোনো কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরানো। অপরকে নূতন বস্ত্র দান করা যে পুণ্যকার্য্য সে ত সর্ব্ববাদীসম্মত। মানুষ যদি তার ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করে' নিজের অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব অনুভব করে, তাহলে নিষ্ফল হত্যা করতে তার আর কোনও দ্বিধা হবে না। অপরকে বধ করবার সুফলটি নিজে ভোগ না করলেও আর-দশজনকে যে তার কুফল ভোগ করতে হয় তা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হতে আত্মজ্ঞানী পুরুষ চিরমুক্ত। অতএব নির্ম্মম-ভাবে যুদ্ধ কর।

পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক মত বিদেশের এবং দার্শনিক মত এদেশের। বলা বাহুল্য যে, দুই একই-মতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

এই সব দর্শনবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে,

যুদ্ধ করাটা মানবধর্ম্ম নয়। যদি তা হত ত মানবকে হয় দানব, নয় দেবতা, নয় পশু প্রমাণ কর্তে দর্শনবিজ্ঞানের সিংহ-ব্যাঘ্রেরা এতটা গর্জ্জন করতেন না।

আসল কথা, বুদ্ধি-ব্যবসায়ীরা মানবসমাজকে মাথার উপর দাঁড় করাতে চান্, কাজেই তা উল্টে পড়ে।

এ সকল দর্শনবিজ্ঞান যে মনের বিকারের লক্ষণ তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। জ্বরে মাথায় খুন্ চড়ে গেলে মানুষে যে প্রলাপ বকে তার পরিচয় এই ম্যালেরিয়ার দেশে আমরা নিত্যই পাই। দুঃখের বিষয় এই যুদ্ধজ্বর যেমন মারাত্মক তেমনি সংক্রামক। এ হচ্ছে মনের প্লেগ। এ যুগে শরীরের প্লেগ হয় এসিয়ায় আর মনের প্লেগ হয় ইউরোপে—এ দুয়ের ভিতর এই যা প্রভেদ। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে দেশথেকে প্লেগ তাড়িয়েছে, মনথেকে কি তা তাড়াতে পার্বে না?

এ পাপ দূর কর্তে যে মনের বল, যে চরিত্রের বল চাই, এক-কথায় যে বীরত্ব চাই—সে বীরত্ব তোমাদের নরসিংহ ও নরশার্দ্দূলদের দেহে নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষচরিত্র অনুকরণ করা যে হাস্যকর তার কারণ মানবজাতি যদি যথার্থ সভ্য হতে চায় ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-চরিত্রের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তোমাদের দেহের বলের সঙ্গে আমাদের মনের বলের, তোমাদের বুদ্ধিবলের সঙ্গে আমাদের চরিত্রবলের যদি রাসায়নিক যোগ হয় তাহলেই তোমরা যথার্থ বীর-পুরুষ হবে, নচেৎ নয়। কারণ খাঁটি বীরত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো—পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেঁচে থাকা। মানুষে ক্ষণিক নেশার ঝোঁকে পরের জন্য দেহত্যাগ

কর্‌তে পারে কিন্তু পরের জন্য চিরজীবন আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার আবশ্যক। সুতরাং যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম হচ্ছে স্ত্রীধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়।

এর উত্তরে ঐতিহাসিক বল্‌বেন—আজ তিন হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ঢের বদল হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বরাবর সমানই চলে আস্‌ছে, সুতরাং তা চিরদিনই থাক্‌বে। এর প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পুরুষজাতির ভিতর যদি এমন একটি আদিম পশুত্ব থাকে যার উচ্ছেদ অসম্ভব, তাহলে তাদের লালনপালন কর্‌বার মত তাদের শাসন কর্‌বার ভারও আমাদের হাতে আসা উচিত। আমরা শাসনকর্ত্রী হলে পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করব এবং তোমাদের পোষ মানিয়ে জগবন্ধুর রথ টানাব। ইতি

জনৈক বঙ্গনারী।

নারীর পত্রের উত্তর

আমরা স্ত্রীজাতিকে সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশি। সম্ভবতঃ সেই কারণে মাসিকপত্রসকল 'পত্রিকা'-সংজ্ঞা ধারণ করেছে। স্ত্রীজাতি এতদিন সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন নি, কেননা মতামতে তাঁরা একালযাবৎ আমাদেরই অনুসরণ করে আস্‌ছেন। বাঙ্গলায় স্ত্রী-সাহিত্য জল-মেশানো পুং-সাহিত্য বই আর কিছুই নয়, সুতরাং সে সাহিত্য পরিমাণে বেশি হলেও আমাদের সাহিত্যের চাইতেও ওজনে ঢের কম ছিল।

কিন্তু লেখিকারা যদি স্ত্রী-মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে সুরু করেন তাহলে তাঁদের কথা আর উপেক্ষা করা চল্‌বে না। এই কারণে, এই সঙ্গে যে "নারীর পত্রখানি" পাঠাচ্ছি তার মতামতসম্বন্ধে সসঙ্কোচে দুটি একটি কথা বল্‌তে চাই।

লেখিকার মূল-কথার বিরুদ্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সে কথা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ না-করা স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রমাণ কর্‌বার জন্য অত বাগ্‌জাল বিস্তার করবার আবশ্যক ছিল না। অপর-পক্ষে, যুদ্ধ করা যে, পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক তা প্রমাণ করাও অনাবশ্যক। এই সত্যটি মেনে নিলে লেখিকা দর্শনবিজ্ঞানের প্রতি অত আক্রোশ প্রকাশ কর্‌তেন না। দর্শনবিজ্ঞান যুদ্ধের সৃষ্টি করে নি,—যুদ্ধই তদনুরূপ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র হচ্ছে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক,

তাই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের চিত্ততোষক হতে বাধ্য। এ দুই জাতির ভিতর স্পষ্ট সাংসারিক বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু যুদ্ধজীবীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর যে একটি মানসিক বাধ্যবাধকতাও আছে তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়। একদল মানুষে যা করে আর-এক দলে হয় তার ব্যাখ্যান্, নয় ব্যাখ্যা করে। কর্ম্মবীর জ্ঞানহীন হতে পারে, এবং জ্ঞানবীর কর্ম্মহীন হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কর্ম্ম না থাকলে জ্ঞানও থাকৃত না। কর্ম্ম জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, জ্ঞান কর্ম্মবৃক্ষের ফুল। সুতরাং যুদ্ধের দায়িত্ব দর্শন-বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপানো। মানুষ যতদিন যুদ্ধ করবে, মানুষে ততদিন হয় তার সমর্থন, নয় তার প্রতিবাদ করবে। মানুষকে ঝগড়ালড়াই করতে উস্কে দেওয়াই যে জ্ঞানের একমাত্র কাজ তা অবশ্য নয়। জ্ঞানীমাত্রেই যে নারদ নন, তার প্রমাণ স্বয়ং বুদ্ধদেব।

লেখিকা ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অধর্ম্মযুদ্ধের পার্থক্য স্বচ্ছন্দচিত্তে মান্তে চান না। তাঁর মতে এই "অভেদ পার্থক্যের" আবিষ্কারে পুরুষজাতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের নয়। হৃদয় ও বুদ্ধির পার্থক্যও যে কাল্পনিক—এ সত্যটি মনে রাখলে—যা আসলে অবিচ্ছেদ্য তার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার এক অংশ আমাদের দিয়ে অপর অংশ স্ত্রীজাতি অধিকার করে বস্তেন না। বুদ্ধিও আমাদের একচেটে নয়, হৃদয়ও ওঁদের একচেটে নয়, এবং যেমন হৃদয়ের অভাবের নাম বুদ্ধি নয় তেমনি বুদ্ধির অভাবের নামও হৃদয় নয়। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে পুরুষজাতি বুদ্ধি ও হৃদয় দুয়েরই সমান পরিচয়

দিয়েছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হলেও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধসম্বন্ধে বিধিনিষেধ মান্য।

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এই বাক্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা হলেও বৌদ্ধ শাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ পেটের-দায়ে যুদ্ধ করে। উদরকে মস্তিষ্ক যে পুরোপুরি নিজের শাসনাধীন করতে পারে না তার জন্য দায়ী মানুষের প্রকৃতি নয়, তার আকৃতি। দেহ ও মনে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন শান্তির জন্য একেও কিছু ছেড়ে দিতে হয় ওকেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়। হিংসা এবং অহিংসার সন্ধি থেকেই বৈধ হিংসার সৃষ্টি হয়। আর, সন্ধ্যা জিনিসটি, তা সে প্রাতঃই হোক আর সায়ংই হোক, পুরো আলোও নয়, পুরো অন্ধকারও নয়। সুতরাং যুদ্ধ জিনিষটি একদম সাদাও নয়, একদম কালও নয়;—ওই দুয়ে মিলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ছাই।

লেখিকা আমাদের প্রতি, অর্থাৎ বাঙ্গালী পুরুষের প্রতি, যে কটাক্ষ করেছেন সে অবশ্য সে-জাতীয় বক্রদৃষ্টি নয় যার সম্বন্ধে কবিতা লিখে লিখে আমরা এলি নে। এ সম্বন্ধে আমি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করব না, কেননা—লেখিকা স্বীকার করেছেন যে, রসনা হচ্ছে মহাস্ত্র। দুর্ব্বল আমরা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে জানিনে; কিন্তু অবলা ওঁরা যে ও-মহাস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন সে বিষয়ে কেউ আর সন্দেহ করেন না, কেননা সকলেই ভুক্তভোগী।

সে যাই হোক, সাধারণ পুরুষজাতিসম্বন্ধে তাঁর মতের প্রতিবাদ করা যেতে পারে। তিনি পুরুষের স্বভাব অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, কেননা তা স্ত্রীস্বভাব নয়। মানুষের স্বভাব যে কি লেখিকা যদি তা জানেন তাহলে তিনি এমনি-একটি জিনিষের

সন্ধান পেয়েছেন যা আমরা যুগযুগান্তের অনুসন্ধানেও পাই নি। আমরা যেমন কোনও অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে জন্মগ্রহণ করিনি, তেমনি কোনও প্রাক্তন সংস্কার নিয়ে জন্মাই নি। আমরা দেহ ও মনের নগ্ন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আসি। তাই আমরা মনুষ্যত্বের তত্ত্বের জন্য কখন পশুর কাছে, কখন দেবতার কাছে যাই; কারণ এসব জাতীয় জীবের একটা বাঁধাবাঁধি বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে,—শুধু আমাদের নেই। আমরা শুধু স্বাধীন, বাদবাকী সৃষ্টি নিয়মের অধীন, সুতরাং আমরা মানবজীবনের যখনই একটি বাঁধাবাঁধি নিয়মের আশ্রয় পেতে চাই তখনই আমাদের মনুষ্যেতর জীবের দ্বারস্থ হতে হয়। নৃসিংহও আমাদের আদর্শ, নরহরিও আমাদের আদর্শ, শুধু আমরা আমাদের আদর্শ নই। মনুষ্যত্ব পড়ে' পাওয়া যায় না কিন্তু গড়ে' নিতে হয়—এই সত্য মানুষে যতদিন না গ্রাহ্য করবে ততদিন ভিক্ষুকের মত তাকে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। যদি বল যে, প্রত্যক্ষ পশু কিম্বা অপ্রত্যক্ষ দেবতা মানুষের আদর্শ হতে পারে না, তাহলে মানুষে উদ্ভিদকে তার আদর্শ করে তুলবে। এ-কাজ মানুষে পূর্ব্বে করেছে এবং বাধ্য হলে পরেও করবে। মানুষ যদি মানুষ না হতে শেখে তাহলে উদ্ভিদ হওয়ার চাইতে তার পক্ষে পশু হওয়া ভাল,—কেননা পশু জঙ্গম, আর উদ্ভিদ স্থাবর। মনুষ্যত্বকে স্থাবর করতে হলে মানুষকে জড় মূক অন্ধ ও বধির হতে হবে। আর তা ছাড়া উদ্ভিদ হলে আমরা ভক্ষক না হই ভক্ষ্য হব।

লেখিকা যদি এখানে প্রশ্ন করেন যে, কোনও একটা আদর্শ না পেলে কার সাহায্যে মানুষ একটি স্থায়ী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবে,

তার উত্তরে আমি বলব, মানুষের মানুষকে নিয়ে experiment করতে হবে। যেমন, আমরা একটা লেখা গড়ে'-তুলতে হলে যতক্ষণ আমাদের ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছই ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে কাটি আর লিখি, তেমনি সভ্যতা-পদার্থটিও ততক্ষণ বারবার ভেঙ্গে গড়তে হবে, যতক্ষণ মানুষ তার ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছয়। সে দিন যে কবে আস্‌বে কেউ বল্‌তে পারে না; সম্ভবতঃ কখনই আস্‌বে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান যে পরিমাণে এই experiment-এর কাজ করে সে পরিমাণে তা সার্থক এবং যে পরিমাণে তা নূতন experiment-কে বাধা দেয় সে পরিমাণে তা অনর্থক। মানুষসম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, তার সম্বন্ধে কোনও শেষ কথা নেই।

সাধারণতঃ যুদ্ধব্যাপারটি উচিত কি অনুচিত সে আলোচনার সার্থকতা যাই হোক, কোনও-একটি বিশেষ-যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিচারের মূল্য মানুষের কাছে ঢের বেশি।

এই বর্ত্তমান যুদ্ধই ধরনা কেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক এই ভেবে উদ্বেজিত উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপের হাতে গড়া সভ্যতা এইবার ইউরোপ বুঝি নিজে হাতে ভাঙ্গে! যদি ইউরোপের সভ্যতা এই ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ে ত বুঝতে হবে যে, সে সভ্যতার ভিৎ অতি কাঁচা ছিল। তাই যদি প্রমাণ হয়, তাহলে ইউরোপকে এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে ভবিষ্যতে এর চাইতে পাকা সভ্যতা গড়্‌তে হবে। ঠেকো-দিয়ে রাখার চাইতে ঝাঁকিয়ে দেখা ভাল যে, যে ঘরের নীচে আমরা মাথা রাখি সে ঘরটি ঘুণে-খাওয়া কি টেক-

সই। কিন্তু এই ভূমিকম্পে যে, ইউরোপের অট্টালিকা একেবারে ধরাশায়ী হবে সে আশঙ্কা কর্‌বার কোনও কারণ নেই। ধূলিসাৎ হবে শুধু তার দর্পের চূড়া আর তার ঠেকো-দিয়ে-রাখা প্রাচীন অংশ, আর তার গোঁজা-মিলন দিয়ে তৈরি নতুন অংশ। এতে মানবজাতির লাভ বই লোকসান নেই। তা ছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের একটি মস্ত লাভ হবে—তার এই চৈতন্য হবে যে, সে এখনও পুরোপুরি সভ্য হয়নি। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হয়ে ইউরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল, এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ কর্‌বে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। লেখিকা বলেছেন যে, যুদ্ধরূপ মানসিক প্লেগ ইউরোপে আছে, এসিয়ায় নেই। এসিয়ার লোকের যে মনে পাপ নেই সে কথা বলা চলে না; কেননা লেখিকাই দেখিয়েছেন যে, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রই যুদ্ধসম্বন্ধে একই মন্ত্র পুরুষজাতির কানে দিয়েছেন। তবে এসিয়া যে শান্ত আর ইউরোপ যে দুর্দ্দান্ত তার কারণ মন ছাড়া অন্যত্র খুঁজতে হবে। প্রাচ্য-দর্শন শুধু মন্ত্র দিতে পারে—কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শুধু মন্ত্র নয়, সেই মন্ত্রের সাধনোপযোগী যন্ত্রও মানুষের হাতে দিয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য শুধু শাস্ত্র নয়, অস্ত্রশস্ত্রও গড়ে দিয়েছে। সে অস্ত্রের সাহায্যে মানুষে পঞ্চভূতকে নিজের বশীভূত করেছে কিন্তু নিজেকে বশ কর্‌তে পারে নি। সুতরাং অনেকে মনে করতেন যে, বিজ্ঞান হয় ত অমানুষের হাতে খন্তা দিয়েছে। যদি এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে ঘটনাও তাই, তাহলে ইউরোপীয়েরা মানুষ হতে চেষ্টা কর্‌বে; কারণ ও খন্তা

কেউ ত্যাগ কর্‌তে পারবে না ;—শুধু সেটিকে ভবিষ্যতে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রহিসেবে ব্যবহার না করে—জড়প্রকৃতির শাসনের যন্ত্রহিসেবে ব্যবহার কর্‌বে ; অর্থাৎ প্রলয় নয়, সৃষ্টির কাজে তা নিয়োজিত হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউরোপের নাম উল্লেখ কর্‌বার অর্থ এই যে, এসিয়াবাসীদের কতদূর মনুষ্যত্ব আছে, না আছে—এ বৈজ্ঞানিক যুগে তার পরীক্ষা হয় নি। ও খস্তা হাতে পড়্‌লে বোঝা যেত যে আমরা বাঁদর কি মানুষ।

এই যুদ্ধের বেদনা থেকে ইউরোপের ন্যায়-বুদ্ধি যে জাগ্রত হয়ে উঠবে তার আর সন্দেহ নেই ;—কেননা ইতিমধ্যেই সে দেশে মানুষে ত্রাহি মধুসূদন বলে চীৎকার করছে—প্রহারেণ ধনঞ্জয় বলে নয়।

কিন্তু পুরুষমানুষ যে কখনও মানুষ হবে এ বিশ্বাস লেখিকার নেই। তিনি পুরুষকে ইতিহাসের অতিবিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে কত ক্ষুদ্র। এবং ঐরূপে তার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করে, প্রস্তাব করেছেন যে, হয় সে স্ত্রীধর্ম্ম অবলম্বন করুক, নয় তার শাসনের ভার স্ত্রীজাতির হাতে দেওয়া হোক। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি স্ত্রীধর্ম্মী হওয়াই পুরুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র উপায় হয় তাহলে আমাদের মেয়েলি বলে' কেন উপহাস করা হয়েছে ? সম্ভবতঃ লেখিকার মতে আমরা স্ত্রীজাতির গুণগুলি শিক্ষা করতে পারিনি, শুধু তাদের দোষগুলিই আত্মসাৎ করেছি। আমাদের ত্রুটিগুলির অপরকে অনুকরণ করতে দেখলে আমরা সকলেই বিরক্ত হই ;—কেননা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও-কার্য্য করলেও তা ভেংচানির মতই দেখায়। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, মানুষে

অপরের গুণের অনুসরণ কর্‌তে পারলেও অনুকরণ শুধু পরের দোষেরই করতে পারে। এর পরিচয় জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু অবস্থার গুণে আমরা কিছু কর্‌তে হলেই অনুকরণ করতে বাধ্য। আমরা experimentএর সাহায্যে নিজের জীবন গঠন করতে সাহস পাই নে বলে' আমাদের সুমুখে একটা তৈরি আদর্শ থাকা আবশ্যক, যার অনুকরণে আমরা নিজেদের গড়ে' নিতে পারি। আমরা এ রকম দুটি আদর্শের সন্ধান পেয়েছি ;—একটি হচ্ছে বর্ত্তমান ইউরোপীয়, অপরটি প্রাচীন হিন্দু। তার উপর যদি আবার স্ত্রীজাতিকেও আদর্শ করতে হয় তাহলে এই তিন জাতির দোষ একাধারে মিলিত হয়ে যে চীজ্‌ দাঁড়াবে জগতে আর তার তুলনা থাক্‌বে না। সৃষ্টি হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক, আমরা ত্রিদোষাত্মক হলে যে সৃষ্টিছাড়া হব তার আর কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং এখন বিবেচ্য তোমাদের হাতে শাসনকর্ত্তৃত্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না। এতে পৃথিবীর অপর-দেশের পুরুষজাতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি হবে তা বল্‌তে পারি নে—কিন্তু আমাদের কোনও লোকসান্‌ নেই। কারণ আমরা ত চিরদিনই তোমাদের শাসনাধীন রয়েছি। আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণও ওই। লেখিকা ত নিজেই স্বীকার করেছেন—স্ত্রীলোকে অশিক্ষার গুণে এদেশে পুরুষ-সমাজকে চালমাৎ করে রেখেছে। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষের অধীন থাকা ভাল নয়, পুরুষেরও স্ত্রীলোকের অধীন থাকা ভাল নয়। দাসত্বও মনুষ্যত্বকে যেমন বিকৃত করে, প্রভুত্বও তেমনি করে। স্ত্রীপুরুষে যে অহর্নিশি লড়াই করে তার কারণ, একজন আর-একজনের অধীন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধ

ততদিন থাক্‌বে, যতদিন এ পৃথিবীতে একদিকে প্রভুত্ব আর অপরদিকে দাসত্ব থাক্‌বে।

কিন্তু ও ব্যাপার যে পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাক্‌বে না, এই যুদ্ধেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আসলে একটি ভীষণ তর্ক বই আর কিছুই নয়। যে বিষয়ের শুধু কাগজে-কলমে মীমাংসা হয় না, তার সময়ে সময়ে হাতে-কলমে মীমাংসা কর্‌তে হয়। ইউরোপে কামান-বন্দুকে যে তর্ক চল্‌ছে তার বিষয় হচ্ছে —"যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত।" এক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ হচ্ছে জার্ম্মানী আর উত্তরপক্ষ হচ্ছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে যদি উত্তরপক্ষ জয়ী হয় (এবং জয় যে ন্যায়ের অনুসরণ কর্‌বে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই) তাহলে মানব-জাতি এই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হবে যে, যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। আর-একটি কথা,—পুরুষমানুষে যুদ্ধরূপ প্রচণ্ড বিবাদ কখন-কখন করে, কিন্তু লেখিকার স্বজাতিই হচ্ছে সকল নিত্য-নৈমিত্তিক বিবাদের মূল। এর জন্য আমাদের বুদ্ধি কিম্বা তাঁদের হৃদয় দায়ী তার বিচার আমি কর্‌তে চাই নে। আমরা মনসা হতে পারি কিন্তু ধূনোর গন্ধ ওঁরাই যোগান্। ওঁরা উস্‌কে দিয়ে পুরুষকে যে পরিমাণে "বীরপুরুষ" করে তুল্‌তে পারেন, তা কোনও দর্শন-বিজ্ঞানে পারে না। তবে যে, লেখিকা শমদমপ্রভৃতি সদ্‌গুণে নিজেদের বিভূষিত মনে করেন, সে ভুল ধারণার জন্যও দায়ী আমরা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্ত্রীজাতীকে আমরা সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। এ কাজটি ন্যায় হলেও সেই সঙ্গে একটি অন্যায় কাজও আমরা করেছি। স্ত্রীজাতির আমাদের

সমাজে কোনরূপ মর্য্যাদা নেই কিন্তু সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশী আছে। এর কারণ, সকলসমাজের উপর হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর্‌তে হলে—তোমাদের গুণকীর্ত্তন করা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর নেই। আমাদের নিজের বিষয় মুখ-ফুটে অহঙ্কার করা চলে না; কেননা, আমাদের দেহমনের দৈন্য বিশ্বমানবের কাছে প্রত্যক্ষ; সুতরাং আমরা বল্‌তে বাধ্য যে, আমাদের সমাজের সকল ঐশ্বর্য্য অন্তঃপুরের ভিতর চাবি দেওয়া আছে। এ সব কথার উদ্দেশ্য আমাদের নিজের মন যোগানো এবং পরের মন ভোলানো। ও হচ্ছে তোমাদের নামে বেনামী করে আমাদের আত্মপ্রশংসা করা। সুতরাং, যদি মনে কর ওই সব প্রশংসিত গুণে তোমাদের কোন সত্ত্ব জন্মেছে, তাহলে তোমরা যে তিমিরে আছ, সেই তিমিরেই থাক্‌বে।

বীরবল।

অষ্টম সংখ্যা]　　অগ্রহায়ণ ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ

(১)

বর্ত্তমান যুদ্ধের কার্য্যকারণসম্বন্ধে ইউরোপে যদি কোন বাজে কথা কিম্বা অসঙ্গত কথা বলা হয় তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই, কেননা মানুষে যখন যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, যখন মনে রাগ ও দ্বেষই প্রাধান্য লাভ করে তখন তার পক্ষে বাক্যের সংযম কতক পরিমাণে হারানো স্বাভাবিক।

ঘরে ডাকাত পড়্‌লে তার সঙ্গে মিষ্ট এবং শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবতঃ দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়; এবং ইউরোপের লোক দেবতা নয়, মানুষ।

কিন্তু এই যুদ্ধব্যাপারটি আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌বার বিশেষ কোনও বাধা নেই। আমরা ও-জালে জড়িয়ে

পড়িনি; এখন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারের যা-কিছু যোগ আছে সে শুধু তারের,—নাড়ীর নয়।

ইউরোপে সুরাসুর মিলে যে ভবসমুদ্র মন্থন কর্‌ছেন—তার ফলে অমৃতই উঠুক আর হলাহলই উঠুক—তার ভাগ আমরাও পাব; কিন্তু সে ভবিষ্যতে। সে বস্তু পান কর্‌বার পূর্ব্বেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনও কারণ নেই। বরং এই অবসরে আমরা যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখি তাহলে এর ভবিষ্যৎ-ফলাফলের জন্য আমরা অনেকটা প্রস্তুত থাক্‌ব।

এই সমরানলে যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে সে কথা সত্য। কিন্তু "বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা"র অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দেখতে পাই অনেকের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমন কি, কেউ কেউ এই উপলক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

আমার মতে ইউরোপের প্রতি অবজ্ঞার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এ অবশ্য রুচির কথা—সুতরাং এ ক্ষেত্রে মত-ভেদের যথেষ্ট অবসর আছে। মনোভাব প্রকাশ না করলেই যে সে ভাব মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা অবশ্য নয়। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা মুখে কি বলি তার চাইতে আমরা মনে কি ভাবি তার মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি; কেননা, সত্যের জ্ঞান না হলে মানুষে সত্য কথা বল্‌তে পারে না।

প্রথমতঃ কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি নবীন, কি প্রাচীন কোন সভ্যতাকেই এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটি বিপুল মানব-সমাজের পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে ও-রকম

এক-তরফা ডিক্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়। বহু মানবে বহু দিন ধরে কায়মনোবাক্যে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিতর যে মনুষ্যত্ব নেই এ কথা বল্‌তে শুধু তিনিই অধিকারী যিনি মানুষ নন। অপর পক্ষে "চরম সভ্যতা" বলে কোনও পদার্থ মানুষে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি এবং কখনও পারবে না। কেননা, পৃথিবী যে দিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে সে দিন মানুষের দেহমনের আর কোনও কার্য্য থাক্‌বে না—কাজেই মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে। অন্ততঃ পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত হয়নি—যা একেবারে নির্গুণ কিম্বা একেবারে নির্দ্দোষ। কোনও একটি বিশেষ সভ্যতার বিচার করবার জন্য তার দোষগুণের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক,—মনকে খাটানো দরকার। যখন আমরা আলস্যে অভিভূত হয়ে হাই তুলি তখনই আমরা তুড়ি দিই, সুতরাং আমরা যখন তুড়ি দিয়ে কোন জিনিষ উড়িয়ে দিতে চাই তখন আমরা মানসিক আলস্য ব্যতীত অন্য কোনও গুণের পরিচয় দিই না। এ সত্য অবশ্য চিরপরিচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যা চির-পরিচিত তাই চির-উপেক্ষিত।

(২)

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, যে মনোভাবের উপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাসমর হচ্ছে তার স্বাভাবিক পরিণতি; কেননা, এ যুগে ইউরোপ ধর্ম্মপ্রাণ নয়, কর্ম্মপ্রাণ,—সে দেশে আজ আত্মার অপেক্ষা বিষয়ের, মনের অপেক্ষা

ধনের মাহাত্ম্য ঢের বেশী। শিল্পবাণিজ্যের পরিমাণ-অনুসারেই ইউরোপে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করা হয় এবং সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে, মানবের ভ্রাতৃভাব নয় ভ্রাতৃবিরোধই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুদয়ের একমাত্র উপায়। অতএব এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপের আজ একশ বৎসরের কর্ম্মফল।

এ অভিযোগের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কতটা—তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

আমরা মানবসভ্যতাকে সচরাচর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করি—প্রাচীন ও নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনও বর্ত্তমান সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতা এক-অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক-অংশে নব্য ইউরোপীয়—তেমনি ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরোনো। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপের নব-মনোভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেতে পারে না, বরং তার পূর্ব্ব-সংস্কারকেই এর জন্য দোষী করা অসঙ্গত হবে না।

মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি করা যদি অসভ্যতার লক্ষণ হয় তাহলে ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের অপেক্ষা মধ্যযুগ ঢের বেশি অসভ্য ছিল। সে যুগে যুদ্ধপার্ব্বণ বারো মাসে তের বার হত এবং সে কালের মতে ওকার্য্যটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন—কিন্তু আসলে সেটি রক্তযুগ। আমরা আমাদের বর্ত্তমান মনোভাববশতঃই যুদ্ধকার্য্যটি হেয় মনে করি—প্রাচীন মনোভাব থাক্‌লে শ্রেয়ঃ মনে

করতুম। ইউরোপের নবযুগ অবশ্য একহিসাবে যন্ত্রযুগ কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগ যে মন্ত্রযুগ ছিল, তা নয়। যে হিসাবে মধ্যযুগ ধর্ম্মপ্রাণ ছিল সে হিসাবে নবযুগ ধর্ম্মপ্রাণ নয়। সে হিসাবটি যে কি, তা একটু পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মেরও ত্রিরত্ন আছে;—সে হচ্ছে খৃষ্ট, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ; এবং খৃষ্টিয়ানমাত্রেই নামমাত্র এই তিনের স্মরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুগভেদে এই তিনের মধ্যে একএকটি রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য হয়ে উঠে।

প্রথম যুগে (Primitive Christianity) খৃষ্টিয়ানের পক্ষে খৃষ্টই ছিল শরণ্য। মধ্যযুগে খৃষ্টের স্থান খৃষ্ট-সঙ্ঘ অধিকার করেন এবং ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন; সে সঙ্ঘ সে আধিপত্যের ভাগ খৃষ্টকেও দেন নি, ধর্ম্মকেও দেন নি। প্রায় একহাজার বৎসর ধরে খৃষ্ট-সংঘ মানবের বুদ্ধি ও আত্মাকে সমান অভিভূত করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংসারিক হিসাবেও এই সঙ্ঘ ইউরোপের রাজরাজেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। এই সঙ্ঘ মানুষের তনমনধনের উপর এই অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেছেন তার প্রমাণ মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

এই সঙ্ঘের ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম এক বস্তু নয়। সুতরাং এই সংঘের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করে ইউরোপের যে ধর্ম্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে এ কথা বলা চলে না। বরং পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দের যে ধর্ম্মবুদ্ধি (conscience) অধিক জাগ্রত হয়ে

উঠেছে তার প্রমাণ ইউরোপের সকল আইনকানুনে, সকল সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙ্গে পড়ে নি; মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে। সে তিন হচ্ছে—ইতালির রেনেসাঁস্, জর্ম্মানীর রিফর্‌মেশান এবং ফ্রান্সের রেভলিউসান।

গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যে-দিন নবজীবন লাভ কর্‌লে সেই দিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার কর্‌লে। মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখ্‌তে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব-আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চ্চাই তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে উঠল। যে প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত কর্‌তে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন—শিল্পে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, ইতিহাসে, বিকশিত হয়ে উঠল। এককথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্ত্তী যুগে জর্ম্মানী বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের আত্মারও আবিষ্কার কর্‌লে;—মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্ম্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্ম্মযাজকের মুখে নয়। খৃষ্টের ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃষ্টসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্ম্মানীর এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপের

মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষে আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্ম্মবুদ্ধি এবং এই রিফরমেশনের ফলে তার ধর্ম্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে; কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটল না।

তার পর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্য-যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে,—হারাল না। যে মনোভাবের উপর এ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তা শান্তির পক্ষে অনুকূল বই প্রতিকূল নয়। সামাজিক স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয় তার প্রমাণ এই যুদ্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের একএকটি জাতি যেন একএকটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযুগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কোন যুগের কোনও সভ্যতা একেবারে নির্দ্দোষ কিম্বা একেবারে নির্গুণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দর্য্য আছে এবং তার অন্তরেও গুপ্ত শক্তি নিহিত থাকে। যে ফুল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নবযুগে যে সকল মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলির বীজ মধ্যযুগে বপন করা হয়েছিল।

কিন্তু নবযুগের অলোক না পেলে সে সকল বীজ বড়জোর অঙ্কুরিত হত,—তার বেশী নয়।

ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক, সূর্য্যের আলো নয় যে তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্রদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানুষে নিজহাতে রচনা করেছে; সুতরাং ইউরোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহু চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে পদে পদে লড়াই করে নবযুগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। Reformationকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড়শ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসী-বিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় তা ইউরোপময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর" মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়ন—সমগ্র ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের স্বাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রুতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশ্বর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন একথা মনে করলে মানবসভ্যতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ একশ বৎসর পরে নেপোলিয়ানের এই বিরাট দস্যুতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সুফল হয়েছে এই যে, ফরাসী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেই সঙ্গে নেপোলিয়ানের militarismও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয়েছে—ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্পবিস্তর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই যে, কি-উপায়ে সভ্য সমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।

(৪)

এ সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা—কেননা, এক-পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যুদ্ধ কর্‌বার প্রবৃত্তি কমে এসেছে,—অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরস্পর যুদ্ধ কর্‌বার নূতন কারণেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ইউরোপের মুখে শান্তিবচন এবং হাতে অস্ত্র।

সকলেই জানেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল। শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার অর্থ হচ্ছে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করা। আর যুদ্ধের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে পরের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা। এ দুটি মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগেই দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অবজ্ঞা করে এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে ভয় করে। যে জাতির অধিকাংশ লোক শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত—সে জাতির যুদ্ধে প্রবৃত্তি না থাকাই স্বাভাবিক।

তার পর, শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর নেই। যুদ্ধ যে মানুষের সকল কাজকর্ম্ম, সকল বেচাকেনা একদিনেই বন্ধ করে দেয়—তার প্রমাণ ত আজ হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, যুদ্ধ জিনিষটি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিরোধী। আর এক কথা, হার্বার্টস্পেনসরপ্রমুখ দার্শনিকেরা

আশা করেছিলেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপের বৈশ্যসভ্যতা পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপন কর্‌বে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বাণিজ্যের যোগসূত্র পৃথিবীর সকল জাতির সখ্যসূত্রে পরিণত হবে। এই অন্নবস্ত্রের অবাধ আদান-প্রদানের ফলে প্রতি জাতির কাছেই বসুধা কুটুম্ব হয়ে উঠবে। এই কারণে এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ক্ষত্রিয় যুগের অপেক্ষা বৈশ্যযুগের সভ্যতা মানব-ইতিহাসের উন্নত স্তরের সভ্যতা। হার্বার্ট স্পেনসরের এই আশা যে, কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয় তার প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, আগে যেমন রাজ্য নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই কর্‌ত, আজ তেমনি বাণিজ্য নিয়ে জাতিতে জাতিতে লড়াই কর্‌ছে এবং এ লড়াই অতি ভীষণ এবং অতি নিষ্ঠুর। কারণ আগে মানুষ হাতে যুদ্ধ করত, এখন কলে যুদ্ধ করে। এই কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার, কেননা বাহু-বলের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রবলের ভিতর নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়, কেননা যুদ্ধ বৈশ্যধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

(৫)

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনও কারণে যুদ্ধ করাটা অকর্ত্তব্য মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। ইউরোপের নবযুগের নবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্ছে এই দুটি দেশ। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই ক্ষত্রিয়যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং

এঁদের দেহে রণসজ্জা থাকলেও মনে খাঁটি militarism নেই। অপর পক্ষে জর্ম্মানী হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ; militarism—জর্ম্মানীর যুগপৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বর্ত্তমান জর্ম্মানীর এরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী জর্ম্মানীর পূর্ব্ব-ইতিহাস।

প্রায় আটশত বৎসর ধরে ইউরোপে জর্ম্মানজাতির কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না—তার কারণ জর্ম্মানরা এই দীর্ঘকালের ভিতর একটি জর্ম্মান-রাজ্য কিম্বা একটি জর্ম্মানজাতি গড়ে তুলতে পারে নি। যে কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজ্য লাভ করেছিল সে কালে জর্ম্মানী শত শত পরস্পর-বিরোধী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ কতকটা জর্ম্মানীর কপালের দোষে, কতকটা তার বুদ্ধির দোষে। জর্ম্মানী সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত বলে, স্বদেশেও একরাট হতে পারে নি।

কোনও কোনও বৌদ্ধদেশে দুটি করে রাজা থাকেন;—একজন প্রকৃতিপুঞ্জের আত্মার প্রভু, আর-একজন দেহের। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে সমগ্র ইউরোপীয় মানবকে এইরূপ দুইছত্রের অধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পোপ ইউরোপের ধর্ম্মরাজের পদ এবং জর্ম্মানরাজ দেবরাজের পদ অধিকার করে বসেছিলেন। ইউরোপ একটি মহাদেশ এবং ইউরোপীয়েরা নানা বিভিন্ন জাতীয় সুতরাং ঐহিক কিম্বা পারত্রিক কোনও বিষয়ে একজাতি হওয়া যে তাদের পক্ষে অসম্ভব—এ কথা পোপও স্বীকার করেন নি, জর্ম্মান-সম্রাটও স্বীকার করেন নি। জর্ম্মানজাতি যে ইউরোপের অন্যান্য জাতি হতে মনে ও চরিত্রে পৃথক এ সত্য উপেক্ষা করবার

ফলে জর্ম্মানী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়্‌ল। স্বদেশ এবং স্বজাতির উপর কোনরূপ একাধিপত্য না থাক্‌লেও জর্ম্মান-সম্রাট তাঁর সম্রাট-পদবী এবং সাম্রাজ্যের আশা ত্যাগ করতে পারলেন না, এবং স্বজাতিকে নিয়ে একটি স্বরাজ্য গঠন কর্‌বার চেষ্টামাত্রও করলেন না। এই কারণে জর্ম্মানজাতির পূর্ব্বে কোনরূপ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ জর্ম্মানজাতির ভিতর কি দেহের, কি বুদ্ধির, কি চরিত্রের কোনরূপ বলের যে অভাব ছিল না—জর্ম্মান কাব্যদর্শনে শিল্পে সঙ্গীতে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে জর্ম্মানীর মহাপুরুষেরা লৌকিকরাজ্যের আশা ত্যাগ করে চিন্তারাজ্য অধিকার করাই নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মেনে নিলেন। সম্ভবতঃ জর্ম্মানজাতির ইতিহাস অদ্যাবধি ঐ একই পথ অনুসরণ করে চল্‌ত—যদি নেপোলিয়ান জর্ম্মানজাতিকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে পদদলিত না করতেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে Jenaর যুদ্ধে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবার পর জর্ম্মানমাত্রেরই এ জ্ঞান জন্মাল যে, জর্ম্মানীর খণ্ডরাজ্য সকলকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত না করতে পার্‌লে জর্ম্মানজাতির পক্ষে তার অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়্‌বে।

অসংখ্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাপকপ্রভৃতি চিরজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেও এ ব্রত উদযাপন করতে পারেন নি; কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Bismarck দুটি যুদ্ধের সাহায্যে জর্ম্মানজাতির প্রাণের আশা ফলে পরিণত করে-ছিলেন। বিসমার্ক অষ্ট্রীয়াকে পরাভূত করে উত্তর জর্ম্মানীর এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করে দক্ষিণ জর্ম্মানীর যোগসাধন

করেন। বিসমার্ক বলতেন যে, রক্ত ও লৌহের রসান্ দিয়ে তিনি ভাঙ্গা জার্ম্মানীকে যোড়া দিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে—এই হচ্ছে নবজর্ম্মানীর দৃঢ়ধারণা।

যুদ্ধকার্য্য অপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার্থ যে তা করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে ইংরাজ ফরাসীপ্রভৃতি ইউরোপের অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। জর্ম্মানদের সঙ্গে আর-সকলের প্রভেদ এইখানে যে, জর্ম্মানীর কর্ত্তৃপক্ষদের মতে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে তরবারি।

জর্ম্মানীর যোদ্ধাদলের মুখপাত্র জেনারেল বেয়ারণ হার্ডি অতি স্পষ্টাক্ষরে দুনিয়ার লোককে, জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতির মূল কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এই :—জর্ম্মানজাতি গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তার থেকেই প্রমাণ হয় যে, কি বাহুবলে, কি বুদ্ধিবলে সে জাতির সমকক্ষ দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে নেই। জর্ম্মানীর শ্রীবৃদ্ধি তার বাণিজ্যবিস্তারের উপর নির্ভর করে। যদিচ ভবের হাটে কেনা-বেচার জন্য জর্ম্মানজাতিই হচ্ছে জ্যেষ্ঠ অধিকারী—তবুও এ ক্ষেত্রে সকলের শেষে উপস্থিত হওয়ার দরুণ সে আজ সর্ব্বকনিষ্ঠ, কেননা পৃথিবীর সকল হাটবাজার আজ অপরের সম্পত্তি। পরের হাটে কেনাবেচা করার অর্থ পরভাগ্যোপজীবী হওয়া; সুতরাং এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জর্ম্মানী অপরের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন

উপায়ে জর্ম্মানীর পক্ষে তার জাতীয় স্বার্থসাধন করা অসম্ভব। অতএব militarism হচ্ছে নবজর্ম্মানীর একমাত্র ধর্ম্ম।

জেনেরাল বেয়ারণ হার্ডি যে স্পষ্টবাদী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দস্যুতাকে ধর্ম্ম বলে প্রচার করতে লোকে সহজেই কুণ্ঠিত হয়। ওরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে হলে অপর দেশের লোকে অনেক বড় বড় নীতির কথায় তাকে চাপা দেয়।

কিন্তু জর্ম্মান-রাজমন্ত্রী কিম্বা জর্ম্মান-রাজসেনাপতির পক্ষে এ বিষয়ে কোনরূপ কপটতা করবার প্রয়োজন নেই—কেননা, জর্ম্মানীর রাজ-গুরুপুরোহিতেরা যে নবশাস্ত্র রচনা করেছেন—জর্ম্মানীর রাজ-পুরুষদের রাজনীতি সেই শাস্ত্রসঙ্গত।

জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের মতে ডারউইনের আবিষ্কৃত ইভলিউ-সনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—"জোর যার মুলুক তার"। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে মানুষে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনটা যখন একটা মারামারি কাটাকাটি ব্যাপার তখন যে মারতে প্রস্তুত নয় তাকে মরতে প্রস্তুত হতে হবে—এই হচ্ছে বিধির নিয়ম। ইভ-লিউসানের এই ব্যাখ্যা, Nietzsche-নামক একটি প্রতিভাশালী লেখক সমগ্র জর্ম্মানজাতিকে গ্রাহ্য করিয়েছেন। Neitzscheর মতে দয়া মমতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনোভাব মানসিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা এ সকল মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে মানুষের প্রকৃতি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্ব্বলতাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পাপ এবং সবলতাই এক মাত্র পুণ্য;—শক্তিই হচ্ছে একমাত্র সত্য শিব ও সুন্দর। ইউরোপীয় মানব যে এই সহজ সত্য ভুলে গেছল তার কারণ

ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মনামক রোগে জর্জ্জরিত। খৃষ্টধর্ম্ম যে এসিয়ায় জন্মলাভ করেছে তার কারণ—এসিয়াবাসীরা দাসের জাতি, সুতরাং তাদের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম দাসমনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এসিয়ার cancer ইউরোপের দেহ হতে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইউরোপের নব-যুগের সাম্য মৈত্রীপ্রভৃতি মনোভাব ঐ প্রাচীন রোগের নূতন উপসর্গ মাত্র। সুতরাং ফরাসী ইংরাজপ্রভৃতি যে সকল জাতির দেহে এই সকল রোগের লক্ষণ দেখা যায় তাদের উচ্ছেদ করা জর্ম্মান ক্ষত্রিয়দের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। Nietzscheর এই মত জর্ম্মানজাতির মনে যে বসে গেছে তার কারণ Nietzche কালি-কলমে লেখেন নি, তার প্রতি অক্ষর বাটালি দিয়ে খোদা।

জর্ম্মানপণ্ডিতদের মত—কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, লোক-হিতের জন্যও, জর্ম্মানীর পক্ষে দিগ্বিজয় করা আবশ্যক। জেনেরাল বেয়ারণহার্ডি বলেন german labour এবং german idealismএর প্রচার ব্যতীত মানবজাতির উদ্ধার হবে না। সুতরাং যেমন তরবারির সাহায্যে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে জর্ম্মান মাল গ্রাহ্য করাতে হবে তেমনি ঐ একই উপায়ে জর্ম্মান তত্ত্বকথাও গ্রাহ্য করাতে হবে। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

এস্থলে জর্ম্মান-idealism এর অর্থ কাণ্টপ্রভৃতির দর্শন নয়; কেননা, বেয়ারনহার্ডি কাণ্টপ্রমুখ দার্শনিকদের অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বেয়ারনহার্ডির মতে এই সকল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিষয়-বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তারা বিশ্বমানবের কাছে শান্তির বারতা ঘোষণা করেছিলেন। জর্ম্মানী আজ তাই

তার নব-idealism প্রচার কর্‌তে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জগতে নব্য-পন্থীদের সার কথা এই যে, বৈশ্য সভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। বৈশ্য-যুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে। মানুষ বিষয়প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে আত্মার অপেক্ষা দেহকে প্রাধান্য দেয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে—মানবজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তোলাই এ সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। ভয় না থাক্‌লে ভক্তি থাকে না, অথচ বর্ত্তমান সভ্যতা জনসাধারণকে রাজভয় দস্যুভয় ও মৃত্যুভয় এই ত্রিবিধ ভয় থেকে মুক্ত করেছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা অবশ্য জীবনধারণের জন্য আবশ্যক কিন্তু অর্থকেই জীবনের সার পদার্থ করে তুললে মানুষ অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার জন্য সামাজিক জীবন আবার বিপদসঙ্কুল করে তোলা দরকার। এ যুগে এক যুদ্ধব্যতীত অপর কোনও উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। অতএব ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় শাসনাধীন করা আবশ্যক; কেননা, বৈশ্যবুদ্ধি যুদ্ধের প্রতিকূল। এবং ইউরোপের রাজনীতি ক্ষাত্রধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার ক্ষমতা একমাত্র জর্ম্মানীর আছে; কেননা জর্ম্মানীর বৈশ্যশূদ্রের আজও কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং অর্থরাজ্যের উচ্ছেদ করে পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন কর্‌বার ভার জর্ম্মানীর হাতে পড়েছে। এই কারণে যুদ্ধ করা জর্ম্মানীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। জর্ম্মানীর নব-militarismএর প্ররোচনাই এই যুদ্ধের সাক্ষাৎ কারণ।

এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক militarism ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়, প্রতিবাদমাত্র। জর্ম্মানীর পরশ্রীকাতরতাই এর যথার্থ মূল, এবং এ মূল জর্ম্মানীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে রস সঞ্চয় করে। জর্ম্মানীর বর্ত্তমান উচ্চ আশার ভাষা নতুন হলেও তার ভাব পুরাতন। মধ্যযুগে জর্ম্মানী একবার ইউরোপের সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তিত্ব পদ লাভ করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছিল; আশা করি এবারেও হবে। জর্ম্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে কিন্তু বিসমার্কের হাতে-গড়া জর্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই; সুতরাং জর্ম্মানীর দিগ্বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে না; কারণ militarism সে সভ্যতার গৃহশত্রু।

ইউরোপের সকলজাতির দেহেই এই militarism অল্পবিস্তর স্থান লাভ করেছে; একমাত্র জর্ম্মানী তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জর্ম্মানীতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে এই বরফের কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে militarism ভস্মসাৎ হয় তাহলে যে, কেবল অপরজাতি সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্ম্মানীও পরিবর্দ্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট, হেগেল, গেটে, শিলার, বেটোভেন, মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই militarism-এর

মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।

Militarism হেয় বলে বর্ত্তমান বৈশ্যসভ্যতাই যে শ্রেয় একথা আমি বল্‌তে পারি নে। কোন সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়,—বৈশ্য সভ্যতাও নয়। তবে কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার দোষগুণ বিচার কর্‌তে হলে তার অতীতের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা চাই, তার ভবিষ্যতের প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। বর্ত্তমান যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলমাত্র—এ কথা ভোলা উচিত নয়। বর্ত্তমানের যে-সকল দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার নিরাকরণ হবার আশা আছে কি না, এ সভ্যতা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় রোগমুক্ত হতে পারবে কি না,—এই হচ্ছে আসল জিজ্ঞাস্য। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সে শক্তি আছে। সে যাইহোক, বৈশ্যসভ্যতার রোগ-সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ,—জর্ম্মানীর অস্ত্রচিকিৎসা নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মত সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন !
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে ?

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-ঊষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি !

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কতকাল !

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে!
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে;
পথের দু'ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশিরবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!

কি প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত

তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতামাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;

কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি !
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যাঠামশায়

(১)

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি এ ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;—তাই এক-মুহূর্ত্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মত, বিনাকারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহবা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে আবার অকারণে কেহবা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্ব্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটুকথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম

চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি ;—কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ্য করিয়া এমন সব কুৎসা উঠিল আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুস্কিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহবা তার পাড়াপড়শি, কেহবা তার কোনো একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য ; আমি আরো তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর শিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না।—তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা-পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কি যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কি।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া লাভ কি?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন্ মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল—ওরা ত মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে

কাজ করিতে পারে না। শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামী কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও-বেটার কাঁপুনি টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েসি।—আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা—তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা কোনো দামী কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে সেটাতে আমার অধিকার নাই—আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য ?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নীচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে শচীশ কখনই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশসম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্ত্তির মত শাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক-ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি শচীশ সোনার বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতিহিসাবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর নাস্তিককে নর-ঘাতকের চেয়ে—এমন কি, গোখাদকের চেয়েও, পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি—যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনোজন্মে সোনার বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে,—ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালী ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো, শিক্ষকতার কুলি-মজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা; এই জন্য মিলটন শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন মার্জ্জারজাতীয় চতুষ্পাদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ী যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রং কটা আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল—সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চ্চারও

অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

(২).

মত এবং আচরণসম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্ব্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ-ডোবানই বড় ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্ম্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম্ম ছিল। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন :—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া ;—

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই ; —

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই ;

অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশকোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্ব্বেই তিনি ম্যালথস্ পড়িয়াছিলেন ; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোট ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের এম্‌নি উল্‌টা প্রকৃতির যে সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড় ভাই এবং ছোট ভাই তেমনি বিপরীত, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধূলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরুপুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্ব্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড় বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না কিন্তু তিনি যে বড়ই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবী করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এইভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্পবয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবা যত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর

দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুরদেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন—থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন,—গো-ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উল্টা দিকে। কারো কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্ব্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুসি ছিলেন। কেননা জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজিভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারো মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারো মতে বাংলার জন্‌সন্। শামুকের খোলার মত তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া

পাহাড়ে-ঝরণার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্ কোন্ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্য্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড় ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্ব্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছলছল করিত—তাঁর মনে হইত কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না—সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্পবয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই ত থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল্ বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মত জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামীতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির

কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে শ্রীচরণেষু পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন: মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কি বলা হয় তা আমিও জানিনা তুমিও জাননা অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাৎ করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয় কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগ্‌লামি; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্ব ঘটিত পরিচয়সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোল্‌তার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোল্‌তা তাড়ানো যায়, তেমনি এসব কথায় লজ্জা-করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

(৩)

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

কিন্তু মাছ তখন টোপও গিলিয়াছে বঁড়শিও তাকে বিঁধিয়াছে;—তাই একপক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন—দাদার সম্বন্ধে রং-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মতবিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুরগি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন; কিন্তু ইঁহারা এতদূরে গিয়াছিলেন যে মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা;—সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো-করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিষের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে" আপনার গরজটা কি?—তিনি বলিতেন, কোনো গরজই নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্‌ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানিনা বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

"অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের" প্রধান চেলা

ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড় আড়ৎ। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠরকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয় গেলেন যে হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মত জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উল্টা ফল হইবে এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক-সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুৎপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্য্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেষকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম—কিন্তু আমার ত পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ আমি কথা কই না—আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর ?

হাঁ আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়— তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা ?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা: তাহাদের আশ্চর্য্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি;—দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুসি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া-গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল আজ সে একটা বিষমকাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কত বড় জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভীতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না। শচীশকে আসিয়া

গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল—একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। . .

(৪)

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর-বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্ম্মী আচারভ্রষ্ট এবং সেই কারণে সেবায়েৎ হইবার অযোগ্য এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না,—পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন তিনি দেবদেবী মানেন না; খাদ্য অখাদ্য বিচার করেন না, মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুন্সেফ জগমোহনকে সেবায়েৎ পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিঁকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে ঠাকুরকে মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মত বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মত ধর্ম্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কি?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে ত খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা ত প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোর বেলা হইতে ঢাকঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না—সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কি হে?—জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে তারি এই বাজনা।—দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসনবাটির মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম্মসম্বন্ধে যেমনি হউক্ খাওয়াপরা টাকাকড়িসম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির

দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগ্যে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই যে সয়তানী চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কত বড় চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুড্‌বাই শচীশ!

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল—তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল, তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, অধিকতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের

সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিষপত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সেদিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারম্বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাফালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট-টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৫)

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা

ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কি ?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননীবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো-ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননীবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননীর পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাষ্টারী করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর দুয়ার। তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এদিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন ত একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনি তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন্। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ ত, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর ? কিন্তু বইগুলো ?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনি লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মত জড়সড় হইয়া মেয়েটি এককোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন—এস আমার মা এস! ধূলায় কেন বসিয়া?

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না—তাঁর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে, সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এত বড় বোঝা কে চাপাইল?

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না—আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগ্‌লা জগাই বলিত—আজও আমি সেই পাগল আছি।—বলিয়া জগমোহন নিঃসঙ্কোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন—মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধূলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষফুলের মত মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য ত ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মত ভয়, তার সমস্ত দেহ-লতাটির

মধ্যে লজ্জার সঙ্কোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা ত কোথাও নাই।

ননীবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখ আমার ঘরের শ্রী! সাতজন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উল্টাপাল্টা; আর আমার কথা যদি বল কখন্ নাই কখন্ খাই তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগ্‌লা জগাইও মানুষের মত হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্ব্বে ননীবালা অনুভব করে নাই—এমন কি, মা থাকিতেও না। কেন না, মা ত তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত—সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোট ছোট কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননীবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কি করিয়া?

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননীবালাকে কোথাও কিছু সঙ্কোচ করিতে দিলেন না। ননীর বড় ভয় ছিল, জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না—সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না—সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না এই তার পণ।

জগমোহন জানিতেন এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননীও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দুচার দিনের মধ্যেই সুরু হইল। ঝি আগে মনে

করিয়াছিল ননী জগমোহনের মেয়ে—সে একদিন আসিয়া ননীকে কি সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননীর মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল—কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক আমার জ্যোৎস্নায় ত দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি এ কি কাণ্ড জগাই? পাপ বিদায় করিয়া দে!

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্ম্মিক তোমরা এমন কথা বলিতে পার কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কি হইবে?

কোনো-এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে;—টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাঁসপাতালে পাঠাইব হরিমোহনের এ কেমন কথা?

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস্ কাকে রে?

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে ত আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার ত কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্ব্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেয়ালের ওপাশেই বাপপিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে ইহা সহ্য করা যায় কি করিয়া?

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে একথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সেকথা তিনি সর্ব্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সে জন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভালোকাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান।—জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মত অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননীবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল—দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননীকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—তাই বটে! তুই এখানে!

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননীর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিম্বা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল—ননী!

এমন সময়ে জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—বেরো আমার ঘর থেকে বেরো!

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননীর দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কি। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন শচীশ জানিত পুরন্দরই ননীকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এই জন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত কলিকাতা সহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননীর নিস্তার নাই একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারৎপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননী একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননীকে অর্দ্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার

আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল একে ত শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননীকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ ত কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর একপ্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে ইহা তাঁর কাছে বড়ই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননীর একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী-কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে সে আর সেদিকে ঘেঁষিল না।

ননী দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মত হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্টমাসের ছুটি। জগমোহন একমুহূর্ত্ত ননীকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মত প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই

যুবকটি বলিল, আমি ননীর ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন। অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড লজ্জা নাই তোমার? ননীকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও আর সর্ব্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননীর ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননীর মামাতো ভাই বটে। শচীশই যে ননীর পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননী মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননীকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা সহরে চলিয়া যাই—সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব—যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও-মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে। আমি ননীকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইনমতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর-কখনো তিনি করেন নাই।

(৬)

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিতেছি?

জগমোহন কহিলেন, সর্ব্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মত—তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?

শচীশকে আমি ছেলের মত করিয়াই মানুষ করিয়াছি—আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি—আমার আয়ের অর্দ্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি—আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে! তুমি তোমার এঁটো-পাতের অর্দ্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মত ধার্ম্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো—আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—এ কি শুনি? তোর কি

মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার সখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্ম্মজ্ঞান একটুও নাই? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মত, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—স্ত্রীর মত? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল-পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মত বলিয়া বেড়াইতেছে যে শচীশ যদি ননীকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে ত আপদ চোকে কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করে তা নয় অথচ তার ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননীকে এড়াইয়া চলিত—একলা ত একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে নিরালায় একদিন ননীর সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননীকে বলিলেন, মা, আমার মনের মত করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননী লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

না, মা, লজ্জা করিলে চলিবে না—আমার বড় মনের সাধ আজ তোমার সাজ দেখিব—এ তোমাকে পূরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুম্‌কি-দেওয়া বেনারসি সাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননীর হাতে দিলেন।

ননী গড় হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন—এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না। আমি না হয় বয়সেই বড় হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়।—এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন—ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননী তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্ব্বাদে শিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননীর মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন—ননীর দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননীর দেহ পড়িয়া আছে,—তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন, সেইগুলি পরা—হাতে একখানি চিঠি। শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন—

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ কর। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। পাপিষ্ঠা ননীবালা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারতঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

নাই নাই, নাই যে সময়!
হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ ,
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
• করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে ,
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলিপরে।
বন্দীরা গাহেনা গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায়না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
মরে' গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই ?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার

আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
একঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবনউৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা' ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পথধূলি পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্ব্বত।
আজি তার রথ

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা

(ফরাসী হইতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্তৃক অনূদিত)

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্তূপাকার প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলীর পরিচয় লইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। সময়ের অভাবে না হউক, —এ বিষয়ে রুচির অভাববশতঃ সে পরিচয় লাভ করা আমার ভাগ্যে কখন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। Paul de Saint Victor উক্ত সাহিত্যসম্বন্ধে রসিকতাচ্ছলে এই কথা বলিয়াছেন যে,—"অনিয়মই তাহার নিয়ম।" তাঁহার মতে "য়ুরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় মনোভাবের মধ্যে শতকোটি ভীষণ দেবতার ব্যবধান।"

গীতাঞ্জলি আয়তনে ক্ষুদ্র, ইহাই আমার মতে তাহার একটি প্রধান গুণ। আর-একটি গুণ এই যে, এই পুস্তক কোনপ্রকার পুরাণপ্রসঙ্গে ভারাক্রান্ত নহে। আর-একটি গুণ এই যে, এ কবিতা পড়িবার জন্য কোনপ্রকার পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নাই। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার ধারার সহিত ইহার কোন্ সূত্রে যোগ, সেটি নির্ণয় করার লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনের সহিত তাহার সম্পর্ক কি, সে আলোচনার মূল্য অনেক বেশী।

প্রশংসাভিন্ন কিছু হাতে রাখিব না এই ভাবিয়া, বইখানির যেটি মস্ত দোষ সেটি প্রথমেই নির্দ্দেশ করিতেছি; যতই ছোট হউক, উহার গঠন ভাল নহে। এ রচনাতে যে আমাদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ছন্দ মাত্রা ও যতির নিয়মভঙ্গ ঘটিয়াছে, অবশ্য

এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু গ্রন্থশেষে একটি ক্ষুদ্র টীকাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, গীতাঞ্জলি খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গানের সমষ্টি, এবং সে খণ্ডগুলি পরস্পরসম্বদ্ধ নহে। ইহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কবিতা প্রথমতঃ বাঙ্গলায় তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয়,—নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি; শেষোক্তের নামে এই মালার নামকরণ করা হইয়াছে। মাসিকপত্রাদিতে এখানে ওখানে সময়ে সময়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এমন অন্যান্য কবিতাও ইহাতে আছে। সেগুলি যেন যদৃচ্ছারোপিত। অপরাপর শ্রেণীবদ্ধ কবিতার মধ্যে এই সকল ইতস্ততঃপ্রক্ষিপ্ত কাব্যখণ্ড ভাবের ধারাবাহিকতায় বাধা দেয়, এবং চিত্তকে হেলায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

অতএব গীতাঞ্জলির বৈষম্য ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই পাদ-টীকাটির আবশ্যক ছিল না; উহা যে এক-নজরেই চোখে পড়ে শুধু তাহাই নহে, যেন চোখে আঙ্গুল দেয়। প্রথমে হয় ত ইহাতে মনে আঘাত লাগে, কিন্তু ক্রমে যেন কিঞ্চিৎ আমোদও বোধ হয়। সত্য বলিতে কি, কবি এ গ্রন্থে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ধরা পড়িয়াছেন বলিয়া আমার বড় ভাল লাগে। গঙ্গাতীরে যিনি এমন খ্যাতনামা কবি, তিনি চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে নিজের কবিতার ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন,—অথচ একযোগে একটি পুস্তক পূর্ণ করিতে পারেন এমন সঞ্চয় তাঁহার নাই।

ইহা কি কম কৌতুকের বিষয় যে, ইংরাজ সম্পাদক যে ছোট পেয়ালাটি অগ্রসর করিয়া ধরিলেন, তাহা ভরিয়া তুলিতে

এবার অন্ততঃ বিশাল ভারতবর্ষের ভাবের বিপুল স্রোতকে তিনবার, চারিবার, এমন কি পাঁচবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে!

মহাভারতের ২১৪,৭৭৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভারের বদলে সার,—এ পরিবর্ত্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।

আমি আবার কবিতাগুলির খাপছাড়া-ভাবের উল্লেখ করিব। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অতি সন্তর্পণে বাদ দিয়া এই বিসদৃশ ভাবটি ক্রমশঃ কমাইয়া আনিয়া যত শীঘ্র পারি বইখানির প্রাণস্পর্শী মর্ম্মটুকুসম্বন্ধে অলোচনা করাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। সেই জন্য আমি প্রথমে ঠাকুরমহাশয়ের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গীতাঞ্জলির আবির্ভাবের পরে আর-দুইখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি,—The Crescent Moon,—শিশুপাঠ্য বা শিশুসম্বন্ধীয় কবিতাসংগ্রহ। তাহাতে আমরা গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতার আবার দেখা পাই। সেগুলি যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর তাহা নয়, কিন্তু সম্প্রতি সেগুলি নানাস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে (LX, LXI ও LXII)।

"জগৎপারাবারের তীরে"
"খোকার চোখে যে ঘুম আসে"
"রঙিন খেলনা দিলে ওরাঙা হাতে"—শিশু।

The Gardener-নামক আর-একটি গ্রন্থ গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদ্যমালাটি ঠিক যৌবনকালে না হউক, অন্ততঃ গীতাঞ্জলির বহু পূর্ব্বে রচিত, এ কথা ভূমিকায় লেখা আছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত কবিতাগুলির তারতম্য বিস্তর; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যে গুটিকতক প্রণয়-কবিতা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ কবিতার যে ভগবৎ-প্রেম, ইহা সে প্রেম নহে; ইহা মানবীয় প্রেম, এমন কি ইন্দ্রিয়জ প্রেমও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যেও এমন একটি অতীন্দ্রিয় ভাব আছে, যে, এই শ্রেণীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :

"কাছে যাই ধরি হাত বুকে লই টানি"—
হৃদয়ের ধন—মানসী।

এই গ্রন্থের অপর-অনেক কবিতা সম্পূর্ণ আর-এক ধরণের। সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, এবং তাহাতে ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া যেন একটু তফাতে সরাইয়া একটি মঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই রঙ্গমঞ্চে সেটি অভিনীত হয়, এবং একটি হাল্কা নীতিসূত্রে গাঁথিয়া কখন কখন কথোপকথনচ্ছলেও সেটি ব্যাখ্যা করা হয়। গীতাঞ্জলির কতকগুলি নিরেস কবিতাও এই ছাঁচে ঢালা। এই প্রণালীটি যে আমার বিশেষ মনঃপূত তাহা বলিতে পারি না। জ্ঞানের কথা বা ভাবের কথাকে এইপ্রকার অকিঞ্চিৎকর নীতিকথার রেজ্‌কিতে পরিণত করা সকল সময়ে সুফলপ্রদ নহে। ইহার কোন কোনটি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বড়পাদ্রী Schmidt সাহেবের ছোট গল্প স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জাতীয় কবিতার

দৃষ্টান্তস্বরূপ LI. ও XXXI-সংখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর-একটি গূঢ় কবিতায় যোদ্ধা বর্ম্ম ও তীরের কথা আছে, সেটিও এস্থলে মোটেই মানানসই হয় নাই,—এবং কেবলমাত্র কলেবরবৃদ্ধি ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বোঝা কঠিন। এটি একেবারে স্থানচ্যুত হইলে আমি ত কোন আপত্তির কারণ দেখি না। অপরপক্ষে নিম্নলিখিত নীতিকথাদ্বয় আমি সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। (LXXVIII. ও L.)

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন সৃষ্টি করার কাজে"

"হারাধন"– খেয়া।

এই কবিতাটির বহুদেব-বাদ গীতাঞ্জলিতে অশ্রুতপূর্ব্ব, এবং সহসা মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ বহুদেব-বাদ নহে, আপাতদৃষ্টে সেরূপ মনে হয় মাত্র। যে ঋগ্বেদ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পুঁথি, এবং যাহার ভাষা তখনো সংস্কৃত নামে অভিহিত হয় নাই, সেই ঋগ্বেদের এই সুন্দর শ্লোকটি যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা ইহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না :—

"এ সকল কথা কে জানে? কে-ই বা আমাদের কাছে বলিতে পারে? জীবগণ কোথা হইতে আসে? এই সৃষ্টি কি? দেবগণও তাঁহা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তিনি,—কে জানে তাঁহার অস্তিত্ব কিরূপ?"

দ্বিতীয় কবিতাটি এই :—

"ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম গ্রামের পথে পথে"—

"কৃপণ"—খেয়া।

এই কবিতাটি আর-একদিকে অপর-একটি দীর্ঘ শ্রেণীর অন্তর্ভূ্ত। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। এ কবিতাগুলি গীতাঞ্জলি হইতে অনায়াসে পৃথক করিয়া লওয়া যায়,—যে হিসাবে Heineর "Buch der lieder" হইতে "Heimkehr"মালা অথবা "Lyrisches Intermezzo" পৃথক করা সহজ। Mussetর কবিতার একটি পুরাতন নামে উক্ত কবিতাবলীর নামকরণ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়—"ভগবানে ভরসা"; অথবা "ঈশ্বরের প্রতীক্ষা" বলিলে আরও ভাল হয়।

ভাবে মনে হয় ঠাকুরমহাশয়ের দুইটি নাটকের মধ্যে একটি ভাঙ্গাইয়া, কবিতা ও গানে রূপান্তরিত করিয়া এইগুলি রচিত। তন্মধ্যে প্রথম নাটকটি প্রথম যৌবনে প্রণীত ও মহাভারত-প্রণোদিত। দ্বিতীয়টিই সম্প্রতি আলোচ্য। সেটির চেহারা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং উল্লিখিত কবিতাশ্রেণীর সহিত একভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হয়। তাহার নাম "ডাকঘর"। ইহাতে আমরা একটি রুগ্ন বালকের সাক্ষাৎ পাই। সে রাজার চিঠি পাইবার উদ্বিগ্ন আশায় ও প্রতীক্ষায় জীবন ধরিয়া রহিয়াছে। ছেলেটি জানলার ধারে বসিয়া থাকে ও পথিকদিগকে প্রশ্ন করে। তাহারাও কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে,—প্রথমে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত; কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই বালসুলভ কথোপকথন তাহাদের মনের ভার লাঘব করে। তাহারা স্পষ্টতঃ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া যায়। এই যে চিঠির জন্য ছেলেটি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, সে চিঠি আসে, আসে, আসে না। অবশেষে যখন ছেলেটি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত তখন রাজা নিজে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি

নিজের পরিচয় দেন না, কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিতে পারে। নিম্নলিখিত ছোট কবিতাটি যেন উক্ত অপূর্ব্ব নাটকের পৃষ্ঠাপার্শ্বে লিখিত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"

—গীতিমাল্য (৭)

এটি যে কবিতাশ্রেণীভুক্ত, তাহাতে প্রতীক্ষার সকলপ্রকার দশা বা রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি শ্লোক এমন-একটি অন্তরঙ্গ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, যে, সেগুলি কখন কখন Bach এর এক একটি সুর মনে করাইয়া দেয়। (XLV, XLVI, XLVII, এবং XL,)

এক একবার মনে হয় যে, এ প্রতীক্ষা প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা; কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তাহা উদ্বেলিত আধ্যাত্মিক রসে পরিণত হয়। এই কবিতাগুলির কোন কোনটিতে সহসা একটি স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম দেখিয়া আমরা ধরিতে পারি যে বক্তা স্ত্রীলোক। কিন্তু এই কবিতার শ্রেণী যে কোথায় আরম্ভ ও কোথায় শেষ, তাহার কোনরূপ চিহ্ন নাই; এবং যেহেতু ইংরাজী ভাষায় বক্তা স্ত্রী কি পুরুষ সে কথা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখা যায় সেই জন্য ফরাসী-অনুবাদকের সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেননা ফরাসী ভাষার ব্যাকরণে পদসমূহের সঙ্গতির নিয়ম অধিকতর সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ স্থলে গানগুলি সেই আত্মার গান, যাহার কোন লিঙ্গ নাই।

"কথা ছিল একতরীতে কেবল তুমি আমি"

—গীতাঞ্জলি (৮৪)

এক্ষেত্রে সহজেই বোঝা যায় যে, যে নৌ-যাত্রার কথা হইতেছে, তাহা আধ্যাত্মিক যাত্রা, অথবা সেই যাত্রা যাহার উদ্দেশে কবি Baudelaire বলিয়াছেন ঃ—"হে মৃত্যু! বৃদ্ধ কাপ্তেন, এবার নোঙর তোল",—'সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন খুলিতে হবে।' ইহারই প্ররোচনায় ঠাকুর-কবির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং অভিনব গীতিকবিতা রচিত, যদিও Baudelaireএর ভাবের সঙ্গে তাঁহার ভাবের কিছুমাত্র মিল নাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আলোচ্য পুস্তকের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এবং আশপাশের খণ্ড-কবিতাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছি। জীবনের নিকট বিদায়সূচক কবিতা বাদে এখন আমার সমুখে যাহা আছে, তাহা প্রায় সবই অতীন্দ্রিয়-জগতের বস্তু।

তবু, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, আমি আবার আলোকের দুইটি স্তব পাঠ করিতে চাহি,—সেগুলি এত সুন্দর যে ভোলা যায় না। এ পুস্তকে এ দুইটি স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু একত্র করাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ঃ—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো"
"আলো আমার আলো"

এই খণ্ড-কবিতাযুগ্ম যে পরস্পরসম্বদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বলিয়াছি, এগুলি একত্র করা স্বাভাবিক; কিন্তু আবার বলি, না,—যেটি যেখানে আছে সেইখানে থাকাই ভাল। প্রথমটি এখনো আকুলতাপূর্ণ; ইহা সেই শ্রেণীতেই থাকুক্ যাহাতে আত্মার উদ্বিগ্ন ব্যাকুল প্রতীক্ষার ভাব প্রকটিত; যেন জীবাত্মা এখনো পরমাত্মাকে মায়ার এপারে খুঁজিয়া ফিরিতেছে,—এখনো তাঁহার সহিত যুক্ত

হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মানন্দে উদ্বেলিত অন্তরাত্মার বিজয় সঙ্গীত।

এই যে আকুল আনন্দ, উৎসের ন্যায় উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত হইতেছে, দিবসের ন্যায় আলোক ও উত্তাপ দিতেছে,—ইহার গোপন রহস্য কি? এই সত্য কি?—যাহা আত্মাকে একাধারে পুষ্ট ও মত্ত করিয়া তোলে? ইহা কি ব্রাহ্মণ্য দর্শনশাস্ত্রের ফল? ইহা কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম? না, তাহা নহে; ইহা সেই শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, সেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। কারণ, যে গ্রন্থে তাঁহার বক্তৃতা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাবৃত্ত হিসাবে আদরণীয়, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা প্রাণসম মূল্যবান।"

এ কবিত্বের এই যে ব্যগ্র প্রাণপূর্ণ ভাব,—ইহাতেই আমি যুগপৎ হাসি ও কান্নায় অভিভূত হই। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানপ্রধান ও তত্ত্বসর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকি, এই কবিতায় যেন তাহাকে প্রাণের স্পর্শে কম্পিত এবং হৃদয়ের আবেগে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। Pascal তাঁহার "Mystere de Jesus"তে যে ব্যাকুল স্পন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও সেই জাতীয়,—ইহা কেবল আনন্দের স্পন্দন।

"যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে"

—গীতাঞ্জলি (১৩৫)

বিশ্বপ্রাণের অনুভূতি, এবং সেই প্রাণে যোগ দিবার অনুভূতি হইতে এ আনন্দ স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়।"
—নৈবেদ্য (২৩)

প্রথমে আমরা ইহাতে একটি অদ্বৈত ভাব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়" Faustএর আরম্ভেই যে জাগরণ-ব্যঞ্জক উক্তি আছে, তাহাতে আমরা ইতিপূর্ব্বেই এই একই ভাবের সুন্দর প্রকাশ দেখিয়াছি ঃ—

"উষাদেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবার জন্য জীবনের স্পন্দনে নূতন বেগের সঞ্চার হইয়াছে। হে ধরণী! তুমিও গতরাত্রে সমভাবেই অবস্থান করিয়াছিলে, এখন আমার পদতলে বিশ্রামান্তে নূতন প্রাণবায়ুর নিঃশ্বাস লইতেছ, এবং ইহারই মধ্যে আমাকে ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন করিতেছ। এই মহৎ সঙ্কল্প তুমি আমার মনে জাগরিত এবং উদ্দীপিত করিতেছ,—যেন শ্রেষ্ঠতম জীবন লাভে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকি।"

অন্যত্র, পর্ব্বত হইতে নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়া Faust যে স্বগতোক্তি করেন, তাহার শেষভাগে বলিতেছেন ঃ—

"সোপান হইতে সোপানান্তরে নির্ঝরিণী ঝরিয়া পড়িতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শতসহস্র ধারায় বিভক্ত হইতেছে, উচ্ছ্বসিত ফেণপুঞ্জ বাতাসে উচ্চৈঃস্বরে বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য হইতে উদ্ভূত, পরিবর্ত্তনশীল, বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু কি-অপরূপ ভঙ্গীতে হেলিয়া রহিয়াছে;—কখন পরিচ্ছিন্নরূপে অঙ্কিত,

কখন বাতাসে মিলিতপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে একটি স্নিগ্ধ বাষ্পময় হিল্লোল বিস্তার করিতেছে। ইহাই যে মানবশক্তির প্রতিচ্ছায়া—এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে :—এই রঙীন প্রতিবিম্বই আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি।”

হিন্দুধর্ম্ম যাহাকে মায়া বলে, তাহা এই রঙীন প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আনন্দের ব্যাখ্যা করেন, মায়ার পরপারেই তিনি তাহার দর্শন লাভ করিয়াছেন; এবং যতক্ষণ তিনি এই রঙীন প্রতিবিম্বের ওপারে, এই দোদুল্যমান ঘটনা-যবনিকার অন্তরালে তাঁহার দেবতাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অন্তরাত্মা তৃষিত হইয়া ছিল।

“যে দিন ফুট্‌ল কমল”

—গীতিমালা (১৭)

* * *

জীবনের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে ঠাকুরমহাশয়ের কি মতামত, সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার যোগ্যতা আমার নাই, এবং থাকিলেও আমি সে চেষ্টা করিতাম না,—সংক্ষেপেও নহে। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে, তিনি উপনিষদের ধর্ম্মতত্ত্বের কোনপ্রকার বদল করিতে, বা তাহাতে কোনপ্রকার অভিনবত্ব আরোপ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। এবং সে ধর্ম্মতত্ত্ব আর যাহাই হউক্, নূতন একেবারেই নহে। সুতরাং এ স্থলে আমি সে তত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে বসি নাই। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আবেগদ্বারা তাহা সঞ্জীবিত করিয়াছেন, ও যে নিখুঁত নৈপুণ্যের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি মুগ্ধ।

তাঁহাকে ভগবানের প্রয়োজন আছে, এ কথা ঠাকুরমহাশয় জানেন। তিনি কবি হইয়া যে বাঁশীকে নিজের ফুৎকারে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, নিজেকে ভগবানের হাতে সেই বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে "আমার কবি",—কখন কখন "কবিগুরু" বলিয়া সম্বোধন করেন; তিনি নিজে এবং মানুষ মাত্রই এই কবিগুরুর জীবন্ত কবিতা। তিনি বলেন, "আমি যেন আমার জীবনকে ঋজু ও সরল করিয়া, একটি বাঁশীর মতন করিয়া তুলিতে পারি; সেই বাঁশীটি তুমি গানে ভরিয়া দাও, এইমাত্র চাই।"

ভগবান নিজের সৃষ্টিতে, নিজসৃষ্ট জীবে নিজেকে উপলব্ধি করেন। কবি যেন ঈশ্বরের চৈতন্য হইতে পারেন, বা বস্তুতঃ তিনি সেই চৈতন্য—এই ভাবের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুপ্রাণিত।

যে কবিতায় মায়ার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, এবং মায়ার আবরণ ভেদপূর্ব্বক জ্ঞানের মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটন করা হইয়াছে, সে কবিতাগুলিও নিখুঁত।

ঠাকুরমহাশয়ের যে ব্যাখ্যানগুলি সম্প্রতি "সাধনা"-নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এমন অনেক বাক্য আছে যাহা উল্লিখিত কবিতার টীকাস্বরূপ। তাহার একটি দৃষ্টান্ত "প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি" শীর্ষক পরিচ্ছেদের শেষাশেষি দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাস্তবিক ইহা কি অতি আশ্চর্য্য নহে যে, প্রকৃতিতে একই সময়ে যুগপৎ দুইটি বিরোধী-ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—একটি অধীনতার, অপরটি স্বাধীনতার।

একদিকে প্রকৃতির শ্রম ও চেষ্টার মূর্ত্তি, অপরদিকে অবকাশের মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাহিরে প্রকৃতি অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল; অন্তরে প্রকৃতি সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ।"

ইহাই কি নিম্নলিখিত কবিতাটির ভাবার্থ নহে?

"একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"

নৈবেদ্য (৮১)।

আমি শেষে যে-কয়টি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি সবগুলিই এই দ্বৈতভাব-প্রণোদিত। "সাধনার" একটি সুন্দর অংশ এই ভাবের সুনিপুণ টীকাস্বরূপ ঃ—

"দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর,—ফুল। ফুল যতই সুন্দর দেখিতে হউক্ না কেন, সে একটি মস্ত কাজে ব্যস্ত। তাহার গড়ন ও রং কেবলমাত্র সেই কাজেরই উপযোগী। তাহার হাতে নির্ব্বিঘ্নে ফল ফলানোর ভার; নহিলে গাছের জীবনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, ও পৃথিবী অচিরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। ফুলের রং এবং গন্ধ শুধু এই কারণেই। যেমনি মৌমাছিদ্বারা তাহার গর্ভাধান হয়, অমনি ফলের সময় আসে, অমনি তাহার পেলব পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে, এবং প্রাকৃতিক মিতব্যয়িতার নিষ্ঠুর নিয়মে সে তাহার সুমধুর গন্ধ বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। সূর্য্যের আলোকে রূপের বাহার-দিবার অবকাশ আর তাহার নাই; তাহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্য একমাত্র প্রয়োজনের শাসনেই সম্পন্ন হয়;—তাহারই

তাগিদে কুঁড়ি ফুলের দিকে অগ্রসর হয়; ফল মাটিতে বীজ বপন করে; বীজ পুনশ্চ অঙ্কুরিত হয়; এবং এইরূপে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নধারায় ধাবিত হইতে থাকে।

কিন্তু এই একই ফুলকে মানুষের হৃদয়ের দিক হইতে দেখ,—তৎক্ষণাৎ তাহার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার কোন কথাই আর উঠিবে না; সে তখনি বিরাম ও অবকাশের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইবে। অতএব যে বস্তুদ্বারা অনন্ত উদ্যমের প্রকাশ হয়, সেই একই বস্তু অপরদিকে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের অখণ্ড প্রতিরূপ।"

Schopenhauer "উদ্যমশীল" ও "শান্তিশীল" এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এখানে আমরা সেই পুরাতন পার্থক্যের আভাস পাই। অবশ্য এই দ্বৈতভাব সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারাই বড় কম কথা নহে। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, তিনি মায়ার ও-পারে একটি মহত্তর আনন্দের নাগাল পাইয়াছেন,—কারণ তিনি "সাধনায়" বলেন ঃ—

"আমাদের জীবনের যে-দিক অনন্তের অভিমুখী, তাহা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, তাহা স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রত্যাশী। এইখানেই প্রয়োজনের রাজ্য শেষ হয়,—এখানে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পাওয়া নয়,—হওয়া। কি হওয়া ?—না, ব্রহ্মের সহিত এক হওয়া,—কারণ অনন্তের ধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম। সেই জন্যই আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই 'যিনি ঈশ্বরকে জানেন তিনি সত্য হয়েন।' পাওয়ার সীমানা ছাড়াইয়া এইখানে হওয়ার সীমানায় আসিয়া পৌঁছানো যায়। যেমন, কথার অর্থ যখন

জানিতে পারি তখন কথা যে বেশি বড় হয় তাহা নয়, কিন্তু সত্য হইয়া উঠে,—তখন ভাবের সহিত ভাষা এক হইয়া যায়।

"যিনি পরম পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য নির্ভীকচিত্তে প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেরূপ পূর্ণ তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও,—সেই ব্যক্তিকে যদিও পাশ্চাত্য-জগৎ গুরু বলিয়া মানে,—তবুও অনন্ত সত্তার সহিত আমাদের ঐক্যভাব পাশ্চাত্য-জগৎ কখন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নাই। মানুষের দেবত্বলাভের সকল দাবীই তাঁহারা পরম স্পর্দ্ধা বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যিশুখৃষ্ট কখনই তাঁহার উপদেশে এরূপ নিন্দাবাদ করেন নাই,—সম্ভবতঃ তাঁহার পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় সাধুগণও এই ভাবের সমর্থন করেন নাই। অথচ ক্রমশঃ এই ভাবই পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।"

অপরপক্ষে, ভগবানের সঙ্গে এই ঐক্যের ভাব হিন্দুদের মধ্যে এমন প্রবল যে, আমার প্রবন্ধের প্রথম-অংশে ঋগ্বেদের একটি ঋকের যে সুন্দর পদটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম, তাহার রচয়িতা যে ঋষি তিনি "প্রজাপতি"-বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; —অর্থাৎ তিনি যে নূতন দেবতার স্তব করিতেছেন, সেই জীবেশ্বর প্রজাপতির নামে নিজের নামকরণ করিয়াছেন। "সাধনার" আর-এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যখন এই ঐক্যের পূর্ণতা-বোধ কেবলমাত্র বুদ্ধিগত নহে, যখন তাহা বিশ্বের সমগ্রতাসম্বন্ধে আমাদের চিত্তকে জাজ্জ্বল্যমানরূপে সচেতন করিয়া তোলে, তখনই আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ও প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে।"

গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি ব্রহ্মের সহিত এই প্রকার পুনর্ম্মিলনে লীন হইবার কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"আমি শরৎ শেষের মেঘের মত তোমার গগনকোণে"
"লীলা"—খেয়া।

এইখানেই, এই "স্বচ্ছ শুদ্ধ স্নিগ্ধতার মধ্যে" জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ কষ্ট ভাবনা চিন্তা ও ভালবাসা সবই লীন হইয়া যায়।

"আমার ঘরেতে আর নাই
সে যে নাই"—"স্মরণ"।

গীতাঞ্জলির শেষ-কবিতা-কয়টি সবই মৃত্যুর স্তব। ইহাপেক্ষা গভীর ও সুন্দর সুর আমি কোন দেশের কোন সাহিত্যে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।*

আঁদ্রে গীদ্

*রবীন্দ্রনাথের গীত ইউরোপের মনের কোন্ তার স্পর্শ করেছে—তা জানবার জন্য আমাদের অনেকের মনে বিশেষ কৌতূহল জন্মে। বর্ত্তমান যুগের একটি খ্যাতনামা ফরাসী লেখক এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তার থেকে আমরা ইউরোপের নব-মনোভাবের কতকটা পরিচয় পাই। এই কারণে আঁদ্রে গীদ্ তাঁহার কৃত গীতাঞ্জলির অনুবাদের যে ভূমিকা লিখেছেন তার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। বলা বাহুল্য, অনুবাদমাত্রেই মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা কঠিন, এবং ফরাসী ভাষার রচনারীতি বঙ্গভাষায় রক্ষা করা বিশেষরূপে কঠিন সুতরাং ভাষান্তরে রূপান্তরও ঘটেছে।

সম্পাদক।

তেপাটি *

(Triolet)

উষা

উষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে
উষা হাসে অচল শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখি মনের শিয়রে
হিমবুকে রাখিয়া চরণ॥

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আল্‌পনা।
দেখ সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবিকরে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবি-কলপনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আল্‌পনা॥

* সবুজপত্রে "অনার্য্য বাঙ্গালী"-নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু (আই, সি, এস) বাঙ্গলায় একটি Triolet রচনা করে নমুনাস্বরূপ সেটি আমাকে পাঠিয়ে দেন। সেই নমুনা-অনুসারে আমি এই কবিতাগুলি লিখেছি। "তেপাটি" নামও তাঁরই দত্ত। সুতরাং এই কবিতাগুলির নাম ও রূপের জন্ত আমি তাঁর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। প্র—চৌ

সন্ধ্যা

দেখ সখি দিবা চলে যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক নিশায়
দেখ সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়
তাই বলে হয়োনা চঞ্চল।
বেলা গেলে সব চলে যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল ॥

মধ্যরাত্রি

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্রতারা,
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে।
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রেখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা দুটি কালো তারা ॥

১০ই অক্টোবর ১৯১৪
কার্সিয়ং

মিলন

জান সখি কেন ভালবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালবাসি ?
যবে আমি তোমা কাছে আসি
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী।
তাই সখি আমি ভালবাসি
ওই তব গোটা মুখখানি ॥

বিরহ

বলি তবে কেন চলে যাই
শুনে যেন মরমে কেঁদনা।
দুঃখ দিতে দুঃখ পেতে চাই
তাই সখি তোমা ছেড়ে যাই।
আমি চাই সেই গান গাই
সুরে যার উছলে বেদনা।
তাই যবে দূরে যেতে চাই
সখি মোরে থাকিতে সেধনা ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

৩১শে অক্টোবর
কার্সিয়ং

সবুজ পত্র

চঞ্চলা

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মত।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লওনা কিছু, করনা সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩রা পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ।

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই—সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্যজীবীর পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে—বৈশ্যের কর্ত্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্ম্মনি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

সম্পাদক বলিয়াছেন য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃষ্টসঙ্ঘ বর্ত্তমান য়ুরোপের শিশু-বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত-হাতে গুরুমশায়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে—সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যত কিছু অন্যায় করিয়াছে খৃষ্টসঙ্ঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্ম্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাঁহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে "অদ্ভযুদ্ধস্বয়াময়া"। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরাম দাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবামাত্র তিনি হুঙ্কার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দ্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই—রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলি চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচম্‌কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর একটা লড়াই সাম্‌নে রহিল সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্ত্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই ত বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো বা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কখনো বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই।

সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিষ লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যেকালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েঁ। কেননা তখন ব্রাহ্মণ ত কেবলমাত্র যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন লইয়া ছিল না,—মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয় প্রভু ও ব্রাহ্মণ প্রভুতে সর্ব্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত;—বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে আপস্ করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাজায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিষটা দেনাপাওনার জিনিষ; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিষটা ঠিক তার উল্টা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিষটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এই জন্য প্রভুত্বই যত কিছু বড় বড় লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পাল্কীর বেহারা তাই বারবার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বারবার কাঁধ বদল করিতে হয়—কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে

চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণ-শক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এই জন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্ব্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল—এই কারণে তখনকার যত কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিষই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ কি তাহা বুঝিয়া দেখা যাক্। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই—জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মত রাজত্বপ্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সে দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড় বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এসিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুস্কিল হইয়াছে জর্ম্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া

আর বড় কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গরগর করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তাঁর পাত কাড়িয়া লইব।

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্ম্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্ম্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্ব্বল, ধর্ম্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্ম্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য যোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্ম্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মত জর্ম্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি ত জর্ম্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাজমহল

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ ?
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দ মঞ্জরী ;
তাইত তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ !

•

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে রাজ-বিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশদিক্ ;
আকাশ তাহার পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন ;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।

সম্রাটমহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্ব্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গ-স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।

রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব,—পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী,
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটীরে ;—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্ত্তি হতে করিয়াছে বিদায় গ্রহণ।
আজ সর্ব্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫ই পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ।

খৃষ্টধর্ম্ম

(খৃষ্টজন্মদিনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত)

সম্প্রদায় এই বোলে অহঙ্কার করে যে সত্য আর সকলকে ত্যাগ করে' তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহঙ্কারে সে সত্যের মর্য্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহঙ্কার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহঙ্কার করে তাতে ক্ষতি হয় না, কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য; কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহঙ্কারের বিষয় কোরে তোলে তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃষ্টান খৃষ্টধর্ম্মকে নিয়ে যখনই অহঙ্কার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম্ম নয় যা তার আপনি। এই জন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মত সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহঙ্কারের প্রতিঘাতে অহঙ্কার জেগে ওঠে— এবং যে অহঙ্কার অহঙ্কৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এই জন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক

ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মাকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব—খৃষ্টানের জিনিষ বলে নয়, মানবের জিনিষ বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম "আবিঃ", অর্থাৎ আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করচেন সেই তাঁর ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর প্রকাশ, সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বদ্ধ-ঘরে কেরোসিন্ জ্বলচে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমচ্চে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা, তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিলেই তার চারিদিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়—এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি কোরে আপন চৈতন্যকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি, প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃষ্টধর্ম্মের লক্ষ্য।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ।

যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায় কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায় কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু-অংশ বলে, সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব; মানুষের মানুষ-অংশ বলে, ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছায় উৎসর্গ করব, বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল কোরে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।

সকল দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ মানুষের এই যে তার বড় তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্চে, এই তার পাপ; সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়কে প্রকাশ করতে পাচ্চে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড় কষ্ট পাচ্চেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে? মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন? কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়? তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়কে ঠেকিয়ে রাখ্‌চে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই

তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন কোরে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়; সেই জন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে না পেতুম তাহলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন একথা বিশ্বাস করতুম কেমন কোরে?

মানুষের সেই বড়র সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্চে সেই দুঃখ পান করচেন কে? সেই বড়, সেই শিব। রাগ কাকে মারচে? চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়চে। লোভ কার ধন হরণ করচে? যে কেবলি ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আস্‌বে বোলে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়? যার প্রেমের অবধি নেই পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্চে।

এ যে আমরা চারিদিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্ব্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই ত দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া, কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদচেন তিনি যে বড়, তিনি যে প্রেম। খৃষ্টধর্ম্ম জানাচ্চে সেই পরম-ব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটাকে বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে

জড়িয়ে বিশেষ দেশকালপাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখ্‌লে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আস্‌চেন তিনি বল্‌চেন, "জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত সব চেয়ে বড় চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেচে? মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল? বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরেনি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।"

সেই বড় যিনি তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য হত তাহলে কি রক্ষা ছিল? বড়র মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই ত বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে? সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে? কেন পারে না? তার আছে কি যে পারবে? তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়?

আমরা ত ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্চি। যে বড় সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করচে—আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্চে—ঘরে ঘরে। বড় বল্‌চেন, "আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।" তখন আমরা কেঁদে বলছি, "তোমাকে আর মারব না—তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধূলো দিয়েছি—অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও,

আমার সব নাও! তুমি ভালবেসেচ, আমিও বাসব।” এমনি কোরে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না তবেই ত পাপের মূল মরে;—নরকদণ্ডে ত মরে না।

যিনি বড়, তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধচেন। আপনার সেই বড়টিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্ম্মী কর্ম্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই বলেছে—“তোমার মত এমন সুন্দর আর দেখ্‌লুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ যে সব কালো—কিন্তু তুমি কি সুন্দর, কি পবিত্র তুমি, তুমি আমার!”

মানুষের মধ্যে মানুষের এই যে বড়র আবির্ভাব, যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করচেন, এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজ্‌চে, এই আবির্ভাব ত ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই—তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ কোরে, মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করচেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃষ্টধর্ম্মে প্রকাশ হচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন ও পুরাতন

(১)

আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টনটনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে এসেছি—কেউ বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনোজগতে আমরা নানা-পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।

এমন কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে,—অন্ততঃ মুখে। সুতরাং নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে,—সমাজে নয়।

এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন —যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। যে পথে দাঁড়ালে নূতন ও পুরাতন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে—সে পথের পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য

নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ-পথও জানে, ও-পথও জানে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মরে আছে, তাঁরা হয় ত একটা নিষ্কণ্টক মধ্য-পথ পেলে বেঁচে উঠবে।

(২)

ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে মামুলি দস্তুর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিনবাবুও নানা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটখাট কথা সত্য, আর কতক বড় বড় কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য তা নতুন নয়, আর যা নতুন তা সত্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বিপিনবাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের বিরোধের কারণ-নির্ণয় করে', পরে তার সমন্বয়ের উপায়-নির্দ্দেশ করেছেন।

তাঁর মতে আমরা—

"ইংরাজি শিখিয়া ইউরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া * * * ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।"

এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন, এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্রপাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত-শতাব্দিতে দেশসুদ্ধ লোকের মন যে এক-লম্ফে সমুদ্রলঙ্ঘন করে' বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এবং এ শতাব্দিতে সে মন যে আবার উল্টো লাফে দেশে ফিরে এসেছে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের মনের দিক্ থেকে দেখতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দি ও বিংশ

শতাব্দিতে যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে, তা নয়,—যদি থাকে ত সে উনিশ-বিশ। আজকালকার দিনে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে, স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশী কি বিদেশী তাও আমরা ঠাওর করতে পারিনে। উদাহরণ-স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব যার ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশী—তাকে আমরা বলি "স্বদেশী"।

ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে না আসাতে দেশের কোনও ক্ষতি নেই—বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিনবাবু বলেন—

"এ কথা সত্য নয় যে একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙ্গে ছুটেছিল—তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ী ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করেছে। কেননা ও-জাতির অন্ধতা সারাবার শাস্ত্রসঙ্গত বিধান এই—"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণংছিত্বা" দেগে দেওয়া।

বিপিনবাবু বলেন—

"কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা-কিছু

তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি বিচার বিবেচনাবিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।"

বিপিনবাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে যে মোটেই বিরল নয়, সে কথা "নারায়ণ" পত্রে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া ইউরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশি করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।"

ডাক্তার শীল বলেন এরূপ বিচার "স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট অতএব সত্যভ্রষ্ট।" আমাদের পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহঙ্কার, জাতীয় অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত;—আমাদের জাতীয় অহঙ্কার জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহঙ্কার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহঙ্কার আমাদের অকর্ম্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নূতন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমন্বয় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন তাঁরা যদি কোন-কিছুর

সমন্বয় করতে পারেন ত সে হচ্ছে এই দুই নেশার। মদ আর আফিং এই দুটি জুড়িতে চালাতে পারে সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।

আসল কথা, নব-শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশ'-নিরনব্বই জন কস্মিনকালেও প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ব্যসনে ও ফ্যাসনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা, এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুন তাঁদের কোনরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজ-ধর্ম্মের অবিরোধে নূতন-অর্থকামের সেবা করাতে সমাজ কোনওরূপ বাধা দেয় না—কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে সমাজের যে-সকল পুরোনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে তার নতুন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা নূতন পুরাতনের বিরোধভঞ্জন করেন নি;—যদি কোন-কিছুর সমন্বয় করে থাকেন ত সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সমন্বয়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশজনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনওরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন—সে তেল দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিন জন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি

দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এঁরা সকলেই সমাজদ্রোহী বলে গণ্য।

সমাজ-সংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে তোলবার চেষ্টাতেই এদেশে নূতন-পুরাতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিনবাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সমন্বয় হয়ে যায়, তাহলে আমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ করব যে, তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

(৩)

দুটি পরস্পর-বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-একপক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিনবাবুও এই সহজ মানবধর্ম্ম অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর নানান্ উল্টাপাল্টা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নূতন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।

সকলেই জানেন যে, পুরাতন, সংস্কারের নাম শুনতে পারে না, কারণ সুপ্তকে জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পুরাতনের গায়ে হাত দিতে হয়—তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়,—কড়াভাবে। বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজকে অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।

বিপিন বাবু বলেন—

"দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।"

দুনিয়াটা যে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানিনে,—তার কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও-কাজ করেননি। তবে তিনি যে পালমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেছেন, এমন ত মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয়নি। সৃষ্টির পূর্ব্বের খবর আমরাও জানিনে, বিপিনবাবুও জানেন না;—কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ-ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দু-দর্শনের ভাষায় তার নাম—"ইদং"। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "নারায়ণ" পত্রে সেই ইদং-এর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন:—

"ইদংকে যে জানে, যে ইদং-এর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া যাহাকে এই ইদং-এর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়, সেই মানুষ অহং পদবাচ্য।"

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদং-এর কর্ত্তা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে—বহির্জ্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারবার না থাকৃত, তাহলে তার কোনওরূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হলে দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হত না—অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব থাকৃত না। এবং সে

ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদং-এর "পরিচালনা ও পরিবর্ত্তন",—আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্ট পদার্থের সংস্কার করা। মানুষে যখন লাঙ্গলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষিব্যতীত অপর কোনও কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ—শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়,—অহং। সুতরাং সংস্কারকদের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে বিপিনবাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।

শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চার প্রকার—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন তারই বিকার ঘটান,—এমন লোকের অভাব যে বাঙ্গলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয়,—কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশসুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে।

(৪)

বিপিনবাবুর মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন;—কারণ নূতনই হচ্ছে মূলবিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে, তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।

নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়ম অনুসারে—উন্নতির পথ সিধে নয়, পেঁচালো। উন্নতি যে পদে পদে অবনতিসাপেক্ষ—তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিনবাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমানরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

"তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানব সমাজ একটা সরল রেখার ন্যায় উর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না। * * কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততা যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটির গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই উপরে উঠিবার জন্যই একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে—ইহাকে স্পাইরাল মোষণ (spiral motion) বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইরাল, একান্ত সরল নহে। * * আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উর্দ্ধমুখী তির্য্যক-গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।"

বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতি-তত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—কিন্তু সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

বিপিনবাবু বলেন যে—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সত্যজ্ঞান নয়,—ভ্রম। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু রজ্জুতে লতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান,—এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি? রজ্জু জড়পদার্থ, এবং

"সতেজ ব্রততী" সজীব পদার্থ। দড়ি বেচারার আপনার "গতিবেগ" বলে' কোনরূপ গুণ, কি দোষ নেই। ও বস্তুকে ইচ্ছে কর্‌লে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে ফেল্‌তে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পার। রজ্জু উন্নতি, অবনতি, তির্য্যক্‌গতি, কি সরল গতি— কোনরূপ গতির ধার্ ধারে না। বিপিনবাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন, তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর বিপিনবাবু এ সত্যই বা কোন্ বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার কর্‌লেন যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদজাতীয়? Psychology এবং Sociology যে Botanyর অন্তর্ভূত,—একথা ত কোনও কেতাবে কোরানে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদ-তত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদ হলেও, ঐ দুই পদার্থ যে লতাজাতীয়, এবং বৃক্ষজাতীয় নয়,—তারই বা প্রমাণ কোথায়? গাছের মত সোজাভাবে সরলরেখায় মাথা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম্ম নয়,—কোন্ যুক্তি, কোন্ প্রমাণের বলে বিপিনবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা পালমহাশয়ের আপ্তবাক্ আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উক্তি যে যুক্তি নয়—এ জ্ঞান বিপিনবাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয় ত তিনি বল্‌বেন যে, উর্দ্ধগতিমাত্রেই তির্য্যকগতি—এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। উর্দ্ধগতিমাত্রকেই যে স্ক্রুর আকার ধারণ করতে হবে,

জড়জগতের এমন কোন বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না জানি নে। যদি থাকে ত মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন, একথা তিনিই বল্‌তে পারেন যিনি জীবে জড় ভ্রম করেন।

"আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তর যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।"

বিপিনবাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। "তালগাছ যে সরল-রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠে"—তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে সে সিধেভাবেই ওঠে; আর যে পরকে আশ্রয় করে ওঠে সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা—তরুর আশ্রিত লতা।

দশ ছত্র রচনার ভিতর Dynamics, Botany, Sociology, Psychology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপট্‌কি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান আমার ছিল না। সম্ভবতঃ পালমহাশয় যে "নূতন দৃষ্টি" নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি—গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তাহলে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতালের সিঁড়িও গোল; কারণ ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হতে পারে, নামাও হতে পারে। এ অবস্থায় উন্নতি-শীলের দল যদি কুটিল পথে না চলে' সরল পথে চল্‌তে চান্‌, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

(৫)

বিপিনবাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্যের একত্র সমাবেশ করতে কুণ্ঠিত হন নি, তার কারণ তিনি ইউরোপীয়-দর্শন হতে এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের Thesis, Antithesis এবং Synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য্য কি? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, "ভাব" (Being) এবং "অভাব" (Non-Being) এই দুটি পরস্পর-বিরোধী,—এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে "স্বভাব" (Becoming)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টি-প্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তাঁর লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। তার কারণ হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগবানের অবতার নন—স্বয়ং ভগবান। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের (Henri Heine) গুরুমারা-বিদ্যের গুণে ফাঁস হয়ে গেছে। বিপিনবাবুর ও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষ কথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিনবাবু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন—তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

(৬)

হেগেলের মত একে নতুন তার উপর বিদেশী; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্তত: করি এই আশঙ্কায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।

সমন্বয় অর্থে বিপিনবাবু কি বোঝেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"সমন্বয় মাত্রেই যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়।"

অর্থাৎ Thesisকে কিছু ছাড়তে হবে এবং Antithesisকে কিছু ছাড়তে হবে—তবে Synthesis ডিক্রি পাবে। তাঁর দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবতঃ হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত;—কেননা তাঁর Synthesis কোনরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে Thesis এবং Antithesis দুটিই পূরামাত্রায় বিদ্যমান; কেবল দুয়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। Synthesis-এর বিশ্লেষণ করেই Thesis এবং Antithesis পাওয়া যায়। এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।

তারপর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয়, তাহলে বলতেই হবে যে, বিপিনবাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস জৈমিনির মীমাংসার কোনই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপোষ-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবীর এক

পয়সাও ছাড়েনি, কোনও বিরোধী-মতের দাবীর এক পয়সাও মানেনি। উত্তর মীমাংসাতে অবশ্য সমন্বয়ের কথা আছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের অর্থ যে কি, শ্রী শঙ্কর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে। ইহাতে নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।"

এবং শঙ্করের মতে মীমাংসার অর্থ "অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্তবাক্য-সমূহের বিচার।" এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ পরস্পরবিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর মীমাংসার কোনও মিল নেই;—না মতে, না পদ্ধতিতে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয় প্রকার যথা—সৃষ্টি, স্থিতি, হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপর্য্যয় ও লয়। শঙ্কর হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর absolute হচ্ছে eternal becoming। সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান হয়েছিলেন। শঙ্কর যে জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে জ্ঞান

মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান—ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্ম।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। Thesis এবং Antithesisএর সুতোয় সুতোয় গেরো দিয়েই এক একটি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির-বর্ত্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্দ্ধমান—অর্থাৎ একটি static, অপরটি dynamic। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি Thesis হয় তাহলে হেগেল তার Antithesis—এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।

(৭)

বিপিনবাবুর হাতে পড়ে শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।

বিপিনবাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম thesis, antithesis এবং synthesis—তারই নাম তম রজ ও সত্ব। কেননা তাঁর মতে thesis-এর বাংলা হচ্ছে স্থিতি, antithesis-এর বাংলা বিরোধ, এবং synthesis-এর বাংলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা। কেননা thesis যদি স্থিতি হয়, তাহলে antithesis অ-স্থিতি (গতি), এবং synthesis সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনও মিল নেই; কেননা সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়,—সৃষ্টি হয় না। সত্ব রজ তমের মিলন

নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ; অপরপক্ষে হেগেলের মতে thesis এবং antithesis-এর মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিনবাবুর ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়-কারের কাছে অবশ্য এ সকল পার্থক্য তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব সর্ব্বথা উপেক্ষনীয়।

তম ও রজের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের synthesis হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ব নয়। একথা দুটি-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মন ও মানব-সমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিনবাবুর উদ্ভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন-অনুসারে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

তামসিক-মন = সুপ্ত রাজসিক-মন = জাগ্রত

সাত্বিক-মন = ঝিমস্ত

তামসিক-সমাজ = মৃত রাজসিক-সমাজ = জীবিত

সাত্বিক-সমাজ = জীবন্মৃত

অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সত্বগুণ যে তমোগুণ এবং রজোগুণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ, এ কথা সাংখ্যাচার্য্যেরা অবগত নন্, কেননা তাঁরা হেগেল পড়েন নি। উক্ত দর্শনের মতে সত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভূত নয়। সাত্বিক-ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ রজোগুণ যখন তমোগুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হয়, তখনই তা সত্বগুণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের

সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উল্টে ফেল্‌লে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অনুলোমক্রমে স্থূল হয়, হেগেল-মতে ঐ একই পদ্ধতিতে স্থূল সূক্ষ্ম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুরুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।

বিপিনবাবু দেশী-বিলাতি-দর্শনের সমন্বয় করে' যে মীমাংসা করেছেন সে হচ্ছে অপূর্ব্ব মীমাংসা—কেন না, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ অদ্ভুত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।

নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয়—তাহলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে—"ছেড়ে দে বাবা, লড়ে' বাঁচি।"

বিপিনবাবু যাকে সমন্বয় বলেন, বাঙ্গলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।

সমাজ-দেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়ি-ভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়, —তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেনি যার সাহায্যে কোনও বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা যায় —তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্ব্ব-সাধারণে গিয়ে পৌঁছান যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা

বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশকালপাত্রসাপেক্ষ, সুতরাং দেশকালের অতীত কিম্বা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমান বলবৎ কোনও সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। Physics কিম্বা Metaphysics-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক জাতীয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত উর্দ্ধগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন কোনও জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম্ম—সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এমন কোনও নিয়মের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, বিপর্য্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যে সব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করি,—যথা বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি—এঁরা মানুষের মনকে বিপর্য্যস্ত করেই মানব-সমাজকে উন্নত করেছেন;—এঁরা Spiral motionএর ধার ধারতেন না, কিম্বা স্থিতি ও গতির মধ্যে দূতীগিরি করে তাদের মিলন ঘটানও নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি।

মানুষের মনকে যদি গেরোবাজের মত আকাশে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে উঠতে হত, এবং মানবসমাজকে যদি লোটনের মত

মাটিতে লুটুতে লুটুতে এগোতে হত, তাহলে এ দুয়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হত না,—দুদণ্ডেই তাদের ঘাঁড় লটকে পড়ত। সুতরাং কি মন, কি সমাজ, কোনটিকেই প্যাকচক্রের ভিতর ফেল্‌বার আবশ্যকতা নেই। বিপিনবাবুর বক্তব্য যদি এই হয় যে, পৃথিবীতে অবাধগতি বলে কোন জিনিষ নেই, তাহলে আমরা বলি—এ সত্য শিশুতেও জানে যে পদে পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই বলে স্থিতি-গতির সমন্বয় করে চলার অর্থ যে শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, একথা শিশুতেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ ত সর্ব্বলোক-বিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক "বিরোধটি জাগিয়ে" রাখা মূর্খতা—এবং সেটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে-পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙ্গে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনও নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে—এ আশা দুরাশামাত্র।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, "নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে—সমাজে নয়।" আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ

হত, তাহলে আমি বিপিনবাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমতঃ আমি সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্‌টি বিগ্রহের এবং কোন্‌টি সন্ধির যুগ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ বিপিনবাবুর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন-পুরাতনের জমাখরচ করলে, সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য। সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোনপক্ষই ও উপায়ে কোন সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না। তৃতীয়তঃ ডাক্তার শীলের মতে—

"সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে, তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।"

যে সমাজ হাজার বৎসর একস্থানে একভাবে বসে আছে তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মত সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিনবাবুর মতামত কর্ম্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সমন্বয়ের কোনও সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে দুধের সঙ্গে জলের সমন্বয় প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে জলোদুধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারিনে। কারণ ও বস্তু অন্তরাত্মার পক্ষে মুখরোচকও নয়— স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ দুধ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে জ্ঞানামৃত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের

এই Punch পান করে আমাদের সমাজের আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুরুনির চোটে অনেকে চোখে এতটা ঝাপ্‌সা দেখেন যে কোন্ বস্তু নূতন আর কোন্ বস্তু পুরাতন, কোন্‌টি স্বদেশী আর কোন্‌টি বিদেশী—তাও তাঁরা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর প্রথম দরকার—সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়—মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে—আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত—তাই বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার করা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, “যদি শ্রাদ্ধ করিবার সখ থাকে বাপের্ করিস জ্যাঠার নয়।” তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :—

যে বছর কলিকাতা সহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মাপরা চাপরাশির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে সেই সঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন—দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—

জগমোহন বলিলেন,—বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কি করিয়া?

কাদের?

ঐ যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তার মেসে গিয়া বলিলেন—চল্‌।

শচীশ বলিল,—আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দ্দফরাসীর কাজ?

আজ্ঞা হাঁ—যদি দরকার হয় তবে ত—

আজ্ঞা হাঁ বই কি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি, নচ্ছার, নাস্তিক!

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি ক্ষুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তা-খানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাঁসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাঁসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—ব্যামো হইয়াছে বলিয়া ত মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাঁসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই একজন ছিলাম শুশ্রূষা-ব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাঁসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিষ চুকাইয়া লইলাম—কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মত তাঁর পায়ের ধূলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্ব্বে বলিল—হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ্ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুস্কিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতর ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রনার দায়ে শচীশ কেবলি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোথাও নাই; একভাবে যাহা "না" আর-একভাবে তাহা যদি "হাঁ" না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম্ম নাম দিয়া কোনো একটা কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন সকল

ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন, নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন—"সংসার মানুষকে পোদ্দারের মত বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্ব্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফসকাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাহাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই,—সে যে আবর্জ্জনা।"

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জ্জনার দলে পড়িল? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্ এক জায়গায়

শচীশ,—আমাদের শচীশ,—লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্ত্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মত মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক লইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দ স্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। যদি সে অবধূত সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া জগৎটাকে গাঁজার কলিকায় টিপিয়া একটানে ফুঁকিয়া ধোঁয়া করিয়া উড়াইয়া দিত তাহা হইলে এত আশ্চর্য্য হইতাম না। শোকের আগুনে সংস্কার-মাত্রকেই ছাই করিয়া ফেলা অসম্ভব নয় কিন্তু মুগ্ধসংস্কারের পাগ্‌লা হাওয়ায় এমন করিয়া মাতিয়া বেড়ানো?

এদিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে! শত্রুও ত এক-আধজন নয়। সত্য যে আমাদেরই দলে তার সব চেয়ে মাতব্বর সাক্ষী ছিল শচীশ; সে যদি আজ এমন নির্লজ্জের মত একেবারে উল্‌টা তরফের ধ্বজা কাঁধে করিয়া নাচিতে থাকে তবে ছাই যুক্তিতর্ক আমাদের মানিবে কে?

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া কষিয়া তাকে একচোট গাল দিতে পারিলে মনটা খোলসা হইত কিন্তু মনের মধ্যে মনের বেদনা রহিয়া গেল।

৪

গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদীর দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কি! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্ত্তন হইয়া গেছে। যে সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়াই শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক্ হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে। সকালবেলাকার শুকতারার মত তার যে দুটি চোখ হইতে জাগরণের আলো ঠিকরিয়া পড়িত সেই চোখে আজ স্বপ্নের গোলাপী আভা, তার উপরে ছলছল বাষ্পের পর্দ্দা।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন—শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, —ও কে?

শচীশ বলিল,—শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনি লোকসমাজে আমার নাম রটিতে সুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ

বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন— থাক্ সে সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে সুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুসী হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম—সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মত আমার কপাল পর্য্যন্ত উঠিল, মাথা নীচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চ্যালা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মত নমো অংশটাকে ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, —তামাকটা সাজিয়া দাও ত হে শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টীকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোষ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার একপাশে বসাটা অসঙ্গত মনে করি না কিন্তু, কি জানি, সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামী জানেন আমি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায় কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই—মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু

তবে এবার বিদ্যাসমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তি ত পাইয়াছ এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখ।

ইঁহাকে দেখিয়া একটু কেমন জ্যাঠামশায়কে মনে পড়িল। রং তেমন গৌর নয় কিন্তু নাক সেইরকম যেন বাঁকা তলোয়ারের মত; চোখে সেইরকম একটা জোর আছে, যেন তাহা হাতের মত করিয়া ঠেলা দিতে পারে। বিশেষত কথা কহিবার সময় তাঁর ডান হাতের ভঙ্গী যে রকমের একটা প্রভুত্ব প্রকাশ করে সে ঠিক জ্যাঠামশায়ের মত।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনি শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এত বড় একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্ত্তন সুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উল্টাইয়া দিয়া শচীশ কিছু বা স্নেহের কৌতুকে কিছু বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল; বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি ত ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল,—সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা-কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই ত গুরু আমাকে এমন করিয়া চারদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন—আমি পা-টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—

শচীশ বলিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন, দরকার যে আমারই।

তর্ক করিতে যাওয়া মিথ্যা। বুঝিলাম শচীশ এমন একটা

জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি আরেক আমি। যে আমি একদিন শচীশের ভাবের বন্ধু এবং কাজের সহযোগী ছিলাম সে আজ একেবারে শূন্য হইয়া গেছে; তার শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়াছে এমন একটি রসপদার্থ যার ঢেউয়ের উপর সে দিনরাত নাচিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথমে ইহাতে বড় পীড়া বোধ করিলাম। কেননা, একদিন শচীশের সম্বন্ধে ছিলাম মানুষ, আজ হঠাৎ একটা আইডিয়া হইয়া উঠিলাম—মনে হইল যেন ধোঁয়া হইয়া গেছি। আবার সে আইডিয়া একটা বিশ্বব্যাপী আইডিয়া, সে আমার সম্বন্ধেও যেমন অন্যের সম্বন্ধেও তেমন। এই ধরণের আইডিয়া জিনিষটা মদের মত;—নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কি আর অন্যই কি! কিন্তু এই বুকে জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্ আমার ত নাই; আমি ত ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না;—আমি যে আমি।

শচীশকে বলিলাম, শচীশ তুমি দিনরাত এই যে একটা নেশায় এমন করিয়া গা ঢালিয়া দিয়াছ সত্যকে পাইবার এবং জীবনকে সত্য করিবার এই কি ঠিক প্রণালী? এ যে হিপ্‌নটিজ্‌ম্, যাকে বলে আত্মসম্মোহন।

শচীশ বলিল, জ্ঞানের বুঝি সম্মোহন নাই, কেবল ভাবেরই আছে? "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" কিম্বা "অধিকতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন" এগুলো বুঝি সম্মোহনের মন্ত্র নয়?

আমি বলিলাম, জ্ঞানের সম্মোহন জ্ঞানের ঔষধেই কাটে কিন্তু ভাবের সম্মোহনকে কোথাও যে বাধা দিবার নাই।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না। শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল—আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কি-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো একজন দেবতাতেই সম্ভব।

৫

আমাদের মত এতবড় দুটো দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দ স্বামীর নাম চারিদিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে সহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ী করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন—সমস্ত দলবল সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়;—তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে একরকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরুচরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যা-বেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই—কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম—চটক ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি; গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলণ্টিয়ারি করিয়াছি; পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামীর জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় চেনা অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল আমি দুর্ব্বল,

আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি কলিকাতা সহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

আমার মনের মধ্যে বিষম একটা খটকা বাধিল। গোল-দিঘির ঘাটে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, শচীশ আজ তার হৃদয়াবেগকে বিশ্বে ছড়াইয়া ফেলিয়া তার তলায় আর-সমস্তই চাপা দিয়াছে, এখন তাকে তার এই রসের প্রলয়মোহ হইতে বাঁচাই কেমন করিয়া?

রস জিনিষটা যে আছে সেই কথাটা আমাদের জীবন হইতে এতদিন একেবারে বাদ পড়িয়াছিল। বুঝিবা তার অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। আজ তাই সে ভূত হইয়া আপন দেহহীন দৌরাত্ম্যে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বিশ্ব আজ আপন বিচিত্র সত্যরূপ ছাড়িয়া আমাদের যৌবনের মানসলীলার এক কল্পনিকুঞ্জ হইয়া উঠিল।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি

আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চ-স্বরের ডাক—"বামী!" আমরা ভাবের যে আসমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ—কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মত জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক ত ঐখানেই—যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে—যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে—যেখানে ঘরঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্-মিক্ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছেঃ—ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি,—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর

করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপূর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে শিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

এইখানে শচীশের সঙ্গে আমার তফাৎ। আমি ননীবালাকে ননীবালা এবং দামিনীকে দামিনী বলিয়াই জানি। তাহাদিগকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ বলিয়াই দেখি তবে তাদের একজন অসাধুতার দায় বহন করিয়া কেমন করিয়া মরিল এবং আর-একজন সাধুতার চাপে কেমন করিয়া মরিতেছে তাহা সত্য করিয়া বুঝিতেই পারিতাম না।

দামিনীসম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনফার হঠাৎ-প্লাবনে উপ্‌চিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়াপরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গণৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্‌ এক

বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্ এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এদিকে ব্যবসায়ের উল্‌টা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরাপালের ভাগ্যতরী একেবারে কাৎ হইয়া পড়িল। এখন বাড়ি-ঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন।—দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কি করিতেছ?—দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এই জন্যই সময় নাই? বটে? পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে ত তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেই জন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা!

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহা উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি সুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারীতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে। তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তিসমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কতদূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল।

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত আমার মাথা ধরিয়াছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে

প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে ত তার বেশভূষা বিধবার মত নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না,—তার পরে এত বড় মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য্য প্রকাশ করিতেন একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ্য হইয়া আছে—ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েকদিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে সুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার তন্তু যে বড় সূক্ষ্ম, তার শিল্প যে বড় আশ্চর্য্য। সেই নিঃশব্দ কারখানা-ঘরের মধ্যে দৃষ্টি দিতে ইচ্ছা করে না। সেখানকার কারীগর সমস্ত শাসনকর্ত্তার অগোচরে যে নক্সা ফুটাইয়া তোলে সে কোনো শাস্ত্রের নয় ফরমাসের নয়,—তাই ত ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

গুরু ভাবিলেন তাঁর শক্তির প্রভাবকে দামিনী আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না—বাঁধ ভাঙিল। স্পষ্টই দেখা গেল এবার সোনা আগুনে পুড়িতেছে; কোনো কথা বলিতে হইল না, কোনো শাসন করিতে হইল না, আপনা-আপনি ভিতর হইতে খাদ কাটিতে লাগিল।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচীর হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে তার মাধুর্য্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না। যে বিশ্বরসে সে নিজে ভোর, দামিনীর মধ্যে তারই রূপ দেখিল,

কিন্তু একটি ব্যক্তিরস যা বিশ্বের নয়, যা বিশেষভাবে দামিনীরই সে তার চোখেই পড়িল না।

কীর্ত্তনের রসমাধুর্য্যে শচীশের সমস্ত স্নায়ুর তার যখন কাঁপিতেছে তখন এক একবার হঠাৎ সে দেখিতে পাইত দামিনী সভার এক দূর-কোণে বসিয়া বিহ্বল হইয়া তারই দিকে চাহিয়া আছে। সেই চাহনিটুকু কীর্ত্তনেরই একটি মূর্ত্তিমান আখরের মত শচীশের মনের মধ্যে বাজিতে থাকিত। সে তার মধ্যে দেখিতে পাইত চিরন্তনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতা, যে নারী তারার আলোয় অন্ধকারের বাতায়নে বসিয়া অপারের দিকে চিররাত্রি তাকাইয়া থাকে।

আমার পোড়া বুদ্ধি সমস্ত জিনিষকে যে স্পষ্ট করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আমি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যে ফুল ভ্রমরের জন্যই গন্ধে এবং রঙে আপনাকে ভরিয়া তুলিয়া বসিয়া আছে দক্ষিণের পাগ্‌লা হাওয়া কেন এমন করিয়া তার পাপ্‌ড়িগুলাকে একেবারে আকাশময় ছড়াছড়ি করিয়া দিল—তার ক্ষ্যাপামির বেগে ফুলকে কেন সে ফুল বলিয়া দেখিল না ?

একদিন দামিনীর জীবনের স্রোত বর্ষার নদী ছিল, আজ তার ঘোলা জলের ধারা যতই স্বচ্ছ শরতের নদীর তন্বী তাপসীর রূপ ধরিল এবং বেদনার দীপ্তিতে ঝলমল্ করিতে লাগিল ততই শচীশ তাকে মনে মনে ভক্তি করিতে লাগিল। সে যদি সুযোগ পাইত তবে তাকে প্রণাম করিত। শচীশের আহারে, তার বাসের ব্যবস্থায়, তার বসিবার ও শুইবার ঘরের সজ্জায়, গূঢ়ভাবে নানা ছোটোখাটো আরামে সৌন্দর্য্যে পারিপাট্যে একটি নারীর চিত্ত ব্যাপ্ত

হইতেছিল ; শচীশ যে তাহা অনুভব করিত না তাহা নহে কিন্তু শচীশ তার মধ্যে আপন ধ্যানের দেবতাকে বাহিরে দেখিত।

দেখিলাম শচীশের এই দেবতার উপরে দামিনীর ঈর্ষা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দেবতা দিনরাত কেন এত বড় একটা আড়াল হইয়া উঠিবে? মানুষের যাহাতে এত বেশি দরকার, যা তার ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্নজল, দেবতা কেন তা এমন করিয়া নিঃশেষে লুটিয়া লইতে থাকিবে? দামিনীর ভিতরকার ক্ষুব্ধ নারী আবার জ্বলিয়া উঠিয়া আপনাকে ও অন্যকে জ্বালাইতে চাহিতেছে। তার হাতে যদি শক্তি থাকিত তবে কোনো একটা নিষ্ঠুর আঘাতে শচীশের ভাবের নেশা ভাঙিয়া দিতে সে চেষ্টা করিত।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দ স্বামীর ধ্যান-মূর্ত্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা পোষা বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারিদিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্‌ করিতে থাকিত। এক একবার ভাবিতাম দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না—ইহার মধ্য হইতে একেবারে একছুটে দৌড় দিব—সেই যে চামারদের ছেলেগুলাকে লইয়া সর্ব্বপ্রকার রসবর্জ্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কি একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া কর, দয়া কর, আমাকে মারিয়া ফেল!

ভয়ে শচীশের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি-বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জ্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জ্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসীর বাড়ি গিয়া থাকিতে এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন? সে যে বড় শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুসি হইলেন। অন্য অন্য বছর

এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল—সম্বৎসর ইহারই জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কি অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া?

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জ্জন নিস্তব্ধ;—নারিকেলবনের পল্লববিজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে সব মূর্ত্তি, তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর পরে তিনজনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের

শেষ-প্রণামের মত নত হইয়া পড়িল। গুরুজি ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিলেন—এ গান তাঁরই রচনা :—

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখ্‌তে গিয়ে, সাঁজের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

সেদিন গানটি বড় জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন,

দেখা তোমায় হোক্ বা না হোক্
তাহার লাগি করবনা শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে!

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশভরা সমুদ্রভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালিরঙের পাকা ফলের মত ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল—অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :—

"গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মত,—তার

ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে;—সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী;—তার মন নাই;—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মত আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কি পাখী—হয় ত বাদুড় হইবে—ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্ ঝপ্ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি-মারিয়া একদিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর একদিকে মাথা ঠুকিলাম,—আর একদিকে একটা ছোটো গর্ত্তর মধ্যে পড়িলাম—সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পূরিয়াছে, আমার কোনোদিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে!

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড় সর্ব্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানিনা কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়—অসাড়তার একটা পাৎলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে ত রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কি রকম মুণ্ড, কি রকম গা, কি রকম ল্যাজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কি ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুইপা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কি রকম মুখ, জানিনা। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কি যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশম সংখ্যা] মাঘ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

মা-হারা

(স্থান—গোলকের সীমানা)

আমি
হৃদয়
জ্ঞান
জগৎ-মাতা
জগৎ-পিতা

আমি।—ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, নিম্নে এই হরিদ্‌বরণা ধরণী। ঐ নীল হইতেই সবুজের সৃষ্টি। কিন্তু মাঝের সেই পীত কই? পীত ও নীলের সমাবেশ ব্যতীত এ সবুজ হয় নাই। ঐ নীল আর এই সবুজের মাঝে ত এক মহাশূন্য, সেই শূন্যে পীতের কোনো আভাস পাই না। হায়! আমার পীত কোথায় গেল? না, না, এই ত দেখি, পীত আছে হরিৎএ মিলাইয়া। তাই বুঝি বসুন্ধরার হরিদ্‌বরণ আজ রাখার তন্তুতে তন্তুতে পীতের ক্ষীণাভাস। আর

সম্বৎসরের হরিৎ জীর্ণ হইয়া যে শরতের চীরবাস প্রস্তুত হয়, সেই শরৎও বিদায়কালে পুনরায় পীতের মহিমাই অঙ্গে ধারণ করে। তাই পাকা পীতের সন্ধান হরিৎ বিনা হয় না।

এই যে প্রাচীন ধরণীবক্ষে আমাদের নবীন জীবনধারা, ইহার সৃষ্টিও কি এই নিয়মেই? ঊর্দ্ধে, আকাশে, পিতা, ও নিম্নে, ধরণীর অঙ্গে অন্তর্হিতা মাতা,—এই শক্তিদ্বয়ের সমাগমেই কি জীবের সৃষ্টি হয় নাই? পিতা আছেন বৈকুণ্ঠে, এইরূপ শ্রুতি আছে, একটা আবহমানকাল হইতে জনশ্রুতি! মর্ত্ত্যে আমরা তাঁরই সন্তান, কিন্তু মা কোথায়? মার কথা ত শুনি না। আমরা সবাই মা-হারা! ভগবান যে আদ্যাপ্রকৃতি-শরীরের মধ্য দিয়া এই জীবসমষ্টি সৃষ্টি করিলেন, আমাদের সেই গর্ভধারিণী আমাদের জন্ম দিয়া ধরণীর অঙ্গে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন? জননীই যে ভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণের সোপান। যে কারণ-সাগরোদিতা মহালক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া ভগবান তাঁর স্বরূপে জীবকে সৃষ্টি করিলেন, আপনার উৎসর্গে আপনি অপূর্ণ হইলেন, সেই সঙ্গিনীকে ত আর দেখি না! তাঁর স্থান আজ শূন্য! বিশ্বের মা নাই! করুণা কোথায়? আমি এই গোলকের পরপারে আসিলাম, নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশে, কিন্তু এখানে এক মহাশূন্যের ব্যবধান,—ঠেকিয়া গেলাম! সোপান বিনা উঠিব কি করিয়া? কে আমায় বাপের কোলে তুলিয়া দিবে? হায়! মা থাকিলে বুঝি আজ শূন্যের ভিতর হইতে একটি হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া নিতেন, ও তাঁর বক্ষে বাঁধিয়া এই গোলকের সীমানা হইতে ঐ শূন্যের অপারে পিতার সমীপে লইতেন! আমার মা কোথায়

গেল ? এ খুনে-জগতে বুঝি মায়ের স্থান শূন্য! যমাবতার Dis একদিন ধরণীকন্যা প্রসূনপাণি Persephone-কে Hades-এ লইয়া গিয়া আজীবন আঁধার রাজ্যে রুদ্ধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা প্রসূনপাণির বিরহে ধরণীতে শস্যের অভাব দেখিয়া জগৎপিতা Zeus জীবের জন্য বৎসরান্তে তাঁকে এক একবার মুক্তি দিতেন। আমার উদ্ধারের জন্য কি আমার জননীর সন্দর্শন একবারের মতও মিলিবে না ? জননী না হইলে উদ্ধার করিবে কে ?

হৃদয়।—এ যুগে সন্তানই একমাত্র জননীর উদ্ধারের সোপান। মাতা সন্তানকে মুক্তিপথে লইয়া যাইতে অক্ষম। সন্তানকেই আগে জননীর বন্ধন মোচন করিতে হইবে। আজ সংসারে জননী স্বাধিকারচ্যুতা, দাসীরূপে রূপান্তরিতা। সন্তানধারণ করিতে গিয়া আজ তাঁর স্বতন্ত্রতা নাই।

আমি।—হায়! তাই বুঝি জগৎ-মাতা জন্মের মত অদৃশ্য হইয়াছেন। জীবকে সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি কালমুখে পতিত!

হৃদয়।—না, জগৎ-মাতার শরীর, রক্তমাংস, সকলই এই বিরাট জীবসমষ্টিরই শরীরে। তাঁর রূপ বিশ্বমানবের রূপে, যেমন হরিৎএ পীতের লুপ্তপ্রায় আভাস। তিনি আজ মূর্চ্ছিতা।

আমি।—হায়! আমি এতদিন ভাবিয়াছিলাম যে জীবই বুঝি সংসারক্ষেত্রে কালচক্রে বদ্ধ। এখন দেখি জগৎ-জননীও আমাদের সহিত এই মায়াপুরীর মায়াজালে বন্দী! আমাদের মুক্তি বিনা জগৎ-জননীর কি মুক্তি নাই! আমাদের মুক্তি নিজের নিজের স্বেচ্ছায় ও স্বতন্ত্রতার পথে, কিন্তু হায়! সেই করুণাময়ী জগৎ-জননীর

স্বতন্ত্র মুক্তি নাই, তাঁর আশা জীবেরই লক্ষ্যে, তাঁর উদ্ধার জীবেরই সিদ্ধিতে! মানবজগতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির, কার্য্য ও কারণের, জ্ঞান ও হৃদয়ের, পরস্পরে, এ বন্ধন কেন? বন্ধন যদি, তবে আবার ব্যবধান কেন? মধ্যে কেন এ ফাঁক? জড়-জগতে ত এমনতর নয়। সেখানে এ পরমুখাপেক্ষিতা নাই। আর যদিই বা থাকে, সে ত শরীর দিয়া শরীরের বন্ধন, রূপে রূপ গাঁথা, মাঝে কোনো অরূপের ব্যবধান নাই। অজ্ঞান দুর্ব্বল শিশু আমরা, কেমন করিয়া এ ব্যবধান কাটাই, কেমন করিয়া জননীকে ফিরিয়া পাই!

সন্তান আমরা মায়াপুরে রুদ্ধ, আমাদের মাতা জ্ঞানহারা, আত্মচ্যুতা, আর পিতা মুক্ত, পিতা অচ্যুত! বৈকুণ্ঠের এ কোন্ রীতি?

জ্ঞান।—না, তাঁর সেই রূপ, সেই দিক, যাহা বিশ্বমাতৃকার শরীরের ভিতর দিয়া মর্ত্ত্যে চৈতন্যরূপে উদ্ভাসিত, প্রতিবিম্বিত, সেই বিম্বটুকু তোমাদেরই মত মায়ার ফাঁদে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁর স্বরূপ মুক্ত, যাহাতে তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর ও তোমাদের পিতা। সেই স্বরূপটিও রূপ, রূপের মুক্ত দিক। এবং সেই স্বরূপের পশ্চাতেও আবার একটি অরূপ আছে, যাহা প্রকাশাপ্রকাশের অতীত।

আমি।—অরূপের কথা বুঝি না, কিন্তু তাঁর স্বরূপ যদি মুক্ত, তাঁর প্রকাশ মুক্ত নয় কেন? তিনি ত স্বপ্রকাশ, তবে তাঁর প্রকাশে বাধা কি? অপ্রকাশ যদি পূর্ণ, যদি শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, তবে তাঁর প্রকাশ কেন পূর্ণ হইবে না?

জ্ঞান।—সত্য। যাহা ছিল, তাহাই আছে, তাহাই থাকিবে। যাহা নাই, তাহা ত্রিকালে নাই। ইহাই পরমার্থদৃষ্টি। রূপও অরূপের মতই পূর্ণ, সে যে অরূপের রূপ। এই ত্রিকালসিদ্ধ পূর্ণ রূপটিই ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানে রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান, তাই অপ্রকাশিত অনন্ত ভবিষ্যৎ-রূপের তুলনায়, বর্ত্তমানের প্রকাশ-টুকু খণ্ডপ্রকাশ। এই প্রকাশের পথেই ভগবানের রূপ নিজেকে ব্যক্ত করিতেছে, কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমি।—হয়ত বা একদিন মর্ত্ত্যে পূর্ণিমা আসিবে! তবে সেই রূপের অনন্ত উন্মুক্ত দিকই আমাদের ভবিষ্যৎ-ভগবান, যাঁহাকে আমরা জানি না, যাঁর আগমন ত্রিলোক প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু যে রূপ জানি, যে রূপ নয়নে নয়নে উদ্ভাসিত, যে ভাষা শ্রবণে শ্রবণে প্রতিধ্বনিত, যে মধু প্রতি রসনার আস্বাদে, যে সৌরভ প্রতিমানবের নিশ্বাসে, যে স্পর্শ সকল অঙ্গের অনুভূতিতে, সেই যে আমাদের পরিচিত ভগবান, তিনি আমাদেরই মত মায়াপুরীতে রুদ্ধ।

জ্ঞান।—হাঁ, এই জ্ঞানের প্রকাশ সীমাবদ্ধ, জ্ঞানই সেই প্রকাশের সীমা। এমন কি, ভবিষ্যৎ-ভগবান যিনি মুক্ত, তিনিও জ্ঞানের সীমানায় আসিয়া ধরা পড়িতেছেন। কিন্তু ভগবৎ-রূপের যে দিক জ্ঞানে আসিলেও জ্ঞানচক্ষের সামনে আসিয়া পড়ে না, অন্তরালে থাকে, সেই রূপ, সেই দিক, চিরমুক্ত। যেমন শিল্পীর কৌশল ক্রমে ক্রমে তার কলাপ্রণালীতে ব্যক্ত হইতে থাকিলেও সদাই সেই প্রকাশের পশ্চাতে একটা অব্যক্ত পূর্ণরূপ আছে। সেই রূপটিই শিল্পীর স্বরূপ। কিন্তু সে রূপও আবার এক

অখণ্ড রসের জন্য, আর সেই রসই নীরূপ, নিরাকার, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত।

আমি।—তবে ভগবানে যেমন এক অব্যক্ত অরূপ আছে, যাহা নিরাকার, নির্গুণ, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত, তেমনি তাঁহাতে একটি অব্যক্ত রূপও আছে, যেটি তাঁর স্বরূপ, ও যাহা তাঁর প্রকাশিত রূপের অন্তরালে সদাই বিরাজমান। সেই অন্তরালের রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান হইলেও তাহা ত্রিকালসিদ্ধ, তাহাতে উপচয় অপচয় নাই। কেবল যে কালজ্ঞানে প্রকাশিত, সেই জ্ঞানের ক্রমপরম্পরায় হ্রাসবৃদ্ধি, জোয়ার-ভাঁটা, জন্মমৃত্যু।

জ্ঞান।—হাঁ, এইরূপই বটে। সকল খণ্ডপ্রকাশের অন্তরালে থাকে একটি অপ্রকাশ।

আমি।—বীণার তন্ত্রীতে সুরটি বাজিলেও সুরের কতখানি অনাহত ও অশ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কে বলিবে। যে কথা বলিতে চাই, তাহার বেশীটুকু বলিতে পারি না। আর সেই অনাহত অশ্রুত অব্যক্ত অবোধ্য সর্ব্বাবশিষ্টই ত্রিকালের ভগবান। তিনিই মুক্ত।

জ্ঞান।—সেই মুক্তকে পাইলেই তোমার মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞান ত অংশে অংশে পায়। তাই অনন্ত সময়ক্রমেও অনন্তকে পায় না। অংশ অংশ করিয়া অনন্তকে শেষ করিবে কেমনে? অবশিষ্ট অবশিষ্টই থাকিয়া যায়। মাতাই পিতাকে সমগ্ররূপে জানিয়াছেন, সন্তান নয়। তাই সন্তানের জ্ঞান দিয়া নয়, মাতার হৃদয় দিয়া, পিতাকে পাইতে হয়। মাতাকে জাগাইয়া না তুলিলে জীবের গতিমুক্তি নাই।

জ্ঞান।—মাতা নিজেই বদ্ধ, মাতাকে মুক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—সন্তান। মাতাকে মুক্ত করিয়াই নিজে মুক্ত হবে।

আমি।—পিতা ও মাতা পরস্পরকে সহায় করিয়া আত্মদানে এই সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে পিতার যদি একটি বিশ্বাতীত মুক্ত রূপ থাকে, মাতার কেন নাই? মাতার আত্মদানের পশ্চাতে একটি অদেয় অংশ নাই?

হৃদয়।—না। জ্ঞানে যাহা প্রকাশ, তাহা রূপ, খণ্ডরূপ। হৃদয়ে যে স্ফূর্ত্তি, সে রস-স্ফূর্ত্তি, আর রসমাত্রই নীরূপ, তাহাতে খণ্ডাখণ্ড জ্ঞান নাই।

জ্ঞান।—জ্ঞানেরই একটি অদেয় অংশ থাকে, হৃদয়ের থাকে না। জগৎ-পিতা চিন্ময়, জ্ঞানরূপী। জগৎ-মাতা মায়া, হৃদয়রূপিণী। তাই সৃষ্টিতে, প্রতিজীবদেহই জ্ঞান ও হৃদয়ের আধার। তোমার মাতা হইলেন সৃষ্টিক্রিয়ার একটি উপাদান। জ্ঞান কর্ত্তা, হৃদয় উপকরণ। আর এই উপকরণ হওয়াতেই মাতার আত্মদান পূর্ণ হয়। যেমন শিল্পীর কলাকার্য্যে শুধু শিল্পীর বুদ্ধি নয়, কিন্তু পট তুলি রঙও সহায়। কিন্তু শিল্পী জ্ঞানী, তাই শিল্পবস্তুটিতে তাঁর প্রকাশ পূর্ণ নয়। কিন্তু ঐ যে অজ্ঞানের দান, পট তুলি রঙ, —তাহাদের পরিণতি ঐ কলাকার্য্যের রূপবিন্যাসে ও বর্ণভঙ্গিমায়। সেই পট তুলি রঙই ঐ চিত্রের আকারে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শকের নিকট প্রকাশিত। ইহাই অজ্ঞানের সম্পূর্ণ দান, কিন্তু জ্ঞানের দান অপূর্ণে, অংশে অংশে, নিত্য নূতনে। জগৎ-মাতার দান অজ্ঞানের দান, তাই তাঁর নিঃশেষ পরিণতি। এই যে পরিণামী বাস্তবজগৎ, এই যে জীবসমষ্টি, এই যে মানবসংসার,

ইহাদের সকলেরই আশ্রয়ভূমি সেই জগৎ-মাতার মায়াময় দেহ। যাহাতে জন্ম, তাহাতেই আশ্রয়, আবার তাহাতেই লয়। তাই মানবদেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে পঞ্চভূতের উদয়। তাই পর্ব্বতশিলার ক্ষয়ে আবার ধূলাবালির সৃষ্টি। উদ্ভিদের দেহনাশে জীবনরূপী তাপ কয়লার খনিতে আশ্রিত। তারকার ধ্বংসে আবার অসংখ্য উল্কার ছুটাছুটি। সাগরের অতলে মুক্তার নিষ্ফলতায় আবার চূণের পাহাড়ের সৃষ্টি। অজ্ঞানের দান এই উপাদানেই। কিন্তু তোমার পিতার অংশ আছে এই জগতের প্রাণে, এই জগতের চৈতন্যে, তাঁর সত্ত্বা এই জগৎ-রূপী মহাপ্রাণীর সমষ্টিপ্রাণ ও সমষ্টিচৈতন্য, নানা আধারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও গতির কারণ। তিনি গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া সৃজন করিতেছেন, বিশ্বব্যূহে রচনা করিতেছেন। তিনি স্বরূপে ব্যূহাতীত, ব্যূহের বাহিরে। এই গতির বাহিরে তিনি অচল, তিনি মুক্ত। তাঁর সৃষ্টি তাঁকে পূর্ণ করিয়া পায় না।

আমি।—তাঁকে আর পূর্ণ করিয়া পাইতে চাই না। যতই তাঁকে জানি, ততই জানি না। যত বেশী পাই তত বেশী পাই না। যা পাইয়াছি, যা চিনিয়াছি তাই ভাল। তাঁকে পাইতে গিয়া আমি তাঁরে আপন মলাতে মলিন করি, ক্ষুদ্র জ্ঞানের পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র করি। তাঁকে আর পাইতে চাই না। তবে শুধু সেই দাতার দানটি তাঁর চরণে নিবেদন করিয়া যাই। আর এই দান-পথেই যদি একদিন,—যদি একদিন—আঁধারে তাঁর চরণ স্পর্শ করি! জ্ঞান চাই না। জ্ঞানেই যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জ্ঞানের নাশ করিয়া একদিন বা আবার আঁধারে মিলিতেও পারি। সেই

ঘোর আঁধার রাত, শুধু তাঁর হাতে হাত, শুধু শিশুর আশ্বাস, শুধু অজ্ঞানের বিশ্বাস! হায়, এ সর্ব্বনেশে জ্ঞানের নাশ করিবে কে? কে জ্ঞানী? জীব না ভগবান? এই জীবকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত ভগবান অপূর্ণ? আপনাকে জীবদেহে মাতার ন্যায় পূর্ণভাবে বিতরণ করিলেন না কেন? তবে কি জগৎ-পিতার এই আদি অবিবেচনা হেতুই তিনি মর্ত্ত্যে ও বৈকুণ্ঠে উভয় ধামেই অপূর্ণ? তাই তাঁর এই দ্বিরূপ, এই দুই খণ্ড। আর সেই খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে পাবার জন্য এত ব্যাকুল! কে বলে বৈকুণ্ঠে তিনি পূর্ণ, স্বরূপে তিনি মুক্ত! তাঁর ক্রোড় আজ শূন্য। তাঁর বিগ্রহ কোথায়? আজ অখণ্ড চায় খণ্ডকে, খণ্ড চায় অখণ্ডকে। সবাই আত্মহারা!

জ্ঞান।—জ্ঞানের সমগ্রে ও অংশে বিচ্ছেদ নাই, তাহাতে মায়া নাই, বন্ধন নাই। সে কেবল আছে হৃদয়ের। এই যে খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে চাহিতেছে, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া।

আমি।—আদিতে কে ছিল? জ্ঞান না হৃদয়?

জ্ঞান।—অরূপের কথা জানিনা, কিন্তু আদিরূপ এক,—যুগল নয়। কিন্তু সে জ্ঞান, না, হৃদয়, তাহা কেহ জানে না। সেই একেরই আত্ম-দানে দুইএর সৃষ্টি, আর সেই দুইএর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও হৃদয়ের আবির্ভাব। উভয়ের যুগপৎ প্রকাশ, আর সেই প্রকাশেই বুঝি যে জ্ঞানরূপী জগৎপিতাই আপন অংশে হৃদয়রূপিণী মাতাকে সৃজন করিয়াছেন।

আমি।—তা হইলে ত তাঁদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ? তবে কেন বিচ্ছেদ? কেন বিরহ? শুধু জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মধ্যে ব্যবধান নয়, পিতা ও মাতার মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিধি।

জ্ঞান।—পরিণয়ে মৃত্যু, ইহাই নিয়তির আদি অভিশাপ। "সন্তান-দেহে মাতার মাধুরী বিলুপ্ত। সন্তান পিতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত। আর পিতা, সন্তান ও পত্নী উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন।" ইহাই নিয়তি ঘোষণা করিয়াছে। দেবনরতির্য্যগ্‌যোনি, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল, সকলই নিয়তির বজ্রশৃঙ্খলে বাঁধা। এ নিয়তি খণ্ডন করিবে কে? দম্পতিকে এ অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবে কে?

আমি।—মানবের গৃহে গৃহেই এই অভিশাপ লাগিয়া গিয়াছে দেখি। এ অভিশাপের আদি কোথায়?

জ্ঞান।—নিয়তির আদি নির্ণয় করিবে কে? আদিস্বর্গেও পিতামহ Kronos (মহাকাল) পুত্রঘ্ন পুত্রগ্রাসোন্মুখ, আর পিতা Zeus (দ্যৌঃ পিতর দ্যাবা পৃথিবী,) বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিভুবনে জনক "মহাকাল"কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। আর তির্য্যগ্‌যোনি জৈবধারায়ও দেখিতে পাই যেমন একদিকে আদি-জননীর সন্তানপ্রসবে নিজ দেহত্যাগ, তেমনি অপর দিকে আদি-পিতা সন্তানবিরোধী, এমন কি সন্তানঘাতক, আর সন্তানও পিতৃদ্রোহী, যুথপতিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে একছত্র অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায়।

আমি।—বুঝিলাম বীজেই এই অভিশাপ। এ অভিশাপের শেষ কোথায়? আজ মর্ত্ত্যে গৃহে গৃহে পিতা ও পুত্রে এই বিরোধ, তত্ত্বে তত্ত্বে আদর্শে আদর্শে নিরন্তর সংগ্রাম। একজন ভূতের প্রতিনিধি, অপরে ভবিষ্যতের বার্ত্তাবহ। আদিম পুত্রের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাতেই বুঝি মর্ত্ত্যে জন্মমৃত্যু, ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। তাই ঘরে ঘরে সেই

আদম-বিদ্রোহ আজও অভিনীত হয়। এ অভিশাপের শেষ কোথায়?

জ্ঞান।—কই শেষ ত দেখি না। রসপর্য্যায়েও এই বিরোধ। সন্তানপালনের নিমিত্ত গৃহিণী নারীকে মাধুরী বর্জ্জন করিতে হয়। জননী আর রমণী নহেন। সেইরূপ উজ্জ্বল মধুররসে রসবতী নারীও কখনও জননী নহেন। তাই উর্ব্বশী চিরনগ্নিকা, রাধা চিরবন্ধ্যা, আর তাই যোগমায়া কাহারও জায়া বা জননী নহেন।

আমি।—এই বাহ্য, আগে কহ আর।

জ্ঞান।—এই রসে রসে বিরোধ বলিয়াই ত বৈকুণ্ঠেশ্বরী আজ পতিত্যাগিনী, মর্ত্ত্যে সন্তানদেহে অবতীর্ণা। বৈকুণ্ঠধামে পতিকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবে নিজেকে নিঃশেষ বিকাইয়া দিয়াছেন। তাই বৈকুণ্ঠেশ্বর আজ বিরহী। তাঁর বামপার্শ্ব শূন্য। তিনি মধুররসে বঞ্চিত।

জ্ঞানে যোগই ছিল, যোগই আছে। কেবল হৃদয় আসিয়াই যত ব্যবধান, বিচ্ছেদ, বিরোধ। তাই জ্ঞানে হৃদয়ের সৃষ্টিকে নির্ম্মূল না করিলে নিয়তির অভিশাপ হইতে মুক্তি কোথায়?

আমি।—তবে সন্তানের নিমিত্তই জগৎ-পিতার এই চিরবিয়োগ! আমি ছার জীব, চাই না তাঁকে পাইতে, চাই না তাঁকে জ্ঞানে। এ তুচ্ছ মিলনে কি তাঁর বিরহ দূর হইবে? এ ক্ষুদ্র হৃদয় আজ পিতৃচরণে আত্মনিবেদন করিয়া আত্মহারা হইতে চায়। কিন্তু নিজের হৃদয় দিয়া সেই সর্ব্বহৃদয়ার প্রেম কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র মনের বেদনাও কত অল্প, সকল জীবের আশ্রয়-স্বরূপা বিশ্বজননীর মর্ম্মভেদী বেদনার কতটুকু ধারণ করিতে পারি?

আমি করি কি? হে পিতা, আমার একা নিবেদনে ত মাতার বন্ধনমুক্তি নাই। আজ যদি ঐ প্রাণীসমষ্টি, ঐ অসংখ্য নরনারী, তোমার চরণে সকলে একবারে আত্মবলিদান দেয়, তবেই বুঝি তুমি তোমার বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাও! আর সেদিন আবার বৈকুণ্ঠে যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করে! হে পিতা, বজ্রবর্ষণে আমাদের সংহার করিয়া এই করাল গ্রাস হইতে জননীকে মুক্তি দাও! তোমার অর্দ্ধাঙ্গকে মুক্তি দিয়া চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠধামে সেই হিরণ্ময়-কোষে উজ্জ্বল মধুর রসের যুগল-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান কর! আমাদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ মিথ্যা জীবলীলার দরুন বৈকুণ্ঠে নিস্ফলতা! দোলমঞ্চ, রাসমণ্ডল, সিংহাসন, সকলই শূন্য! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! জীবের কলুষিত প্রেম রসাতলে যাক্!

হৃদয়।—বৈকুণ্ঠে নিস্ফলতা? জগৎ-মাতা সন্তানের জন্য স্বেচ্ছায় পতিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মাধুর্য্য উপভোগে তাঁর প্রেম পূর্ণ হইল না, তাই বাৎসল্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়াছেন। জীবকে বিনাশ করিলে সেই প্রেমময়ীকেও বিনাশ করা হইবে। তাহা হইলে পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে কোনো মতেই পাইবেন না।

আমি।—মাগো! সত্যই কি তবে তুমি আমাদের জন্য পিতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছ? কেন মা! এই অবোধ শিশুদের জন্য এই মলাধূলা, এই কলুষ, বহন করিলে! হে পিতা! হে মাতা! সন্তানদের সংহার করিয়া তোমরা উভয়ে কলুষমুক্ত হও, তাহাতেই আমরাও মুক্ত হইব। তোমরাই যে আমাদের আশ্রয়!

হৃদয়।—জীবদেহই আমার আধার। আমার আশ্রয়। আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছি। আমাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে

চাও? জীবের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক, জীবের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, সকলই আমার বিহারক্ষেত্র, আমার যে অন্য ক্ষেত্র নাই! জীবের ভীতি ও আশা, লজ্জা ও ঘৃণা, বিরহ ও মিলন, সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, সকল দ্বন্দ্বই আমার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, আমার যে অন্য প্রাণ নাই! জীবের দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য, সকল রসই আমার রস, আমার যে অন্য প্রেম নাই! আমাকে আধারচ্যুত করিতে চাও?

জ্ঞান।—এ সকলই অজ্ঞান, আমারই আশ্রিত। আমি ছাড়িয়া দিলেই ত শূন্য হইয়া যায়। সেই ভাল। তখনই ত সর্ব্বমুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞানের আশ্রিত? ইহাদের কোন্‌টার উপর তুমি দাবী করিতে চাও বল দেখি? ইহাদের ভোগে তুমি অনাহুত, অনিমন্ত্রিত। তুমি কারও নও, তোমারও কেহ নয়। কিন্তু ভোগের শেষে সেই যে মীমাংসা, সেই মীমাংসাটুকুর জোরে, সেই মীমাংসার উপর আধিপত্য করিয়া, তুমি, জ্ঞান, আমাকে সমূলে বিনাশ করিতে চাও? তোমার ঐ নির্ম্মম সর্ব্বগ্রাসী করাল দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্যই বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে জীবের জন্য বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছি। আজ তুমি সে অধিষ্ঠানও কাড়িয়া লইবে? নির্ব্বাসন থেকেও নির্ব্বাসিত করিবে? আমি তোমার ঐ চোখকে ডরাই। ও চোখ যেখানে পড়ে, সব শূন্য হইয়া যায়, সব ধূ ধূ করিতে থাকে।

আমি।—হৃদয় দিয়াই পিতাকে জানিয়াছি, হৃদয়ই মাতাকে উদ্ধার করিবার একমাত্র সম্বল। যেদিন হৃদয়ে হৃদয়ে সর্ব্বহৃদয়া জাগিবে, তখনই জগৎ-পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে পাইবেন। আর

তখন সন্তানের হৃদয়ই পিতা-মাতার ব্যবধান না হইয়া মধুর-রসের মিলনভূমি হইবে। এবার জ্ঞানের, যুক্তি বিচার মীমাংসা সংহার করিয়া হৃদয়কে বন্ধনমুক্ত করিবার পালা। তবেই মাতার মুক্তি। আজ জ্ঞানকে সংহার করিব। জ্ঞানের দরুনই বিচ্ছেদ। জ্ঞানেই এই ফাঁকা, এই নিরালম্বতা।

জ্ঞান।—চৈতন্যকে সংহার? আমিই ত জীবে জীবে চৈতন্য। আমাকে সংহার করিলে, হে হৃদয়রাণী, হে মায়াবন্ধনঘটনপটীয়সী তোমার মায়া তিষ্ঠিবে কোথায়? তার সার্থকতা কোথায়? হৃদয়কে বিকাইয়া দিবে, কিন্তু আমি বিনা সে হৃদয়কে তুলিয়া লইতে জানে কে? তোমার দান গ্রহণ করিতে জানে কে? আর আমি যদি দান ভোগ না করি, তবে, হৃদয় তোমারই বা করুণার মহিমা ব্যক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—আমি ত তোমাকেই চাই। বৈকুণ্ঠে যে হিরণ্ময় যুগলধাম আছে, এই জীবদেহ, তোমার আমার আধার, সেই আদর্শেই গঠিত। জীবে জীবে আমাদের যুগলমূর্ত্তি। আমরাই আদর্শ দম্পতি। জগৎ-পিতা যে জগৎ-মাতাকে চায়, সে ত জ্ঞানের হৃদয়কে চাওয়া, জগৎ-মাতা যে জগৎ-পিতাকে চায়, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া। আজ সে বৈকুণ্ঠে বিরহ, আজ আমাদের প্রেমলীলাভূমি জীবে বিরোধ। প্রাণে প্রাণে জীবে জীবে আমাদের মধুর মিলন চাই, তবেই ভগবানের বিরহ ঘুচিবে, তবেই তিনি তাঁর মধুর রসের বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাইবেন।

আমি।—বুঝিলাম। এই জ্ঞান ও হৃদয় সেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতারই বিলাস। একজন মায়াতে নির্লিপ্ত, একজন নরনারী-

দেহে ছিন্নভিন্ন। জীবই তাঁহাদের মিলনের অন্তরায়, আবার জীবই তাঁহাদের মিলনের সোপান। জীবনের স্বেচ্ছাসামর্থ্যের উপর ভগবান ভগবতীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। জ্ঞানের স্থিতিতে, জ্ঞানের দানে, সর্ব্বদাই এইরূপ একটি তৃতীয়ের স্থান আছে, যাহার ভিতর দিয়াই দুইএর সার্থকতা, অথবা যাহার জন্যই দুই-এরই নিরর্থকতা, নিষ্ফলতা! জ্ঞানরাজ্যে এ অভিশাপ কেন? এ অপেক্ষা, এ পরতন্ত্রতা, কেন? এ বিচ্ছেদ, এ ব্যবধান কেন? আজ আমিই সেই জ্ঞানরাজ্যে মূর্ত্তিমান অভিশাপ! হায়! কেমন করিয়া এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া মাতাকে মুক্তি দিব!

মাগো! একবার ভাল করিয়া জাগো! আর নীরব হইয়া থাকিও না। হৃদয়ের অন্তঃপুর ছাড়িয়া একবার চোখের সামনে দাঁড়াও, এই নিঠুর ধরণীবক্ষে সেই করুণাময় সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দাও।

তোমার মনের কথা বল! মাগো! তুমি কি চাও? কিসে তোমার মুক্তি? জানি না, মাগো হয় ত বা তুমি এই ভাবেই মুক্ত! অবোধ আমরা, কিছুই বুঝি না। তুমি আমাদের সকলের মা। আজ আর এই তোমার কন্যার কাছে নীরব হইয়া থেকো না। কি চাও বল, তোমার সকল জ্বালা :সকল বেদনা তোমার অভাগা কন্যা সহিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াও একদিন বুঝিয়াছি, পতিকে আমাদের জন্য বিসর্জ্জন দিতে তোমার করুণ প্রাণে কি ব্যথা! তাই বুঝি তুমি মূক হইয়া আছ। স্বেচ্ছায়

অনন্ত সাগরবক্ষে ভাসাইয়া সখা
মূক আর্ত্তনাদে তুমি তীরে পড়ি একা!

জগৎ-মাতা।—বৎসে, মধুররস বড়ই মধুর, কিন্তু তাহা বিসর্জ্জন না দিলে বাৎসল্যের অধিকার কোথায়? একটিকে ত্যাগ না করিলে অপরটিকে পাওয়া যায় না। একদিন আমি তাঁহারই একমাত্র আদরিণী সোহাগিনী ছিলাম। কিন্তু আজ সে সোহাগ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরম পিতাকেই তোমাদের রূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সেই ভগবান আমার পতি, তিনিই আজ অংশে অংশে আমার সন্তান। আজ নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিল। নারীজীবন আজ ধন্য। সেই জগৎ-পতিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমি জগৎ-মাতার পদে আরূঢ়া! আর তাই আজ জগতে নারীমূর্ত্তিই ধন্য! তাই সংসারে সংসারে নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়াছে। এমনি করিয়াই মাতৃত্বের ভিতর দিয়া পতিকে তাঁর পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। নতুবা পতি ও পত্নীর ব্যবধান অনতিক্রমনীয়, বিরহও নিত্য। সন্তানরূপে পতিকে লাভ করিলে বিবাহ-ডোর সার্থক হয়, সে বন্ধন আর শিথিল হইতে পারে না। সন্তান ও জননী যে একই রক্তমাংস একই দেহমনপ্রাণ। তাই সেথায় বিরহ বিচ্ছেদ ব্যবধান নাই। তাই মর্ত্ত্যে যুগলমূর্ত্তি সন্তান ও মাতাকে লইয়াই। এই পূর্ণ ভগবান মাতার শরীরে স্বপ্রকাশ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভগবানকে নিজদেহে ধারণ করিয়া তাঁর অনন্তরূপ দেখানই আমার কাজ।

বৎসগণ, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। কিন্তু জানিনা আজ সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের হৃদয়ে কিসের দুঃখ, কিসের বিরহ। এইমাত্র বুঝি এই সন্তানদের ভিতর দিয়াই তিনি একমাত্র আমাকে পাইতে পারেন। যদি তাঁর প্রাণ আমার জন্য কাঁদে, তবে হে জীব, হে সন্তান, তুমিই একমাত্র তাঁর সান্ত্বনা। তুমি তাঁর

চরণে আপন হৃদয় নিবেদন করিয়া তাঁর বিগ্রহ আনিয়া দাও। ভগবানের বিগ্রহরূপিণী আমি, জীবদেহে অবতীর্ণা, তাই জীব ব্যতীত তাঁর আমাকে পাইবার আর কোনো উপায় নাই। এই জীব-সমষ্টিই আজ তাঁর বিগ্রহের স্থান পূর্ণ করিতে পারে।

আমি।—আমার হৃদয়ে মা আমার জাগিয়াছে। এই যে তাঁর বাণী শুনিতে পাই। বুঝিলাম আমার হৃদয় আজ আর আমার নয়, সেই জগৎ-মাতার! আর তাই আজ হৃদয় এমন উদাস হইয়া বৈকুণ্ঠের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়! আজ এই যে চাওয়া, এ ত সন্তানের পিতাকে চাওয়া নয়, এ যে মাতার পিতাকে চাওয়া। মা আজ আমার উঠিয়াছে! এই যে গোলকের সীমানায় কত কাঁটা ঝোপ, কত নির্জ্জন বন্ধুর কান্তার, কত অন্ধ গিরিসঙ্কট, কত ছায়াময় মৃত্যুপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এ যদি মায়ের হৃদয় না হইত, তবে কি এমন করিয়া এই অকূলের সন্ধানে আসিতে পারিতাম। সেই মায়ের হৃদয় পাগল হইয়া আমাকে এদিকে আনিয়াছে। আজও মাতা পিতাকে চায়। তবে তাঁহার প্রেম তিনি ব্যক্ত করেন না, সন্তানকেই পূর্ণ করিবেন বলিয়াই। আমাদের হৃদয়ে যে বিরহবোধ জাগে, সে ত মায়ের বিরহ। মন আমার, একবার সেই বিরহকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তোল। বিরহ যত গাঢ় হইবে, মিলনও তত সম্পূর্ণ হইবে। আর তবেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মাধুর্য্য আরও মধুর হইয়া উঠিবে।

আজ আমার হৃদয় জাগিয়াছে। কিন্তু সকল জীবের হৃদয় না জাগিলে ত হৃদয়েশ্বরী জাগিবে না। আজ আমি এই গোলকের সীমানা হইতে ফিরিয়া যোগমায়ার মত বিশ্বপথে দাঁড়াইয়া আমার

বীণা বাজাইতে থাকি। অঙ্গে সেই মায়ের দেওয়া গৈরিক, মায়ের গীত। গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে, ঘুরিয়া, এই বীণার সুরে হৃদয়ে হৃদয়ে বৎসল মাধুর্য্য জাগাইয়া তুলি। যাহাতে প্রতি প্রাণ উদাস হইয়া পিতার দিকে ছুটে, পথের ধারে ধূলাখেলা ছাড়িয়া তাঁর ক্রোড়ই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিতে শেখে। একবার মায়ের বিরহ জাগাইয়া তুলিয়া বিরহাসক্তিতে উদাস করিয়া তাদের প্রাণভরে কাঁদাই। তারা যেন হা পিতা হা পিতা বলিয়া সেই জগৎ-পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। হায়! সেদিন কবে হবে?

জগৎ-পিতা।—(আকাশবাণী) ধন্য জীব! সার্থক তোমার জন্ম! সার্থক তোমার প্রেম! তোমার মাতা আজ মূর্ত্তি পেয়েছেন। হে কন্যা! সকল জীবের প্রতিনিধি তোমার মাঝে আজ আমি সেই বিশ্বমাতৃকাকে দেখেছি।

* * * *

হৃদয়।—(স্বগত) এমনি করিয়াই নিয়তির অভিশাপ খণ্ডিত হয়। রসে রসে বিরোধ ঘুচিয়া যায়। যেখানে একটিমাত্র রস, সেখানে মাধুর্য্য নাই। তিনটি রস না মিশিলে মধুররস হয় না। তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেত ফুটিয়া উঠে। যুগল, সন্তান, পিতামাতা, তিনটি উপকরণ। মা ত শুধু মা নন্, পিতার বিগ্রহরূপিণীও তিনি, আবার পিতাও শুধু পিতা নন্ কিন্তু মার পতি। পত্নী শুধু পত্নী নন্, কিন্তু সন্তানের জননী, পতিও শুধু পতি নন্ আবার সন্তানেরও জনক। আর তাই সন্তানসেবা করিতে করিতে কালে পতিপত্নীর যুগলপ্রেমেও একটা বাৎসল্যের আভাস আসিয়া পড়ে। তেমনি আবার কালে পুত্র বাপমার বাপ, ও কন্যা মা হইয়া

দাঁড়ায়। তাই দেখি যেখানে কেবল দুই, সেখানে একটিমাত্র যুগ্ম একটিমাত্র রস। যেখানে যুগ্মের সম্পর্কে তৃতীয় আছে, সেখানে কোনও না কোনও ছাঁদে দুই-দুই করিয়া তিন যুগ্ম, তিন রস সম্ভবপর হয়। আবার তিন রসে তিন যুগ্মরস, আবার তাহা হইতেও তিন, এইরূপে তিনে তিন অনন্ত ধারায় চলিতে থাকে। তিনই অসংখ্যের বীজ,—এক দুই নয়। বিষ্ণু ত্রিপদবিক্রমেই সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া ছিলেন। আজও তাঁহাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই বিশ্বচ্ছন্দ ত্রিপদী, বিশ্বসুর তেতালা। সেই জন্যই মানব-বিগ্রহ ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্ন—যুগল, সন্তান, পিতামাতা। কিন্তু এ বিগ্রহের কোনো একটি রসমূর্ত্তি হয় বিম্ব, অপর দুইটি যেন তার দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্ব, আর এই বিম্ব-প্রতিবিম্বলীলায়, এই বিচিত্র বর্ণভঙ্গিমায়, ললিত মাধুরী ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ভগবান, তিনি সর্ব্বরসাধার। তিনি একেই তিন, তিনেই এক, সত্যই ত্রিমূর্ত্তি (Trinity)। পিতা বা মাতা, প্রিয়তম বা প্রিয়তমা, সন্তান,—এ তিনই তাঁহার বিলাস। গুরু বা শিষ্য, সখা, প্রভু বা দাস, এ সকল আবার বিলাসের বিলাস। এই তিন যুগ্মের প্রতিরূপই তাঁর রূপে। তাই ভগবৎ আধারে তিনটি রসের সংমিশ্রণ, কেবল প্রতিবিম্বাভাস নয়। আর সেই জন্যই ভগবৎ-প্রেমই মধুররসের পরাকাষ্ঠা, শুদ্ধশ্বেত, নিত্যোদিত। ইহাই রসের স্বরূপ, স্বরূপের রস। এই নিত্যসিদ্ধ প্রেমই মহাভাব, আর বাকী ভাবজগৎটা কেবল তার বিভাব, হাবভাব।

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা।

উপহার

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কি তোমারে দিব দান ?
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে ?
কি তোমারে দিব আনি ?
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কি মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার
তার ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে !
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি,—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা

একটি রঙীন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই ত তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই ত তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্য-বাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া আসিয়া শীতের ঘন পর্দ্দাটাকে উড়াইয়া দিয়াছে। বসন্তলক্ষ্মী নেপথ্যে বসিয়া তাঁর সাজসজ্জা সুরু করিয়াছেন তাহা অসময়েই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমাদের মনে হইল সমস্ত পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে যেন একটা ব্যথার টান টনটন করিয়া উঠিয়াছে;—আকাশের আলোর মধ্যে সেই ব্যথা, সেই ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে খাপছাড়া হাওয়ার মধ্যে, গাছপালার কাঁপনি ও ঝরঝরানিতে, আর আমাদের বুকের ভিতরে, যেখানে দীর্ঘনিশ্বাসগুলো মাঝে মাঝে বিনাকারণে ক্ষ্যাপামি করিতে থাকে।

দামিনী এতদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ছিল। আমাদের মধ্যে যখন রসালোচনার ঢেউ উঠিত তখন শচীশের মুখে-চোখে ঠিক যেন বীণার তারের পরে ওস্তাদের পাঁচ আঙুল নাচিতে থাকিত। যে সব কথা আমরা শুনিতাম দামিনী তাহা শুনিত কিনা জানিনা, দামিনী তাহা দেখিত।

কিন্তু গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড় দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে কিন্তু পারৎপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের

সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে; সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মত করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই,—ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে সুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইসারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্ত্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধু-কোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। অকাল বসন্তের আতপ্ত দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। সম্পূর্ণ পরিমাণ জল শুষিয়া লইয়া স্পঞ্জের যে দশা হয় আমাদের মগজটা সুরের রসে সমস্ত ফাঁকে ফাঁকে তেমনিতর ভর্ত্তি হইয়া গেল। জগৎ আমাদের কাছে আপন রূপ ছাড়িয়া দিয়া একটা রূপক হইয়া উঠিল—মনের ভাবনা যেন বেদনায় গলিয়া হেমন্তসন্ধ্যার রাঙা কুয়াশার মত মনকে দিগন্ত হইতে দিগন্তে ছাইয়া ফেলিল।

কিন্তু কই, দামিনী ত ধরা দেয় না। গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্ত-মণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না-দেখিতে-পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মত আমাদিগকে এদিক ওদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহঙ্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহঙ্কারে কেবলি ঘা দিতে থাকিত। আর আমি—আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

শচীশ নিজেকে এতদিন ভুলিয়া রসের সমুদ্রে ডুবসাঁতার কাটিতেছিল। কিছু দেখা নয়, শোনা নয়, কাজ নয়, কর্ম্ম নয়, কেবল একটা কূলহীন তলহীন বেদনাকে, সমস্ত মন দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া। এমন সময় দামিনীতে আসিয়া একটা শক্ত জায়গায় যেন ধাঁ করিয়া তার মন ঠেকিয়া গেছে।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বল দেখি?

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে? কেন?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দম্‌কা হাওয়ার মত চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে ত অবাক্। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে—আর ঐ একটুখানি মেয়ে, ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ?

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষ ভাবে একটা বড়-রকমের কথা পাড়িলেন। খানিকদূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুমঝুমির মত বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কি করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে

পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে ; তারপর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই ত গেল চিল, আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্ত্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে ; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চ্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন ?

কোন্‌খানে ?

গুরুজির কাছে ?

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন ?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার ত প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছুনা, কিছুনা !

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখ তোমার মন অশান্ত হইয়াছে যদি শান্তি পাইতে চাও, তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে ? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলি ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায় ? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা কর আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো দোহাই তোমাদের আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মত অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে বাহির হইতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে-লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে, আর তা যদি না হইল তবে এমন কারো দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জ্জন করে যারা আমাদের মত মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি, নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে অর্থাৎ এটুকু জানে যে তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয় আবার সুরে তৈরি বীণার ঝঙ্কারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দ্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙীন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারিনা, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না; তারা যা, আমরা

তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি—এইজন্য তারা যদি বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয় ত বা তারা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—যাক্ এ সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত, অন্তত সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁসে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া, দামিনী শচীশকে কেবলি এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কি দেখিল কি হইল সেই সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে—পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয় ত সামান্য না হইতে পারে কিন্তু আমি জানিতাম শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে

ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী শক্তি ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে;—সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্ব্বে শচীশের চোখ কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে সুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল গোয়ালা-বাড়ি হইতে একভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত এটা মুলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন কি, বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইখানে রাখিয়া আত্ম মর্য্যাদা উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না, বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?

আমি মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলাম—একবার—

দামিনী বলিল, উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন না।

শচীশের সাম্নে দামিনীর এই প্রকার অনুরোধে আমার কান ছুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুস্কিল হইয়াছে,—কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড় দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাঁকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ-খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সাম্নে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেইদিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিষটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি শচীশ যেদিক দিয়া চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল—সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কি যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিনজনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয় অথচ উপলক্ষ্য সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুস্কিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ-মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা ত একটা প্রকৃত জিনিষ, তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে ত বাদ পড়ে না। অতএব সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখ। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পাবে না। সেই জন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই সমস্ত দূতী-গুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কি-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতিব মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দররূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোষ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চষমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকেসুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কি সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবুই মানিতেছি ভাই কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতিব উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই আমরা সে রাস্তায় চলিতেছিনা তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কি রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বল, শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে স্রোতটাকে কি করিয়া বাদ দিব, সমস্যা এই যে, তরী কি হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেই জন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা-টিপিতে সুরু করিয়া দিল। সেই দিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

একদিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেকদিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘুর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শিবতোষ বাড়িঘর-সম্পত্তিসমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এদিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা-টিপিয়া তামাক-সাজিয়া কিছুতেই এ কথা ভুলিতে

পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্ত্তনওয়ালার কীর্ত্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্ করিয়া উঠিয়া আসিলাম, আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারো কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড় সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরী দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন্ যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্ত্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরী ছিল। বুঝিলাম ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলি ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোন দামিনী একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি ত সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিল, সে কহিল, কেন আছি? আমি কি সাধ করিয়া আছি? তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে! তোমরা কি আমার আর কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কি?

তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মৎলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মৎলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন, মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?

শচীশ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের

ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্ত্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ-হাওয়ায় দূর-সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মত নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জ্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলি আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাৎ হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারি মত, এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চ্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরো বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে হয় ত আমি, শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন ত।—শ্রীবিলাসবাবুকে কি যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়;—কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব?

তোমার মাসীর ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন?

প্রথম, তিনি আমার আপন-মাসী নন, তার পরে তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন ?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—

দায় কি কেবল খরচের ? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব ?

সে জবাব কি আমার দিবার ?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে ?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি আমার মাসী নাই, বাপ নাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই কড়ি নাই কিছুই নাই। সেই জন্যই আমার ভার বড় বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন!

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে-লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে

নির্জ্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কি হে শ্রীবিলাস, এ সব বই কিসের জন্য?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই চারিটা পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ ত বড় পাই না।—লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন ত সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একবারে জর্জ্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সূক্ষ্মমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক্।—বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি ত তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কি করিয়া?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কি করিয়া?

আমি পূর্ব্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কি?

আপনার কোনো প্রয়োজনে ত কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান!

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন্।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে,—শচীশ সমুখ দিয়া বারবার আসে আর যায়, মনে করে বসিয়া পড়ি, অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেখানেই গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলি নিঃশব্দে উল্‌টাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিলনা যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃকপাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী, দামিনী।

দামিনী তখনি দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কি চেহারা? প্রচণ্ড ঝড়ের-ঝাপট-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল

আচ্ছন্নের মত ভাবখানা ;—চোখ দুটো কেমনতর, চুল উস্কখুস্ক, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ কর।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কি কথা আপনি বলিতেছেন ?

না, আমাকে মাপ কর। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এতবড় অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না—কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনি নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম কর তুমি !

শচীশ কহিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।—এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল। এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫.

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চ্চনায় সেবায় মাধুর্য্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্ত্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার

সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল ; দিনের মধ্যে যখনি তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন তাঁর দিনে-বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলা ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেকবার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনো মতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্য্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। তখন শচীশ দামিনীকে বাদ দিয়া দামিনীর প্রণতিটুকু আপনার রসসাধনার মসলার মত ব্যবহার করিয়াছিল।

এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গান-গুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

দামিনী একটা কি তফাৎ বুঝিল। আগেও ত কীর্ত্তন হইতে হইতে শচীশের চোখ মাঝে মাঝে তার মুখের উপর আসিয়া পড়িত—কিন্তু সেই চোখের সামনে বরাবর একটা ভাবের ঘোরের পর্দ্দা ছিল তাই দামিনীকে কখনো চোখ নামাইতে হয় নাই। শচীশ সর্ব্বদা নিজের মধ্যে এত দূরেই ছিল যে দামিনী তার অত্যন্ত কাছে যাইতেও কোনো দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই। তখন দামিনী মনে করিত তাকে ছুঁইলেও যেন ছোঁওয়া যায় না।

কিন্তু আজ শচীশ তফাতে থাকিলেও যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এমনি মনে হইল। সকলকে পরিবেষণ করিবার সময় শচীশের পাতে কিছু দিতে তার যেন বাধিত। কতবার সে ভাবিয়াছে আমি পালাইয়া যাই, আড়ালে থাকি, কিন্তু সে যে হুকুম পাইয়াছে, তফাতে থাকিয়ো না, সেই হুকুম সে কিছুতেই ঠেলিবে না। তাই মনে মনে সে দিনরাত জপ করে, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার পরে তার সমস্ত

ফরমাস হঠাৎ একেবারেই বন্ধ। আমার যে কয়টি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গিহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্ব্বের মত ভর্ত্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথা-বার্ত্তা গান-বাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

৬

এক-একদিন শচীশের মন খুলিয়া গেলে সে ভাবের ব্যাখ্যায় আমাদের দেবদেবী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে এমন একটা কাব্যের ধুনারিতে তুলা ধুনিয়া দেয় যে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। শচীশের পড়াশুনা অগাধ এইজন্য সে যখন ব্যাখ্যা সুরু করে তখন বিদ্যার একটা প্রেতলোকের দ্বার খুলিয়া যায়, সেখানে দেহহীন মতগুলা কে কার সঙ্গে মিলিয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কে কঁৎ আর কে মনু, কে কপিল আর কে হেগেল বাছিয়া লইবার উপায় থাকে না; ইহার উপরে যখন দেবদেবীদের সত্তার সঙ্গে ন্যুটন ডার্ব্বিনের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব মিলিয়া সমস্তটা আশ্চর্য্যরকমের ঝাপসা হইয়া যায় তখন গুরুজি পর্য্যন্ত তামাক টানিতে ভুলিয়া যান। সেদিন একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব্ব আরক বানাইতেছিল এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো একবার তোমরা শীঘ্র এস।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কি হইয়াছে?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়—আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্ত্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, আর কয়েকমাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এই রকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পিড়াপিড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিল—তিনি কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চাল্‌তা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানকার ছায়া আলোর সঙ্গমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি

করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া ওঠে। হঠাৎ একসময়ে শচীশের কি মনে হইল সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী।

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়-হাত করিয়া কহিল, প্রভু আমার একটা কথা শোন।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কি প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কি সে ত আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম্ম, না আছে কর্ম্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্ব্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কি উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চ্চা করিবার ফন্দী করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে একমুহূর্ত্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই ত তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কি তার কুৎসিত চেহারা সে ত দেখিলে? প্রভু জোড়হাত করিয়া বলি ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে ত সে তুমি!

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারিদিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বল আমি তোমার কি করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিব। যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন গুন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়িঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মত আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কি তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই। বিবাহের মাসখানেক পূর্ব্বে আমি দামিনীর কাছে শচীশের সঙ্গে তার সম্বন্ধের ঘটকালি করিতে গিয়াছিলাম। দামিনী আমাকে বলিল, সে কি কথা? তিনি যে আমার গুরু, আমি যে তাঁর কাছে দীক্ষা লইয়াছি।

কবে দীক্ষা লইয়াছ?

সে কথা কেহ জানে না। আমার গুরুও স্পষ্ট জানেন না। সেই কঠিন দীক্ষার চিহ্ন আমার বুকে এখনো আঁকা আছে।

আমরা যখন লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম,

তখন দামিনী শচীশের কাছে আসিয়া কহিল, আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী বলিল, এখানে আমার জায়গা নাই, আমাকে তোমার সঙ্গ লইতেই হইবে।

শচীশ তখনো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী আমাকে ডাকিল, শ্রীবিলাসবাবু, এস, জিনিষপত্রগুলা গুছাইয়া লই।

অনেকদিন পরে আমাকে এই আবার দামিনীর প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন এখনো চলিতেছে। দুইজনে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিচার

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়!
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার!—
তার পরে দেখি,
এ কি,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,—
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা

তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে যায়!
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ কূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দ্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্ব্বার
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর, প্রেমিক আমার
কর গো বিচার!

তার পরে দেখি
এ কি,
কোথা তব বিচার-আগার ?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তা'রা, মুগ্ধ তা'রা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সঙ্গোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

চোরা-ধন দুর্ব্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার,—
এদের মার্জ্জনা কর, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জ্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে?
হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

সাহিত্যে বাস্তবতা

সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' শ্রাবণসংখ্যায় কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই লিখিয়াছেন, "এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না।" "প্রবাসীর" আষাঢ়সংখ্যায় 'লোক-শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। অন্য কেহ ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা জানিনা। রবীন্দ্রবাবুর আলোচনা আমার প্রবন্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছে তাই মনে করিয়া আমি একটা প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ আলোচনা ও অনুধাবন যোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান-সাহিত্য রবীন্দ্রবাবুর মত ও আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে তাহার উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার একটা প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার ভার লয় নাই।" সাহিত্যের সাধনা,—আনন্দ-রস সৃষ্টি, আর সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা—সমাজকে আনন্দের দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। প্রায়ই দেখা যায় যখন সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে তৃপ্তিলাভ করে, সমাজ-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে আনন্দলাভ করে না, তখন সে সাহিত্য ধীরে ধীরে সমাজের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ হারাইয়া আত্মম্ভরিত্ব দোষে দুষ্ট হয়। সাহিত্যে আত্মম্ভরিত্ব দোষ প্রবেশ করিলে সাহিত্য কৃত্রিম হইবেই, তাহার উন্নতি অসম্ভব।

নানা ভাব চিন্তা অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির পথপ্রদর্শক যুগনির্দ্দেষ্টা ভাবুকগণ। যুগনির্দ্দেষ্টাগণের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমাজ যুগে যুগে কণ্টকময় পথ দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিককালে শিল্পী নহে, ধর্ম্মপ্রচারক নহে, সাহিত্যিকগণই যুগনির্দ্দেষ্টার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যের চরমসাধনা হইয়াছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়লোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না। নানা লোকের নানা অভাব, নানা সুখ-দুঃখের মধ্যে না পড়িলে সাহিত্য অবাস্তব থাকিবে।

সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই,—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে;—যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে; আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-রসের আস্বাদন করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে। সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদ্মের উপরে। কাব্য-যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে।" রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, রসেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। অথচ ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। কাব্য

যে গুণে স্থায়ী হয় তাহা নিত্য-রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর গুণে। প্রত্যেক কাব্যেই যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে আমরা অনিত্য-রসের আস্বাদন করি, ইতিহাস-বস্তুরও সাক্ষাৎ পাই। সেই কাব্য নিত্য, যে কাব্য ইতিহাসের উপাদান না জোগাইয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। নিত্য-রসস্বরূপ পদ্মের উপর সরস্বতী চরণ রাখিয়াছেন। পদ্ম কত প্রকার,—নীল, শ্বেত, রক্ত;—বিভিন্ন বাস্তবের ভিতর দিয়া পদ্ম বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সরস্বতীচরণতলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশকাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, সবই নিত্য-রসের অভিব্যক্তি; আবার প্রত্যেক মৃণাল, প্রত্যেক লতিকা,—নিত্য-বস্তুর বিকাশ।

মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।" বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।

লতাকে উপেক্ষা করিয়া ত ফুল ফুটে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রস সৃষ্টি করিতে চাহে, তবে সে রস কাগজের ফুলের মত অলীক ও কৃত্রিম হইবে—সে রস হইতে কেহ তৃপ্তি পাইবে না, জীবন পাইবে না!

আসল ফুল কাগজের গাছে ফুটে না—সরস জীবন্ত গাছে বিকশিত হয়। জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব, সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে—সমগ্র জাতির হৃদয় হইতে তাহার রসসঞ্চার হয়। এই রসসঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ। এই রসসঞ্চার না হইলে

সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে ফুটিয়া উঠিবে না শুধু তাহা নহে, সাহিত্য তাহার জীবনীশক্তি হারাইয়া নীরস গাছের মত—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।

বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ফুল ফুটে। বিভিন্ন বাস্তবে এক গাছের ভিন্ন ফুল দেখা যায়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বিকাশসম্বন্ধে একই নিয়ম খাটে। গোলাপগাছে জবাফুল ফুটে না, জবাগাছে শিউলিফুল পাওয়া যায় না। আবার স্থান কাল ও অবস্থাভেদে একই গাছের ফুলের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়,—ইহা শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, লোকসাধারণও বলিবেন। সাহিত্যের পক্ষেও তাহাই। সাহিত্য স্থান কাল ও অবস্থাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে বিভিন্ন সত্যের উপলব্ধি করে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

ফুলের মধ্যে যেরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হয় সেরূপ সত্য ও সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ হয়। কিন্তু সবগুলিই যেমন ফুল, সেরূপ সাহিত্যের সব সৃষ্টিই সত্য ও সুন্দর। একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটী হইতে রসসঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া এককথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলিফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেরূপ ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের সাধনা,—সত্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়া সে সাধনা বিভিন্ন হইয়াছে। অথচ দেশে দেশে যুগে যুগে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরম সত্য-সুন্দরের মূর্ত্তি সাহিত্যের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিবর্ত্তনশীল বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্যকে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে লাভ করা সাহিত্যের চরম সাধনা। শুধু লাভ করা নহে, নিত্য-রস ও

নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করাও সাহিত্যের সাধনা। হীন ও নিকৃষ্ট বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া মহনীয় ও সুন্দর হইয়া উঠিলে সাহিত্য-সাধনা সফল হয়। হেয় বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সংঘাতে পরিবর্ত্তিত হইবেই—এই পরিবর্ত্তন সংঘটনেই সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "রসের একটা নিত্যতা আছে।" আর নিত্য-রসের গুণেই সাহিত্য স্থায়ী হয়। সাহিত্যে যদি কিছু নিত্য ও সর্ব্বজনভোগ্য রস থাকে তাহার উৎস পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা রসের নিত্যতা কিছুই দেখিতে পাই না। ইউরোপে হেটায়রা-বহুল গ্রীক সমাজের সহিত মধ্যযুগের রমণীপূজার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার মধ্যযুগের চিভাল্‌রী আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে একবারে লোপ পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধের বিভিন্ন আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে, যুগধর্ম্মের অনুযায়ী বিভিন্ন আদর্শের পুষ্টিবিধান করিয়াছে,—অথচ এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা প্রত্যেক সাহিত্যের ভিতর যুগধর্ম্মের প্রভাব ও দেশকালপাত্রভেদকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ হইতে একটা নিত্য-রসের পরিচয় লাভ করিতে পারি। সাহিত্যের চঞ্চল রস-স্রোতের মধ্যে সেই সনাতন পুরুষ ও নারী নিত্য ভাসমান।

সাহিত্য এরূপে অনিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে; আর নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে, বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য তাহা ধসিয়া পড়ে, একটা সুন্দর, মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। এইখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-

মাষ্টারির ভার লয় নাই।" রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগ-নির্দ্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক,—তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে —কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ 'এ কি কথা'! রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন, আর্টের কোন বন্ধন নাই;—সাহিত্য ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতির কোন ধার ধারে না,—তিনি সাহিত্যকে সর্ব্ববন্ধনবিহীন মুক্ত স্বাধীন করিতে চাহেন।

কিন্তু "এ প্রকার সাহিত্য কি মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? যে সাহিত্যের সহিত মনুষ্য-জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোন সম্বন্ধ নাই, সে সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে সত্য, বিচিত্র মধুর রস উৎপাদন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানুষের আত্মার নিকট সে সাহিত্য মূঢ়—নির্ব্বাক।

যে সাহিত্য সর্ব্ববন্ধনহীন, যে সাহিত্য সমাজের শিক্ষার ভার লয় না, মানব-প্রকৃতির বিচিত্র সমস্যার আলোচনা করা যাহার পক্ষে একটা কঠোর বন্ধন, সে সাহিত্যসম্বন্ধে রুডল্‌ফ অয়কেন, তাঁহার বিখ্যাত "Main Currents of modern thought" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

Art of this type may make great discoveries in the sphere of sense-experience; it may be able to enrich and perfect our sensibilities in undreamt-of fashion; it may revel in the overcoming of difficulties, but it can bring but little benefit to the human soul, and it will not be able perceptibly to elevate spiritual life.

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য-রত্নগুলি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব সেগুলি মানব-প্রকৃতির ভিতরকার একটা নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছে, মানবের ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—একই সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও মানুষকে পরম সত্যের দিকে লইয়া গিয়াছে।

Was it not characteristic of the great works of art which have made a permanent appeal to man that in them all opposition between form and content was overcome; in their perfection of form have they not at the same time given full expression to the content of the inner life? Should not art take up the problems of humanity and attempt to solve them after its own fashion?

সাহিত্য আধুনিক মানবের বিচিত্র সমস্যাগুলির আলোচনা করিবে, নানা মুনির নানা মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করিবে, মানুষকে নানা কুটিল কণ্টকময় কুপথের মধ্যে একটা সোজা সহজ পথ দেখাইয়া দিবে, সাহিত্য জীবনের আলোচনা করিয়া নূতন সুন্দর জীবন গঠনের সহায় হইবে। আরও একবার অয়কেনের কথা তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

মানুষ এখন আপনাকে খুব কম বুঝিতেছে, চিন্তার রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়াছে, নূতন নূতন চিন্তাস্রোত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, জীবনের গতিও খুব দ্রুত ও চঞ্চল হইয়াছে, মানুষ এখন আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিক সুযোগ পায় না। এই সংশয় ও আন্দোলনের মধ্যে সাহিত্যের কর্তব্য যে কি তাহা বলা সহজ।

Literature has an obvious task. It should help to clarify our ideas, to bring to clear expression all that is around us and within us, to point out simple lines of development amidst the chaos of appearances with which we are surrounded. It should as far as possible gather life into a whole and at the same time assist in the

work of developing it. For this purpose it has need of an inner superiority to raise it above the oppositions of the age, of an energetic synthesis which can reject as well as absorb, of a courageous and powerfully progressive spiritual creation.

মানুষের অন্তর-প্রকৃতি ও বাহিরের সমাজের ভিতর যে ভাব ও চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে, সেই আলোড়নের মধ্যে গন্তব্যপথ নির্ণয় করা, জীবনকে চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করিয়া ধ্রুব আদর্শের দিকে প্রেরণ করা, জীবনকে গঠন করা সাহিত্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য তখনি সম্পাদিত হইবে যখন সাহিত্য যুগের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে আপনার নিজের শক্তি ও ভাবুকতার দ্বারা একটা সমন্বয় বিধান করিতে পারে, অনুকূল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও প্রতিকূল শক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুগধর্ম্ম ইঙ্গিত করিতে পারে, এবং সমাজকে নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতে পারে।

আমাদের দেশের লোকসাধারণের ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—রামায়ণ মহাভারত। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তাহার আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণলোক, আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।" রামায়ণ মহাভারত হইতে দেশের লোকসাধারণ আনন্দ পাইয়া থাকে তাহার কারণ এই সাহিত্যে লোকের সাধারণ সুখদুঃখের কথা বর্ণিত। রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলী অসাধারণ, ইহা কিয়দংশে সত্য বটে; কিন্তু অসাধারণ ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া কবি মানুষের এরূপ সাধারণ সুখদুঃখের কথা বলিয়াছেন যে মুদী যখন রামায়ণ মহাভারত পড়ে এবং রাখাল যখন সেই পড়া শুনে তখন তাহারা জানে যে রাম রাজা নহে, সীতা বা দ্রৌপদী রাণী নহে, তাহারা মানুষ, তাহাদেরই মত সুখদুঃখের ভাগী, তাহাদেরই মত ভাইকে স্নেহ করে, গুরুজনকে শ্রদ্ধা

করে এবং প্রেমাস্পদকে অফুরন্ত প্রেম বিলায়। সাধারণ লোক আপনার গরজে এ সাহিত্য পড়ে, এ কথা বলিলে কবি-প্রতিভাকে খর্ব্ব করা হইবে। কবি সাধারণের শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্য এ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন,—এক্ষেত্রে সাধারণের গরজ নহে, কবিরই গরজ।

কবি আপনার সাধনার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সত্য-উপলব্ধি ও আনন্দের সৃষ্টি—কবি সকলেরই নিকট পৌছিয়া দিয়াছেন। রাজার ছেলের সাধনা করিবার সুযোগ আছে, কৃষাণের ছেলের সে সুযোগ নাই। কিন্তু এপ্রকার সাহিত্য রাজার ছেলে ও কৃষাণের ছেলেকে সমানভাবে দেখিয়াছে,—যাহার হৃদয়-দ্বার খুলা আছে তাহার নিকট ত পৌঁছিয়াছেই, যাহার হৃদয়-দ্বার বন্ধ তাহার নিকট গিয়া দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

মেঠো-সুর সকলেরই হৃদয়ে প্রবেশ করে, তানসেনের সুর করে না। তানসেন আপন মনে সুর তৈয়ারী করিয়াছেন, সকলের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করে কিনা তাহার জন্য কোন চিন্তাই করেন নাই। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তানসেন মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না।" তানসেন মেঠো-সুর তৈয়ারী করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সুর যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট তাহা কি করিয়া বলিব? তানসেন গাহিতেছেন, অন্য লোক তাঁহার সুর গ্রহণ করিতেছে কি না তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পাখী যখন গাহে তখন তাহারও এরূপ কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না, কিন্তু পাখীর গান সকলেরই অন্তরতম হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, তানসেনের গান তাহা পারে না। তানসেন ও পাখীর গানে এইখানেই প্রভেদ। তাহা ছাড়া তানসেনের সুর যে শুধু আনন্দেরই সৃষ্টি তাহাই বা কি করিয়া বলি? তানসেন কি আকবরের সভাকে একবারেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি কি রাজার

নিয়ম ছাড়িয়া শুধু কি নিজের প্রকৃতি দিয়া বিশ্বের সহিত আপনার যোগ অনুভব করিতেন? আকবরের সভা তানসেনের জন্ত নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিল, তানসেনকে একা অব্যবহিতভাবে বিশ্বের সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। তাই বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একান্ত বাস্তব ছিল না। তাই লোকসাধারণের প্রকৃতি তাঁহার সুরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিতে পারে না;—লোকসাধারণের সাধনার অভাবকে ইহার জন্ত দায়ী করিলে চলিবে না, তানসেনের গান কেন অবাস্তব তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বিশ্বের সহিত তাহার আত্মীয়তা যে সুরের দ্বারা সদাসর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে, সে সুরকে তানসেন স্পর্শ করিতে পারেন নাই; গোবিন্দদাসের গান, রামপ্রসাদের গান মেঠো সুর—সেই সুরকেই জাগাইয়া দেয়—সেই সুরই একান্ত বাস্তব এবং সেই জন্তই তাহা সার্ব্বজনীন।

আজকাল আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে এই মেঠো সুরের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা বাস্তব নহে বলিয়া লোক-সাধারণের অন্তরতম প্রাণকে আন্দোলিত পুলকিত করিতে পারে নাই। সাহিত্যে আজকাল ভাঁজা সুরের প্রাচুর্য্য;—কবিগণ বলিতেছেন, লোক-সাধারণ শিক্ষালাভ করুক, সাধনা করুক তবেই তাহারা সুর বুঝিতে পারিবে, রস গ্রহণ করিতে পারিবে। সাহিত্য ক্রমশঃ অবাস্তব হইতে চলিয়াছে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে না থাকিয়া সাহিত্য এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন করিতেছে। সাহিত্যের এখন ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু জীবন নাই, তাই সাহিত্য জীবন দিতে পারিতেছে না।

এখনকার এই হেয় ঘৃণ্য বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া দেশের সাহিত্য নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে পাইবার জন্ত সাধনা করুক। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিয়া বাস্তবের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আনুক, বাস্তবের মধ্যে তখন যাহা কিছু হেয়, অনিত্য তখন ঝরিয়া পড়িবে, যাহা কিছু সুন্দর, বহনীয়, নিত্য তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু

প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য বাস্তবের পরিবর্ত্তনসাধনের ভার লউক, সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারির ভার মাথা পাতিয়া বরণ করুক।

সাহিত্য যে ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইবে, সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু হইবে ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপের বিষয় নহে। সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যের চরম সার্থকতা যদি সে সমাজের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। খৃষ্ট, সেণ্ট পল, বুদ্ধ, চৈতন্ত সমাজের গুরু হইয়াছিলেন, এখন সাহিত্যিকগণ গুরু হইতেছেন,—কার্লাইল রাস্কিন, টলষ্টয় সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার লইয়াছেন। মরিস মেটারলিঙ্ক ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, আধুনিক নাটক ত আর কিছুই করিবে না, সমাজের আধুনিক নীতির সমস্যাগুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিবে, সমাজের গুরুগিরি করা ভিন্ন তাহার অন্ত কোন ভার নাই। বার্ণাড শ টলষ্টয়কে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"I am not an 'Art-for-Art's-sake man, and could not lift my finger to produce a work of art if I thought there was nothing more than that in it." শুধু বার্ণার্ড শ-র নাটক কেন, আধুনিক নাটকমাত্রেই গুরুগিরি করিতেছে। জার্ম্মাণ-নাটকের সমাজের গুরুস্থান অধিকারের কথা আমি অন্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শুধু নাটক কেন, নভেল উপন্যাসও ইস্কুল মাষ্টারির ভার হাতে লইয়াছে। রুশ-সমাজকে রুশ-নভেল কি ভাবে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিয়াছে তাহা আধুনিক সাহিত্যজগতে একটা স্মরণীয় বিষয়। আমি এ সম্বন্ধেও অন্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্য, সমাজের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আপনার শক্তি আবার নূতন করিয়া চিনিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু নিজে যাহাই বলুন না কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আধুনিক সমাজের যে ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর 'রাজা', 'ডাকঘর', 'গোরা' আর্ট হিসাবে পরম সুন্দর নহে; কিন্তু তাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর। রবীন্দ্রবাবু

ঐ বইগুলিতে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রবাবু শিক্ষকের ভার লইয়াছেন এবং অতি নিপুণভাবে সে গুরুভার বহন করিয়াছেন, তাই বইগুলিতে আর্ট হিসাবে যাহা কিছু দোষ আছে তাহাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, আমাদের দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশের দিকে। 'রাজা', 'ডাকঘর' বা 'গোরা' যখন পড়ি তখন আমরা একজন শিল্পীর প্রস্তুত দ্রব্য ভাল লাগিল কিনা তাহা বিচার করিতে বসি না, ইস্কুল মাষ্টারের উপদেশ শুনিতে বসি। আবার রবীন্দ্রবাবু সময়ে সময়ে কড়া ইস্কুল মাষ্টারি করিতে ছাড়েন না। 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রবাবু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া সমাজকে কষাঘাত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। ইস্কুলে বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সময়ে সময়ে বেত্রাঘাত যে ছাত্রের পক্ষে কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতিতে যে গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাস্তবিক রবীন্দ্রবাবুর আধুনিক নাটক ও নভেল যে লোককে শিক্ষা দিবার কোন চিন্তাই করে নাই, ইহা বলিলে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভাকেই খর্ব্ব করা হইবে।

জগতে সেই সব কাব্য ও সাহিত্যের আদর, যে কাব্য সাহিত্য জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে,—শুধু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে নাই। কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' কেহ পাঠ করে না, লোকে পাঠ করে তাঁহার 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলার' ইস্কুল মাষ্টারির কথা রবীন্দ্রবাবু নিজে যে ভাবে বলিয়াছেন অন্য কেহ তাহা বলিতে পারে না। গয়েটের 'সরোস্ অফ্ ওয়ার্থর' কয়জন পড়েন? তাঁহার 'ফাউষ্টের' শিক্ষায় পশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে—ফাউষ্টের আদরের সীমা নাই। আমাদের সাহিত্যে এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে, রচনা ও বাক্যবিন্যাসের পরিপাট্য খুব দেখা গিয়াছে,—কিন্তু গভীর চিন্তা ও উচ্চপ্রকার ভাবুকতার অভাব হইয়াছে, ইহা ত আমরা সকলেই অনুভব

করিতেছি। শুধু তাহা নহে ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পচাতুরীর দিকে অধিক ঝোঁক পড়াতে আমাদের সাহিত্যে কৃত্রিমতা আসিয়াছে, সাহিত্য আভিজাত্য-গৌরবে গঠিত হইয়াছে, সাহিত্য লোকসাধারণের অন্তঃস্থল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে যদি এমন একটা যুক্তি মাথা-তুলিয়া দাঁড়ায় যে সাহিত্য শুধু আনন্দের সৃষ্টি করিবে, আপনার রূপ-মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ থাকিবে, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ করিবে, পরকে ঐশ্বর্য্য বিলাইবার চিন্তা করিবে না, লোকসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, লোক-সাধারণের শিক্ষা বা আর কোন উদ্দেশ্যে সে আর কিছু হইতে পারে না, —তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য, সমাজ হইতে আরও দূরে আসিবে, আরও "অবাস্তব" হইবে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের সমাজ ও আমাদের সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চিত।

যতদিন না আমাদের সাহিত্য এই হেয় জঘন্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু,—পরম সুন্দর ও চরম সত্যকে পাইবার জন্য সাধনা না করিবে, রচনা ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্য, শিল্পনৈপুণ্য, আপনার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার দূর না করিবে, ততদিন আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি নাই, সমাজের মঙ্গল নাই; আমরা সত্যের উপলব্ধি করিব না, সৌন্দর্য্যের বিকাশও দেখিব না। বাস্তবকে ছাড়িয়া দিলে আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। নানা লোকের নানা ভাব, নানা লোকের নানা সুখদুঃখ, নানা কালের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া বাস্তব—অনন্তরূপী মহাবিষ্ণুর মত বাস্তব। মহাবিষ্ণুর নাভিপ্রদেশ হইতে মৃণাল উঠিয়াছে,—নিখিল সৌন্দর্য্যরসাধার মহাপদ্ম অনন্ত বাস্তবের অন্তঃস্থল হইতে উদ্গত। মহাপদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন স্রষ্টা—কবিং পুরাণমনুশাসিতারং; আর তাঁহারই অঙ্কশায়িনী মহাসরস্বতী,—জ্ঞান-সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী, নিখিল-সাহিত্য-জননী।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথবাবুর "বাস্তব"-নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি আমরা সাদরে প্রকাশ করলুম। তর্কই হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর অপর-সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্যসম্বন্ধেও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে, বাদী-প্রতিবাদী উভয়-পক্ষেরই উক্তি শোনাটা দরকার।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নেই বললে আমার বিশ্বাস কিছুই বলা হয় না। কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার শুধু মুখ্য নয়,—একমাত্র উদ্দেশ্য। অবিমারকে যা আছে শকুন্তলায় তা নেই, শকুন্তলায় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই, এবং মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই—একথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও, এ সত্যের দৌলতে আমাদের কোনরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কোন-এক ব্যক্তি Iceland-সম্বন্ধে একখানি একছত্র বই লেখেন। তাঁর কথা এই যে, "Icelandএ সাপ নেই।" এই বইখানিসম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত এবং সে মত এই যে, উক্ত পুস্তকের সাহায্যে Iceland-সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোন বিশেষ পদার্থের অভাব নয়, সদ্ভাবের উপরেই মানুষের মনে তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর মতের প্রতিবাদ

করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কোন একটি মতের খণ্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি তা জানা আবশ্যক। "Icelandএ সাপ নেই"—এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে দেশে সাপ আছে—এবং তার জন্য সাপ যে কি-বস্তু সে বিষয়েও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে "বস্তুতন্ত্রতা" আছে কি নেই, সে বিচার করতে আমি অপারগ, কেননা রাধাকমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে "বস্তুতন্ত্রতা" যে কি-বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "নিত্যবস্তু"র উল্লেখ করেছেন। "বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহলে "নিত্য-বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যে অসম্ভব, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই বস্তুই নিত্য যা কালের অধীন নয়। এরূপ পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে এ কথা এ দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা স্বীকার করেন নি। বিষ্ণুপুরাণের মতে—

"যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদিজনিত সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রকৃত সত্যবস্তু। জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।"—(রামানুজধৃত বচন—শ্রীভাষ্য)

যে বস্তু জগতে নেই, সে বস্তু যদি কোন কাব্যে না থাকে তাহলে সে কাব্যের বিশেষ কোনও দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এই জগতই হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।

২

"বস্তুতন্ত্রতা" আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক;—কেননা এ বাক্যটির দাবি মস্ত। "বস্তুতন্ত্রতা" একাধারে

সকল সাহিত্যের মাপকাটি ও শাসনদণ্ড সুতরাং সাহিত্যসমাজে এর প্রচলন, বিনাবিচারে গ্রাহ্য করা যায় না।

এ বাক্যটি বাঙলাসাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

এ বাক্যটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।

কাব্যে ও দর্শনে যোগাযোগ থাকলেও, এ দুটি যে পৃথক-জাতীয় সাহিত্য এ সত্য ত সর্ব্বলোকবিদিত। দার্শনিকমাত্রেই নাম-রূপের বহির্ভূত দুটি-একটি ধ্রুব সত্যের সন্ধানে ফেরেন, অপর পক্ষে—নাম-রূপ নিয়েই কবিদের কারবার। সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যে রূপগুণের পরিচয় দেবার চেষ্টা, সকল সময়ে নিরাপদ নয়। তবে শঙ্করের "বস্তুতন্ত্রতা" কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। শঙ্করের মতে—

"জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র—অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ জন্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জন্মে, অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা, না করা এবং অন্যথা করা যায় না।"

শঙ্কর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর মত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই—

"হে গোতম! পুরুষও অগ্নি স্ত্রীও অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, তাহা মনঃসাধ্য, অর্থাৎ তাহা মনের অধীন, পুরুষের অধীন এবং শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যেরও অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা না পুরুষের অধীন, না শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন। অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বিষয়-বস্তুতন্ত্র।"

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়

তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোন কবির হাতে বেল, ফুল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে তাঁর বেলফুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাঙ্গলার মাটি এবং বাঙ্গলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্ব্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বল্‌তে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন—তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই—এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না। শঙ্করের বস্তুতন্ত্রতাকে যদি কোনও বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয় তাহলে সেটির অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতা সংজ্ঞা দিতে হয়। কেননা প্রসিদ্ধ অগ্নি ইত্যাদি যে অনিত্যবস্তু সে ত সর্ব্বদর্শনসম্মত। সুতরাং রাধাকমলবাবুর মত এবং শঙ্করের মত এক নয়, কেননা নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সত্য কথা এই যে, "বস্তুতন্ত্রতা" নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলেতি। সেই জন্য রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁর মতের স্বপক্ষে কেবলমাত্র ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন; যদিচ সে সকল লেখকদের পরস্পরের মতের কোনও মিল নেই। জর্ম্মাণ দার্শনিক Eucken এবং ইংরাজনাটককার Bernard Shaw যে সাহিত্য-জগতে একপন্থী নন—এ কথা, তাঁদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যের Realismই নাম-ভাঁড়িয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যে

"বস্তুতন্ত্রতা"-নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্ততঃ দু কথায় এই Realism-এর পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।

ইউরোপের দার্শনিক জগতেই এ শব্দটি আদিতে জন্মলাভ করে। Idealismএর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েই Realism দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত এ উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আস্‌ছে। Idealism-এর মূলকথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং Realism-এর মূলকথা জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা। এ অবশ্য অতি স্থূল প্রভেদ। কেননা এ উভয় মতই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এবং এই সকল শাখায় প্রশাখায় কোন কোন স্থলে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তাদের ইতর-বিশেষ করা কঠিন। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ গত-শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে Realism ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার Idealism-এর উপরে প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।

রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার স্বপক্ষে Bernard Shaw-এর দোহাই দিয়েছেন। Bernard Shaw-প্রমুখ লেখকদের মতে Realism-এর অর্থ যে Idealism-এর উপর আক্রমণ, তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে Ibsen-এর নাটকের সারমর্ম্ম হচ্ছে—"His attacks on ideals and idealisms"—এবং এই দুই মনোভাবের প্রতি Bernard Shaw-র যে কতদূর ভক্তি আছে তার পরিচয়ও তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"I have sometimes thought of substituting in this book the words, idol and idolatry for ideal and idealism; but it would be impossible without spoiling the actuality of Ibsen's criticism of society. If you call a man a rascally idealist, he is not only shocked and indignant but puzzled: in which condition you can rely on his attention. If you call him a rascally idolator, he concludes calmly that you do not know that he is a member of the Church of England. I have therefore left the old wording." (The quintessence of Ibsenism)

Bernard shawর অভিমত-"বস্তুতন্ত্রতা" রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে সম্ভবতঃ নেই। কিন্তু রাধাকমলবাবু কখনই বাঙ্গলা-সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতার চর্চ্চা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; কেননা তিনি চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবে—অপর পক্ষে Bernard Shaw চান্ যে, সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শ সকল দূর করবে।

Realism শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। এককথায় Realistic-সাহিত্য Romantic-সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং Victor Hugo-প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপেই Falubert-প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

Romanticism-এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। Romantic কবিদের মানসপুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীর সন্তান নন এবং যে জগতে তাঁরা

বিচরণ করেন সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এককথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপকথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনেছিলেন ফরাসী Realism তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসীদেশের গতশতাব্দীর Romantic লেখকদের বহু নাটক নভেল যে অশরীরী এবং প্রাণহীন সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চ্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন Romanticদের দোষ, তেমনি সত্যের চর্চ্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও Realist দের দোষ; প্রমাণ Zola। আকাশ-গঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্ত্তে খোলা নর্দ্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় Realism-এর পক্ষপাতী নন্। কেননা তাঁর মতে যেটি এদেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান Romance। Zola প্রভৃতি Realism-এর দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাঁকে জোর করে মর্ত্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য।

৩

রাধাকমলবাবু যখন দেশী কাব্যের গায়ে বিলাতী ফুলের গন্ধ থাকাতেই আপত্তি করেন—তখন অবশ্য তিনি আমাদের সাহিত্যে

বিলাতি ওষুধের গন্ধ আমদানি করতে চান না। তিনি "বস্তুতন্ত্রতা" অর্থে কি বোঝেন তা তাঁর প্রদত্ত দুটি একটি উপমার সাহায্যে আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারি। রাধাকমলবাবু বলেন—

"মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিবে?"

"জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের, সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে তাহার রস সঞ্চার হয়। এই রস-সঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।"

"একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলি ফুল ফুটাইবে—তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।"

এর অনেক কথাই যে সত্য সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাক্‌বে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবতঃ তাঁর মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার বৃন্ত, বৃন্তের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায় কাণ্ড, কাণ্ডের তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি—উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর এবং অধিকতম বাস্তব হয়ে ওঠে। পঙ্কজের অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে—এই বিশ্বাসে

Zolaপ্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানব-মনের এবং মানব-সমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমল বাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? গোলাপগাছের পক্ষে লিলি প্রসব করবার প্রয়াসটি যে একবারেই ব্যর্থ শুধু তাই না—মাটি হতে রসসঞ্চয় না করে আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে সে গোলাপও ফোটাতে পারবে না,—কেননা ওরূপ ব্যবহার করলে গোলাপগাছ দুদিনেই দেহত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

গাছের ফুল আকাশে ফোটে, কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ—সে কথা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়,—সমাজের মনে নিহিত,—এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোন বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে abstraction.

সে যাই হোক্, রাধাকমলবাবু এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করেছেন যে, গোলাপের গাছে অবশ্য লিলি ফোটে না কিন্তু একই ক্ষেত্রে গোলাপও জন্মে লিলিও জন্মে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়—তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্যদেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব এবং সৌরভের সহিত নবাবি করছে।

বহির্জগতে যদি এক ক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহলে মনো-

জগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা খুব সম্ভবতঃ মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ অলঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্ব্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে-গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গসকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়ছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে—এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বাঙ্গলা-সাহিত্যে লিলি ফুটলে আঁতকে ওঠবার কোন কারণ নেই। রাধাকমলবাবু বলেছেন—

"জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মন রস সঞ্চয় করে।"

যদি একথা সত্য হয় তাহলে যদি কোনও কাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র হয় তাহলে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তাহলে কাব্য কোথা হতে রস সঞ্চয় করবে? উপমান্তরে দেশ-মাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে —তাহলে তাঁর কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাধাকমলবাবুর এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।

রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ্-জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর materialism-এর যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনো-জগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে

এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে—এই বিশ্বাসবশতঃই ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল—কাব্যপ্রভৃতির বিশেষ-ধর্ম্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বল্‌তে গেলে তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত কারণ বলে ভুল করেন। তাঁরা বাহ্যশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর্‌তেন না, সুতরাং তাঁদের মতে কবির আত্মশক্তি নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্যশক্তিই কাব্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। কবিতার জন্ম ও কবির জন্মবৃত্তান্ত যে স্বতন্ত্র এই সত্য উপেক্ষা করবার দরুন সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।

রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত-শতাব্দীর materialism-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই বই আর কিছু নয়।

আসল কথা এই যে, প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কার্য্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কবি কিন্তু সমাজের নিকট হতে যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশি দান করেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কবি এই অতিরিক্ত রস কোথা হতে সংগ্রহ করেন? তার উত্তরে আমরা বলব—আধ্যাত্মিক জগৎ হতে; সে জগৎ অবাস্তবও নয় এবং তা কোন পরম ব্যোমেতেও অবস্থিতি করে না।

সে জগৎ আমাদের সত্তার মূলে ও ফুলে সমান বিদ্যমান। কারণ আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

রামানুজ বলেন—আমরা বদ্ধমুক্ত জীব। আমাদের মন যে-অংশে এবং যে-পরিমাণে বহির্জ্জগতের অধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা বদ্ধ এবং যে-অংশে ও যে-পরিমাণে তা স্বাধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জ্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা তখন আমরা বদ্ধজীব, এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা তখন আমরা মুক্তজীব। যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোন কিছুরই সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা নেই—তিনি বড়-জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, আর্টিষ্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক—কেননা তাঁরাই মানব-সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েস খাট্‌তে পারেন্‌ না, তার জন্য যদি তাঁকে “আত্মম্ভরী” বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ কর্‌বেন না। যে দেশে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য, সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

৪

দেশ-কালের ভিতর সম্পূর্ণ বদ্ধ না কর্‌তে পার্‌লে অবশ্য জড়-বস্তুর সঙ্গে মানব-মনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না।

Materialism-এর পাকা ভিতের উপর খাড়া না কর্‌লে Realism-এর গোড়ায় গলদ থেকে যায়—অত-এব রাধাকমলবাবু কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তিনি বলেন,—

"সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।"

যদি তাই হয়, তাহলে মহাভারতাদি ব্যতীত অপর কোন কাব্য স্বদেশী এবং জাতীয় নয়—এ কথা বল্‌বার সার্থকতা কি? ও-জাতীয় কাব্য আমরা রচনা কর্‌তে পারিনে, কেননা আমরা ত্রেতা কিম্বা দ্বাপর যুগের লোক নই। National epic রচনা করা এ যুগে অসম্ভব, কেননা ও-সকল মহাকাব্যকে অপৌরুষেয় বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সাহিত্য কোনও-এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নি। যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েই ভারতী কথা মহাভারতে পরিণত হয়েছে। যুগধর্ম্ম যাই হোক্‌, কোন অতীত যুগের পুনরাবৃত্তি করা কোন যুগেরই ধর্ম্ম নয়।

যদি যুগধর্ম্ম অনুসরণ কর্‌তে হয়, তাহলে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জ্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, কেননা আমরা বাঙ্গলার মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ায় বাস করি। আমাদের মনের নবদ্বার দিয়ে ইউরোপীয় মনোভাব অহর্নিশি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। কাজেই যুগধর্ম্ম-অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের সাহিত্যের গুণও এই, দোষও এই।

এ সাহিত্যের গুণাগুণ, এই দেশী-বিলাতী মনোভাবের যথাযথ

মিলনের উপর নির্ভর করে। দুভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হলে জলের সৃষ্টি হয়—যা পান করে মানবের পিপাসা নিবারণ হয়। অপর পক্ষে দুভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে একভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়—তা নাকে মুখে ঢুকলে হয় ত আমরা দম-আটকে মারা যাই। শুধু তাই নয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে মিলে জল হয় না—যদি না তাদের উভয়ের রাসায়নিক যোগ হয় অর্থাৎ যদি না ও-দুটি ধাতু পরস্পর পরস্পরের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এই রাসায়নিক যোগসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য চাই। সুতরাং এই দেশী-বিলাতী ভাবের মিশ্রণে এ যুগের সাহিত্যে অমৃত ও বিষ দুই রচিত হচ্ছে। যে মনের ভিতর আত্মার বৈদ্যুতিক তেজ আছে—সে মনে এ যুগের রাসায়নিক যোগ হয় এবং যে মনে সে তেজ নেই—সেখানে এ দুই শুধু মিশে যায়, মিলে যায় না।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা এ কথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমতঃ যুগধর্ম্ম বলে কোনও যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পর-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মন পদার্থটি কোনও বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক-অংশে কালের অধীন, অপর-অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য, ধর্ম্ম, আর্টপ্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে প্রতিযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।

নব যুগধর্ম্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয় তাহলে সাহিত্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার অর্থাৎ যুগধর্ম্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।

Bernard Shaw অবজ্ঞার সহিত বলেছেন যে তিনি art for art-এর দলের নন্—তার কারণ, তিনি এবং তাঁর গুরু Ibsen ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাই জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এঁদের রচিত নাটকাদি যে সাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে সে যে কতটা তাঁদের মতের গুণে এবং কতটা তাঁদের আর্টের গুণে তা আজকের দিনে বলা কঠিন, কেমনা তাঁরা যে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়েছেন—তার সঙ্গে সকলেরই সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ শ্রেণীর সাহিত্যে শক্তির অনুরূপ সৌন্দর্য্য নেই। সাহিত্যকে কোন-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে, তাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য্য। আমরা সামাজিক জীব অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোন-একটি বিশেষ যুগের নয় কিন্তু সকল যুগেরই—হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন—এককথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকমলবাবু নিত্যবস্তু

বলেন—তাহলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না—কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই "art for art"-মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন বল,—এ সকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। রাধাকমলবাবুপ্রমুখ লেখকদের বস্তুতান্ত্রিকতা যে ইউরোপের Realism ব্যতীত আর কিছুই নয় তার প্রমাণ স্বরূপ Eucken-বর্ণিত উক্ত মতের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত জর্ম্মাণ দার্শনিকের মত শিরোধার্য্য করতে রাধাকমলবাবুই যখন আমাদের আদেশ করেছেন, তখন সে মত অবশ্য তাঁর নিকট গ্রাহ্য হবে। Eucken বলেন যে Realism—

"প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।"

"এ দলের অধিকাংশ লোক যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন যাঁদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্রমাত্র এবং যে হেতু মাপজোকের সাহায্যব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।" অর্থাৎ যা আঁকা যায় এবং যার আঁক-কসা যায় তাই একমাত্র সত্য। তার পর এ মতে—

"ভাবরাজ্যে কোনরূপ ideal-এর অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র, কিন্তু নীতির রাজ্যে ideal (আদর্শ) আছে এবং থাকা উচিত। কেননা এ মতে জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—সমাজ ব্যক্তিকে

জোড়া দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্রমাত্র ;—আবার কর্ম্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তা একটি organism (অঙ্গী) এবং প্রতি ব্যক্তি তার অঙ্গ—অতএব ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীনতা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বেও নেই—মানবের অন্তরেও নেই। অথচ এ মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনাই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম।”

মানব-সমাজকে হয় যন্ত্র নয় অঙ্গীস্বরূপে গ্রাহ্য করলে—এবং মানবের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে এই যন্ত্রের অংশ অথবা এই অঙ্গীর অঙ্গ যে ব্যক্তি তার অপর-সকল ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায় তার সাহিত্য-রচনাও সম্পূর্ণ সমাজের অধীন এবং সমাজ যখন অঙ্গী তখন তা অবশ্য সম্পূর্ণ যুগধর্ম্মের অধীন এবং তার প্রতি অঙ্গও সেই একই যুগধর্ম্মের অধীন। সুতরাং কোনও ব্যক্তির পক্ষে মনোজগতে যুগধর্ম্ম অতিক্রম করবার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা নয়—একেবারেই বাতুলতা। আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন তাঁরা যে ইউরোপের এই জাতীয় Realism-এর চর্ব্বিত চর্ব্বন রোমন্থন করছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি Eucken-এর আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। “All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age, and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time.” যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের চোখ-রাঙানী হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।

৪

আসল কথা, এ সকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিম্বা পদার্থহীন ভাব এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। Realism-এর পুতুল-নাচ এবং Idealism-এর ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সে কারণ যা হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে Realist এবং Idealist —কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।

The light that never was on land or sea—সেই আলোকে বিশ্ব দর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবি-প্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্য-জগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।

Realism-এর এই উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তি-জনক, তখন বাঙ্গলা-সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তু-জগতের উপর প্রভুত্ব—অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞানের যে অংশটি খাঁটি সেইটি ইউরোপের হাতে পড়েছে এবং তার যে অংশটি ভুয়ো সেইটিই আমাদের মনে ধরেছে। ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে—আর আমরা তাদের পঞ্চ দেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

একাদশ সংখ্যা]　　ফাল্গুন ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

শ্রীবিলাস

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃত দেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্য্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুইধারে সিসু গাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্ এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা;—বাসর ঘরে শ্যালীর মত মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে।

দীঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধনে'র সঙ্গে মিলাইয়া চাষীরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় সেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধনে' ফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড় ক'খানার মত পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারিদিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরীব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙ'লীর ছেলে কেই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে,—যা একটু আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবল মাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধূলার চিহ্নের মত মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি আমার কথা কেহ মানিবে না। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদগর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ছিলেন সন্ন্যাসী—কা তব কান্তা, কস্তে

পুত্রঃ—এ সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী—তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিষ, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি ও গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর, সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্য্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে!

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড় করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পূরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রং, এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতা-জোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি

আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়—সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এত বড় অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে সাহানা রাগিণীর তানে ত আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চাল-চুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর-ভাড়া করিতে হয় সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মত সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে,—আমিই ছিলাম এক্‌জিকুটর। উইলে কতকগুলি সর্ত্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে

সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা অর্চ্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্‌।

শচীশকে বলিলাম, চল এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি সহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিতে হইবে বল।

শচীশ বলিল—তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মত দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা

ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কি চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভীমরুল হুল ফুটাইয়া দিল—জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ ত প্রায় দু'বছর একলা ফিরিয়াছিল—মারা ত পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না—একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি!

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে একদলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক্, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ ত, সহরে এখনি নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক্। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতই যতটা পারি গা ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয় ত একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত-জোড় করিয়া বলিল,—তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন ত এ জিনিষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক্, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর-এক দিক পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর অনুভূতিতে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, দেখ

শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ কর, বিশ্রী, চুপ কর—সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই ত পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো এ তোমার ভূগোল-বিবরণের সত্য নয়—আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক-শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উল্টা কথাই শোনা গেল! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চ্যালা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চ্যালাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই-আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত আমিই তাঁকে পাইব নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লানমুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্ চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই শোওয়া নাই, কখন্ কোথায় থাকে হুঁস্ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত—যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই কি এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দ স্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান্ দিত কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কত রকম ফিকিরফন্দী করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদীপার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য্য মাঝ-আকাশে উঠিল, তারপরে সূর্য্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারিদিক ধূধূ করিতেছে—জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন

নিঃশব্দ নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তা'রা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাসে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুক্‌নো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে, একটা না। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি। তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্‌দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখীর পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সাম্‌নের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা ল্যাজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখাচখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পূরাপূরি মনের মত সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল—এখানে কেন?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি না হয় একটু বসি তুমি আর একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মত ঝক্ঝক্ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি একপাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বল? আর সব ভাবনা ত উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি?

আমি বলিলাম, দেখ, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত

প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেই জন্যেই বড় দুঃখে কিম্বা বড় আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যে রকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত—ঐ শরীরটাকেই ত দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম্ম। ও-যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্ত্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।"

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বই কি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি!

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই।—ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস্ এমন পুণ্য কর্!

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তারপর কিছুদিন সে দামিনীর পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে ত আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ

করিতে লাগিল। যে সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না কিন্তু এই যত্নকে তার বড় ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড় বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড় বেশি পড়িতেছে, সেই দিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মত বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে ইহাতে দামিনীর বুক দুরদুর করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে—সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে এই যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কি করিয়া?—দামিনী ভাবিল, দূর হোক্‌গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী, দামিনী!—তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কি কাণ্ড করে তা জানিনা—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই ত মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌জ্বল্‌-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা ত শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝিনা বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না ? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে ত দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু

শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত-জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এক কোণটিতে চুপটি করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মত করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চূরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না,—আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার,—এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন্ যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে ওঠে, কখন্ যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন্!

সেদিন সমস্তদিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড়

আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সাম্নের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কি যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মত ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় দুড়দুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বারবার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনেরও জানলা-দরজার ছিট্‌কিনীগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আস্‌বাবগুলাকে উলট্-পালট করিয়া দেয়, পর্দ্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কি সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কি হইবে? এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরী কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কেও?

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গরগর করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল দেবতার পেয়াদাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের একধার হইতে আর-একধার পর্য্যন্ত পড়পড় শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া একদৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চীৎকার-শব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল,—এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আজ তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও ত ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চল।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সাম্‌নের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না!

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কি চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কত বড় কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারি একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল!

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড় বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখ তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কি-বাঁচান্ বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কি জান! তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সেদিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে!—বলিয়া দামিনী বুকে দম্‌দম্ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনি দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার

জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল, বলিল, এ কি, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি ?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় না কি সহরে ঢী-ঢি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল; রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর-সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ঙ্কর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে কিন্তু ভাইরা কেহ কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তারা বড় গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুস্কিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয়, এখানে জায়গা নাই। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম—তা হইলে কোথায় যাইবে ?

দামিনী বলিল, লীলানন্দ স্বামীর কাছে।

লীলানন্দ স্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন ?

দামিনী বলিল, খুসি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দল-চরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুসি হয়। লীলানন্দ স্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক—কিন্তু—।

ঠিক এমন সঙ্কটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে; যদি অভয় দাও ত বলি।

দামিনী বলিল, বল শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মত মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ও কি কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?

আমি বলিলাম, মনে করনা পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা ? কাকে তুমি বল বাজে কথা ?

এই যেমন, লোকে কি বলিবে ? ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর আসল কথা ?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা ?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কি দশা হইবে ?

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা

আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্তত পক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব-সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারী খবর ছিল না—অন্তত তার কোনো রকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমন কি, আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা, না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি ত আমাকে জান।

আমি বলিলাম, তুমিও ত আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে।

কিন্তু নরেন এখনো আমাকে বর্ত্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ

জিনিষ বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাসদেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্ত্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক্ খাইয়া গেল; অন্তত অনেক মেরামত্ত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তার সেই আনন্দের উচ্চ হাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল ক'টার মধ্যে বারবার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদী পর্ব্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে; "তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি", এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দ্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু কলিকাতার এই গলিতে এ কি হইল? ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারিদিকে যেন পারিজাতের ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মত সামান্য মানুষের উপর তিনি কি পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক-মুহূর্ত্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম!

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক-নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্ব্বে যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্ত্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোট্ট তাহা ইহার পূর্ব্বে কখনো

এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন—দিনগুলাও চব্বিশঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতর বিশ্রী-রকমের কৃপণতা কেন আমি ত বুঝিতে পারি না!

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগ্‌লামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ্‌। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তারপর?

তারপরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব—সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের নূতন সৃষ্টি হোক্‌, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্‌।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগ্‌লা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে নহিলে চিঠি ফেরৎ আসিত। কিন্তু সে কারো চিঠি খুলিয়া পড়ে কিনা সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, "পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ, ত্রুটি মার্জ্জনা"—এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম কিন্তু আমি ভীতু মানুষ। সে হয় ত এতক্ষণে নদীর ওপারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা—আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনো-রকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেফ্‌তার করিয়া আনিলাম। ছোট ছেলে খেলার জিনিষ পাইলে যেমন খুসি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুসি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এম্‌নি হল্লা করিতে লাগিল যে পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা, অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পর-বারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকদের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মত কোনো বিঘ্ন না ঘটুক্।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ কর'সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ ত বলিল আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ কর কিন্তু ভোগটা যে কি সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান-সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না—ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও ত একটা—কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল, সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয় জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুইজনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের মার্কা—প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে একজামিন-পাসের পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিলাম—পাঠ্যপুস্তকের মোটামোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার

ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না,—আমিও তাকে বলিলাম না, চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। তার ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয় সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না—কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিষটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার, স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব্-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়ে বামুন, বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব-কটাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলি উল্টা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোট ছোট মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতে সে আমার কাছে হার মানিবে না এই তার পণ।

কলিকাতার এই সহরটাই যে আমাদের দুজনের বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে আমাদের বাঁশির মোহন তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব শক্তি আমার

নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তারপরে আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?…

ডাক্তাররা এ ব্যামোর একোজনা একো-রকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারো প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারো মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট্ ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও—সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই নারী

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা, উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি',
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ মাঘ
পদ্মাতীর

কর্ম্মযজ্ঞ

(হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।)

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম্ম উৎসব করতে হয়; কিন্তু মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না—তার জন্মের পূর্ব্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয়নি—আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেচে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে সমস্ত পথে চল্‌তে চল্‌তে হবে—কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই ত সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেচি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সাম্‌নে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেচে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্ব্বল তাই আমরা দুর্ব্বল, এর আর নড়চড় নেই; এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্ম্মণ্য করে তুলেচে। দেশ-জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন—তার কারণ এ নয় যে আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি

নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেচে—তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করিনে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কি পরিমাণ কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তারপরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কি রকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু সব চেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্চে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকার গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মত পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলচে—না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনো মতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্ম্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখচি—হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখ দুর্গতির ডালপালা বাড়চে, তবু প্রাণের ভিতরে আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনো মতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড় ক্ষীণ। যে-সব জিনিষ নির্জ্জীব, তাকে একমুহূর্ত্তেই ফরমায়েস মত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরম দুর্ব্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে—সে ত অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারি মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, ক'জন লোকেরি বা এতে উৎসাহ—এ সব কথা বলবার কথা নয়। কেননা বাইরের আয়োজন ছোট, অন্তরের আশা বড়।

আমরা কতবার এ রকম সভা সমিতির আয়োজন করেচি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েচি—এ কথাও আলোচ্য নয়, ফিরে ফিরে যে এ রকম চেষ্টা নানা-আকারে দেখা দিয়েচে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারো মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেচে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনই সত্য নয়; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্ত্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেচেন, সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তাতো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তাহ'লে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বে-হিসাবী আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্চে শক্তি,—নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করি না বলেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারচেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এস, বল,—হুকুম কর তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব।—আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে বাইরের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাকে বড় করে দেখোনা, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখ। বিশ্বের

সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্ঘাটিত করে সার্থক করে তুলচেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েচেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটো মাত্র ছোট চোখ দিয়ে লোক-লোকান্তরে উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণ-ধারাকে গ্রহণ করতে পারচি তেম্‌নি আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবামাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমাশক্তি আছে সেই শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বল্‌ছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্ব্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্চে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরচে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারচে না—এর জন্য নালিশ করব না। এই বারম্বার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্চে, কোন্‌ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্ব্বলতা। আমরা এটা দেখ্‌তে পেলাম যে যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েচি, সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যেসব দেশ বড় আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখিনি।

তাই মনে কেবল আলোচনা করচি অন্য দেশ এই রকম করে অমুক বাণিজ্য করে, এই রকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে, অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি,—আমাদের তা নেই—এই জন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি, মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠ্‌ব; কিন্তু জানিনা আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিষগুলো তুলে এনে কি ভয়ঙ্কর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে—তখন তার ভার বইবে কে! বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্ম্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্ত্তাকে দেখিনি—কেননা নিজের ভিতরকার কর্ত্তৃ-শক্তিকে আমরা মেলতে পারিনি। কর্ম্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে, কর্ত্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্ত্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি সেইজন্যে এদেশে যে জিনিষটা গোড়াতেই বড় হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করিনে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে যাদুকরের গাছের মত মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোট হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড় আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি

করতে হয় তাহলে এক-রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক্ তিন-রাত্রের মধ্যে সে সমূলেন বিনশ্যতি। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্ব্বে এবং কাঠ-খড়্ জোগাড়ের গোড়াতেই এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্দ্ধকে ধর্ম্মের আশ্রয় দান করেছেন, তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা কিছু বড় ও সার্থক, তার যে কত ছোট্ট জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানিনে —অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে—সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার পরে জন্মগ্রহণ করেচে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারিনি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি, বল্‌ছি—তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেচে যে মানুষের উন্নতি সাধন ভালোবেসে নয়—বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ যেন কেবল যন্ত্রে পুড়িয়ে-পিটিয়ে, কেটে-ছেঁটে, জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি

করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেচে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মত দৌরাত্ম্য আর কিছুই হ'তে পারে না। তার পরিচয় বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্গিরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে, যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে?

কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক্ থেকে মরচি —আমরা সয়তানের কর্ত্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরিনি; আমরা মরচি ঔদাসীন্যে, আমরা মরচি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে, আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না; পরিবার পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা; সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এই জন্যই আমাদের দেশে দুঃখ মৃত্যু অজ্ঞান দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করচি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন,—বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের বহুযুগের; আমাদের প্রাণ-শক্তি আচ্ছন্ন আবৃত;—একে মুক্ত কর! কে করবে? দেশের যৌবন—যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরায় ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এই জন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ। চারিদিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ বস্তুর একটা

কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়, তখনই ব্যক্তিত্ব। সঙ্কীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব।—আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে?—দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্ম্মের মন্থন-দণ্ডের নিয়ত তাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব, তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে; আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে Sentimentalism, সেই দুর্ব্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেচে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত-থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্ম্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েচে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেচে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করচি। যদি তা না অনুভব করি, তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এদেশে জন্মেছি যে-সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায়নি, তখন আমরা জেগেচি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্ব্ব-গগনে দেখা দিয়েচে—ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের

পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন তেমনি সৌভাগ্য, তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল, তখন আমরা চোখ মেল্‌লুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেচেন—ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য্য ভোগ করচে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্য দিয়েচেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়েচেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেচেন—অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা ছোট নই। আমরা বড়—এ কথা হবেই প্রকাশ—নইলে এ সঙ্কট আমাদের সাম্‌নে কেন? সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিভাষণ

(উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।)

আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজসাহী সহরে, আমি সর্ব্বজনসমক্ষে সসঙ্কোচে দুটি চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনও দূর-ভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব—সে দিন একথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, সেদিনও তাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান-বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়-মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ আসরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনরূপ যোগ্যতা আছে কি না—সে বিচার তাঁহারাও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই—তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চ্চা করি,

কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জ্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন;—ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন, অপরপক্ষে লেখক, পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী। অক্ষরের নীরবভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে-কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি—কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাক্‌রোধ হয়। যে বাণী সবুজপত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্য্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পূরামাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকার-লাভ ক্বচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য্য—একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির-অসহ্য। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে—

"কৃশে কবিত্বেপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্ত্তুমীশতে।"

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়। অতএব অন্য কারণাভাবেও অন্ততঃ দুদিনের জন্যও উত্তর-বঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠী-পতি হইবার লোভ সম্ভবতঃ আমি সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

(২)

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে—যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দ-চিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়—এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ উত্তর-বঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমতঃ এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ীর যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তর-বঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক-হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশ-বাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলন-ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তু-প্রীতিই ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া স্বদেশ-প্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্ব্বকাহিনী এই বরেন্দ্রমণ্ডলের

চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, আর্য্যাবর্ত্ত দূরে থাক্, কান্যকুব্জেও গিয়া পৌছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতঃই, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নত শিরে গ্রাহ্য করিয়াছি।

(৩)

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্য-সভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ পৃথক পৃথক পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভিযোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা দেশে এই জাতীয় সভা-সমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এই সকল প্রাদেশিক সাহিত্য-সমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধে decentralisation-এর পক্ষপাতী। কোন-একটি আদ্য পরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষদ্‌গুলি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে আমি দক্ষিণ-বঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস,

এক ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে সুতরাং উত্তর-বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ-পাত করা কলিকাতার পক্ষে সঙ্গতও নহে; শোভনও নহে। বস্তুতঃ সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নব-নাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নাম-গন্ধও থাকে না। এমন কি, কোনও হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

(৪)

উত্তর-বঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন-সকলের বলে উত্তর-বঙ্গের মনে ঈষৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানিনা। যদিই বা উত্তর-বঙ্গ তাহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশ-মাত্রেরই অহঙ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনরূপ প্রদেশ-বাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশ-বাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইঁহারা যে মনোভাবকে সঙ্কীর্ণ বলেন, আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তি-স্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোন অংশের প্রতি প্রীতি নাই,

সেস্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাঙ্গলাদেশের সহিত, বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতাপ দুর্দ্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোন বস্তুবিশেষ নয়,—কিন্তু একটি নামমাত্র। এইরূপ স্বদেশ-প্রীতির মূল—হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশী মনোভাব বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না। স্বদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সঙ্কীর্ণ প্রদেশ-বাৎসল্য যদি এই জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের চর্চ্চা করা আমি একান্ত শ্রেয়ঃ মনে করি। কিন্তু আসলে এ সকল অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানব-মনের সকলপ্রকার সঙ্কীর্ণতার জাত-শত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই

জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম এবং একমাত্র কর্ম্ম। কোনও জাতির মনের ঐক্য-সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্র হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকলপ্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জ্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

(৫)

যে সভার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজসাহী সহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক চর্চ্চা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সঙ্গত—এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই,—অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা

দেখানো হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে বলিলে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-কোণে একটুখানি স্থানলাভ করিয়াছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্ত্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে—তাঁহার যত্ন এবং তাঁহার চেষ্টায় The mother's tongue has been put in the step-mother's hall—অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপিও যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই—ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্যকথা এই যে—মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজী ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

একদিন যেমন বাঙ্গলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গণিতেন—আজ তেমনি বাঙ্গলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে

প্রমাদ গণেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নব-শিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নব-সাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে তাহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়—এ কথা বলায় বাঙ্গালী অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না,—পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নব-শিক্ষার। যে কারণেই হউক, অনেকে যে মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষ্যেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই সেদিন আমার কোন শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে—এ সভাস্থলে "বীরবলী ঢং চলবে না!" যে-কোন সভাতেই হউক না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিম্নে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর-পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কেননা সে ভাষা অটপহুরে;—পোষাকি নয়। সভ্য সমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজ-সম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ-অনুসারে 'পররুচি পরণা'—এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধু-

ভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা—আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, মুণ্ডিত-মস্তকে, ঝুলি-স্কন্ধে, দণ্ড-হস্তে, নগ্ন-পদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্তৃত-রাঙ্গায় চড়িয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে কন্যার গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি—তখন সভ্য সাজা ত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন,—পরা কঠিন নয়।

(৬)

ভাষা সাহিত্যের মূল-উপাদান—সুতরাং সাহিত্য-পরিষদে ভাষা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকেরা ভাষার সৌন্দর্য্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। সুতরাং কোনও লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে যৌবনে তথাকথিত

সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য-কথা আমি নানা সময়ে, নানা স্থানে, নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি;—আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনও বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনও বা তাহার উপর বিদ্রুপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। কেননা পুনরুক্তি ওকালতিতে যে-পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাততঃ আমি যতদূরসম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্ম-বৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা কি আর-কিছু।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আছে—কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় একশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে—এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম্ম। শতবর্ষ পরমায়ু—বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই;—ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখক-দিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে—

ভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রং নাই এবং অনেকখানি মাড়, আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা—আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, মুণ্ডিত-মস্তকে, ঝুলি-স্কন্ধে, দণ্ড-হস্তে, নগ্ন-পদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্ত-রাপ্তায় চড়িয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে কন্যার গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি—তখন সভ্য সাজা ত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন,—পরা কঠিন নয়।

(৬)

ভাষা সাহিত্যের মূল-উপাদান—সুতরাং সাহিত্য-পরিষদে ভাষা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকেরা ভাষার সৌন্দর্য্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। সুতরাং কোনও লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে যৌবনে তথাকথিত

সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য-কথা আমি নানা সময়ে, নানা স্থানে, নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি;—আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনও বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনও বা তাহার উপর বিদ্রুপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা পুনরুক্তি ওকালতিতে যে-পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাততঃ আমি যতদূরসম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্ম-বৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা কি আর-কিছু।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আছে—কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় একশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে—এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম্ম। শতবর্ষ পরমায়ু—বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই;—ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখক-দিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে—

"গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন—'

বঙ্গভাষাসম্বন্ধে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন—

"অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা ইহা নিশ্চয়—"

উক্ত ভাষা যে অস্মদাদির ভাষা নহে—তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই দুঃখ নাই—কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তমা ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারপ্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না; তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না—কেননা দেশীভাষায় যে কোনরূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল।

ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শপ্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কারমহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনরূপ যত্ন, কোনরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। তর্কালঙ্কারমহাশয় নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি-লেখক—অপর-দিকেও তিনি তেমনি চল্‌তি-ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চল্‌তি-ভাষায় নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলাগুলিন পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাক পাতা শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড় কুটাকাটা শুকনাপাতা বঞ্চী তুষ ও বিলঘটিয়া কুড়াইয়া আলানি করি, কাপাস তুলি, তুলা করি, ফুঁড়ী পিঁজী পাঁইজ করি, চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পণেক দশ গণ্ডা যা পাই ও মিনসা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারিপণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি, ও তেল লুন করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই শিজাই শুকাই ভানি, খুদকুঁড়া ফেন আমানি খাই। যে দিন শাক ভাত খাইতে পাই সে দিন ত জন্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথাখানি ছালিয়াগুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায়ে দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাবরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা

গলায় পরিতে ও রাঙ্গ শিশা পিতলের বালা তাড়মল খাড়ু গায়ে পরিতে পাই তবে ত রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা, হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়েনা। এক আধ দিন আগে পিছে সহেনা। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম দাম বুঝিয়া লয়, কড়াকপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয়, তবে সোনামোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোঁয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর বকনা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচুনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কত বা সাধ্যসাধনা করি—হাতে ধরি পায়ে পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লিখিস। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি?"

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত;—ইহার শরীরের লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধুভাষায় অনুবাদ কর,—ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ভাষাসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর—তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে

এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাঁহারা তর্কালঙ্কারমহাশয়ের গৌড়ীয়-রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারী-সত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশী ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। আবাদ করিতে জানিলে কাঠ-গোলাপ বসরাই-গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

(৭)

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলন-সূত্রেই বর্ত্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে—কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক-জাতীয় সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকালযাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালীসিংহমহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্সায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্সা রচনা করা মূঢ়তামাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙ্গা জোড়া লাগাইবার

চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হয় তৎসম, নয় তদ্ভব শব্দ বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা,—অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনও মধ্যপথ রচনা করিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না—কেননা সে মধ্যপথ ত চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান আর কাহারও থাক আর নাই থাক, রামমোহন রায়ের ছিল।

(৮)

তিনি তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠানে লিখিয়াছেন যে—

"প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্ব্বাহযোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের (Sentence) গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের

প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।”

সকল দেশেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য্য আছে অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভাষার তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সঙ্কীর্ণ। যদি ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়—তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—লৌকিক-ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে গৃহব্যাপারে নির্ব্বাহযোগ্য শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীনতা, ব্যাকরণের নয়—এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য যে তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে—এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে—

“ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়—তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।”

অতএব এক ভাষা অপর-ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের, সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর আদান-প্রদান আবহমান-কাল সভ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যক-মত ঐরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়—স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়,—কেননা পর-ভাষার শব্দ আহরণ কিম্বা হরণ করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক-শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জ্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার যো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সকল অত্যাচার লিখিত-ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, তাঁহার ব্যবহৃত পদ-সকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিম্বা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে, "সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।" সমাসসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না।" তাঁহার মতে "হাতভাঙ্গা" "গাছ-পাকা" প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা-সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের

ভাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না—এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দাঁতভাঙ্গা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতরীতি-অনুসারেই লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দসম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাঙ্গলা শব্দসম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরাজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরাজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। Milton না পড়িলে বাঙ্গালী মেঘনাদবধ লিখিত না, Scott না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং Byron না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরাজি সাহিত্যের একান্ত অধীন

হইয়া পড়িল—ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরাজি-নবিস লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরাজির কথায়-কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এই সকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্যকতা ছিল। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শব্দ আছে যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধু-ভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরাজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই—কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক এ অভিযোগের কোনরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে,—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গসাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ-অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে। আমাদের

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া experiment করিয়াছেন —সুতরাং নূতন experiment করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্য-সাহিত্যের বয়স এখন সবে একশ বৎসর—সুতরাং তাহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে, সে পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই;— আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে যখন প্রাক্-বৃটীশ যুগে গদ্য ছিল না—তখন গত-শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কই তাহারই নাম যে গদ্য এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষাসম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ—এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহার আলোচনা এবং তাহার বিচার হওয়াই সঙ্গত।

(৯)

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ভাষার নাম কাব্য-শরীর;—কিন্তু এ শরীর ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্থূলের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের সাহিত্যের প্রতি চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা আছে, এবং ইংরাজি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট অর্ব্বাচীন বঙ্গসাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্ব্বে ছিল কেবলমাত্র দুচারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষের।

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ এ ধারণা যে বাঙ্গালীর মনে আজ বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে আমরা সকলেই জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপায়,—কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনী-শক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন, প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে নানা লোকে এই শিশুসাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এই সকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক।

(১০)

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা, বঙ্গ-সাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়,—সে বিচার

ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব গ্রহণ যে করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত। একদলের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন সাহিত্য নয়।—অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকারমহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্ব্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না—কেননা বাঙ্গালী আজ তাঁহার মতে—"মস্তিষ্কের তীব্র চালনা গুণে পাইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে—দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব।" "আমরা কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝিবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি।" বাঙ্গালীর হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্য বাঙ্গালীর জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস অতি নিকট-অতীতে।

"বাঙ্গালী গ্রামে গ্রামে পালোয়ান, বাগদী, গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত," এবং তাহার প্রধান

কাজ ছিল—"আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে. পুঁথি লেখা।" এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না—কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জ্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরাজি ভাষাতে কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন তাঁহারা ত অদ্যাবধি এ বাঙ্গলার সাক্ষাৎলাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস, সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙ্গালী প্রাণে এত ব্যথা দেয়। "বাঙ্গলা সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দর-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানিং সওয়াল-জবাবও যে আরম্ভ হইয়াছে"—ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকারের নিকট একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাস রচনার জন্য মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন আছে—অপরপক্ষে সরকার মহাশয়ের পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাহার গঠনে কিম্বা পঠনে বাঙ্গালীর কোমলতা হারাইবার আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মতসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল কথার মূল্য যে কত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে কোনরূপ মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন, এরূপ আক্রমণে মারা যাইবে না।

(১১)

অপরশ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের বিরোধী। ইঁহাদের মতে সে সাহিত্য নেহাৎ বাজে—কেননা তাহা সমাজের কোনও কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গন্ত ও পদ্যকাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকার মহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে—ইঁহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়—কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে,—তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয় তাহা হইলে তাহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এদেশে শিক্ষার পাঠ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, Hamlet Divina Comedia প্রভৃতি স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপর্য্যুপরি নানা লোক আছে এবং

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক উর্দ্ধলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিষ। এ যুগে এদেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠমনের পূজার সামগ্রী তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের যে কোনও সার্থকতা নাই—এরূপ কথার কোনও অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। Utilitarianism-এর সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। Faust-এর প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ নহে বলিয়া জর্ম্মাণ পেট্রিয়টিজম কাব্যের বিরুদ্ধে কখনও খড়গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন তাহার কারণ তাঁহারা পৃথিবীর শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

(১২)

লোকরচিত কিম্বা লোকপ্রিয়—এ দুই অর্থেই লৌকিক সাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহির্ভূত আশ্চর্য্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতি-কবিতা

এবং রূপকথাই লোক-সাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়—কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস নবন্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক—আমাদের কল্পনা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের কথাও কতক-অংশে স্বরূপ কথা, কতক-অংশে রূপকথা এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনও রাজারাণীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক-হিসাবে যাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাহাদের নিকট তাহা যাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভেদ। শূদ্র সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজ-সাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই,—অধিকার আছে শুধু পুরাণ ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব্ব কল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যচর্চ্চায় যে অধিকারী-ভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়; আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে কিন্তু আমাদের

আলোচনা, গবেষণা, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাহাদের ধারণায় সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

(১৩)

পূর্ব্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্ত্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মত কোনও বস্তু থাকে তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক, বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে তবে তাঁহারা স্বয়ং যে সে সাহিত্য রচনা করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথম শ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকী তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোন দেশের হউক বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না,—চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন—

"ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতং।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥"

অর্থাৎ—

অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব-সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ-সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক, আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনও বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরাজি ভাষায়, ইংরাজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরাজি জীবনের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা concrete-এর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstractions। ফুল বলিয়া কোনও পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যূথি জাতি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে, গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ণ লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র। এ নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়া মনকে

প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করে না। কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে ইংরাজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক, সম্বন্ধবাচক এবং ভাব-বাচক শব্দ সংগ্রহ করি; অথচ সে জাতি, সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার তাহার কোন খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্বনামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনও পদার্থ নাই। সকল বিশেষ্যের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্ব্বনাম লাভ করি। এই সর্ব্ব-নামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে, যে স্থলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা সর্ব্বনামকে ভাঙ্গাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্ব্বনাম নামমাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ abstraction লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না—আমরা স্বদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশও স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ reality-র প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমরা এই abstraction-এর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের

রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গুঁছিপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এই সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই reality-র রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা concrete (বিশেষ সংজ্ঞক) শব্দবহুল। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাঙ্গলার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি—তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতি শব্দই concrete। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত তাহাকে হয় ত আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র তাহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মল, গলার হারস্বরূপে বঙ্গ সরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষাব্যতীত কোন বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ যুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি বস্তু

পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি এবং দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এবং কোনটি অগ্রাহ্য তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি,—"ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম।" এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে এইমাত্র আমরা জানি কিন্তু কোনটি যে তার দক্ষিণ আর কোনটি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে তাহার জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি কিন্তু তাহার কোনটি কৃষ্ণ এবং কোনটি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্ততঃ ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্বর অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রমহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের কাটগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাব করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষা-কার্য্যে বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকেরা কুণ্ঠিত নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের

কৃতকার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। "মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।" এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চ্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, —পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দূরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্ব্বাচীনই হউক, বাঙ্গালীর হস্তে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন,—এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে বিজ্ঞানে না, নাটকে নভেলে হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান, সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিনা পরীক্ষার ডবলপ্রমোশন পায় সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয় তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও-কোমলতা দুর্ব্বলতারই নামান্তর এবং যুক্তিতর্কের উপর্য্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য্য নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন—"মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার।" জাতীয় মহাপুরুষত্ব লাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর-একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুই শিথিল-বন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য—কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না; সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত;—যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট, তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম।

যে সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীকসভ্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, আর্ট এবং লজিক এই দুই এ সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। প্রকরণভঙ্গতা সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্য রচনা যে এ দোষে অল্প-বিস্তর দুষ্ট এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। এ দোষ

বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যান-ধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা, আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী জাতির হৃদয়-মনের ভিতর অপূর্ব্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব, সাহিত্যে সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের সত্যকে ধ্রুব সত্য বিশ্বাস করা কঠিন, অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ্য করিতে অক্ষম তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—সে সত্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

এবার

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জ্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ মাঘ
পদ্মাতীর

আবার

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠ্‌ল কেবল মর্ম্মর-কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আস্‌বে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন্ পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরণ ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ মাঘ
শান্তাক্রুজ

দ্বাদশ সংখ্যা]　　　　চৈত্র ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বসন্তের পালা

ভূমিকা

আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক "ফাল্গুনী" বলিয়া একটা নাটকের ধরণের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মত তাহারি মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

একদা এপ্রেলের পয়লা তারিখে কবি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজটা খুব রীতিমত জমিয়াছিল। তার পরে পরিণামে যখন বিলশোধের জন্য অর্থ বাহির করিবার দরকার হইল তখন কবির আর দেখা পাওয়া গেল না। সেদিনকার এই ছিল কৌতুক। এবারকার এপ্রেলেও কৌতুকটা সেই একই, গোড়াতেই তাহা বলিয়া রাখা ভালো। সবুজ পাতার পাত পাড়িয়া যে বাসন্তিক ভোজের উদ্যোগ হইল কবি শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে যোগ দিবেন কিন্তু যখন সেই ভয়ঙ্কর পরিণামের সময়টা উপস্থিত হইবে, যখন সকলে চীৎকার শব্দে অর্থ দাবী করিতে থাকিবে তখন, হে কবি,—

"অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১

নবীনের আবির্ভাব

(বেণুবনের গান)

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে !
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

(পাখীর নীড়ের গান)

আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হান্‌ব হাওয়ায়,
নাচের আবীর-হাওয়ায় হানে
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হল রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামেনা যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্‌!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

(ফুলন্ত গাছের গান)

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন হারা!
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা!

২

প্রবীণের দ্বিধা

(দুরন্ত প্রাণের গান)

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হতে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।

মরণকে ত মানিনে রে।
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি।

(শীতের বিদায় গান)

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!
বিদায় বেলায় এ কি হাসি,
ধরিল আগমনীর বাঁশি!
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো!

সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন-করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো!

(নব যৌবনের গান)

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবচ বুঝি?
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার পর।

তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো।

(উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান)

ছাড় গো আমায় ছাড় গো—
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে!
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই আর গো!

(বসন্তের হাসির গান)

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে!
মরণ আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!

এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্‌না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে।

এবার ওকে মজিয়ে দেরে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে;
কেড়েনে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে!

(আসন্ন মিলনের গান)

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সাম্‌নে সবার পড়্‌ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি!

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুন্‌চ না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌ল ভেরী।
দেখচ না কি এই আলোকে
খেলচে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি

৩

নবীনের জয়

(প্রত্যাগত যৌবনের গান)

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে।
কেগো তুমি ?—আমি বকুল !
কেগো তুমি ?—আমি পারুল !
তোমরা কে বা ?—আমরা আমের মুকুল গো।
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে !
অফুরানের আঁচল ভরে'
মরব মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো ?—আমি শিমুল !
তুমি কে গো ?—কামিনী ফুল !
তোমরা কে বা ?—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে।

(নূতন আশার গান)

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভর্‌বে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

(বোঝাপড়ার গান)

এবার ত যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে !
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
এনেছি।

এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরী,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি।

(নবীন রূপের গান)

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কি গো বিস্ময় !
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে'।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে!

(উৎসবের গান)

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপ্‌নাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে।
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে !
অকূল প্রাণের সাগর তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে ?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সবুজ পত্র

ফাল্গুনী

ভূমিকা

বসন্তে ঘর-ছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্তযাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যাই হউক ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্যমিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মত এত বড় প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এই জন্য সে সব চেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দ্দার বলিয়া ডাকে সর্দ্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো

একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দ্দার। এই লোকটির কাজ, চালাইয়া লওয়া,—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দ্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গাম করে না ভিতরে কথা কয় এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেলনা। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুসি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন তিনি আপন খেয়াল-মত অনেকখানি আলো ঝাপসা করিয়া আঁকিয়াছেন, তারি মাঝে মাঝে একটা একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে এই মর্ত্ত্যের লেখকটা তাঁরি নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানিনা কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড় দূরবীন এবং খুব জোরালো অনুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।

যত বড় লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড় হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না কিন্তু ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশি নাই।

সুরুল

২০ ফাল্গুন ১৩২১

(১)

সূত্রপাত

গান

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছেরে, ভাই, গুণ আছে!

বুঝলি কি করে?

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে?

তাই ত—দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো—ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে' কাগজ কলমের উল্টো মুখে উজিয়ে চলেছে।

ওরে ফাগুনের গুণ নয়রে! আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা ত কেড়ে নিতে হচ্চে।

তাই ত, আজ পৃথিবীর ধূলোমাটি পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্য্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগল না!

দাদা

আহা কি মুস্কিল! বয়স হয়েছে যে!

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।

দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখচ, আর এই চেয়ে দেখ সমস্ত জলস্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করচে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কি করে?

দাদা

আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মত সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছেরে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা

শোন্ তবে বলি;—

ঐরে দাদা এবার চৌপদী বের করবে!

এলরে এল চৌপদী এল! আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস

না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়োনা। শোনাও তোমার চৌপদী! কেউ না টিঁকতে পারে আমি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাক্‌ব। আমি ওদের মত কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুন্‌ব।

যেমন করে পারি শুন্‌বই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুনব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে ত বুকে লাগ্‌বে, পিঠে লাগবেনা।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা! তার বেশি নয়।

দাদা

আচ্ছা, তবে তোরা শোন্!

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর একটু ধৈর্য্য ধর ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী তার উপর আবার মানে!

দাদা

একটু বুঝিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজ্‌ত তাহলে—

না, আমরা বুঝব না!

কোনোমতেই বুঝব না!

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়!

আমরা কিচ্ছু বুঝব না বলেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর করে বোঝাতে চায় তাহলে আমরা জোর করে ভুল বুঝব।

দাদা

ও শ্লোকটার অর্থ হচ্চে এই যে বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? তবে বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

দাদা

ঐ কথাটাকেই আর একটু স্পষ্ট করে বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে?
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে?
মর্ত্ত্যে এলে কর্ম্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে তবে আমাদের কথাটাকেও আর একটু স্পষ্ট করে বলতে হল দেখচি! ধর দাদাকে ধর—ওকে আড়কোলা করে নিয়ে চল ওর কোটরে!

দাদা

তোরা অত ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন বল্‌ত? বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা

কাজটা কি শুনি?

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কি হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।

দাদা

খেলা? দিন রাতই খেলা?

সকলের গান

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দ্দার আস্‌চে, ভাই!

আমাদের সর্দ্দার!

সর্দ্দার

কিরে ভারি গোল বাধিয়েছিস্ যে!

তাই বুঝি থাক্‌তে পারলে না?

সর্দ্দার

বেরিয়ে আসতে হল।

ঐ জন্যেই গোল করি।

সর্দ্দার

ঘরে বুঝি টিঁকতে দিবি নে?

তুমি ঘরে টিঁকলে আমরা বাইরে টিঁকি কি করে?

এতবড় বাইরেটা পত্তন করতে ত চন্দ্রসূর্য্যতারা কম-খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখ-রক্ষা হবে।

সর্দ্দার

তোদের কথাটা কি হচ্চে বল্ ত?

কথাটা হচ্চে এই:—

যোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্ নে কি ভাই?

সর্দ্দার

গান

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই।

সকলে

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্ নে কি ভাই?

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা

কেন আপত্তি করি বল্‌ব? শুন্‌বি?
বল্‌তে পার দাদা, কিন্তু শুনব কিনা তা বল্‌তে পারিনে।

দাদা

সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই ত খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

বল কি তুমি দাদা? সময় জিনিষটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

দাদা

তাহলে কাজটা?

চলার বেগে যে ধূলো ওড়ে' কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা

আচ্ছা সর্দ্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।

সর্দ্দার

আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করিনে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দ্দারি।

দাদা

সব জিনিষের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলি ছেলে-মানুষি!

তার কারণ, আমরা যে কেবলি ছেলেমানুষ! সব জিনিষের সীমা আছে কেবল ছেলেমানুষীর সীমা নেই। (দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

দাদা

তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না?

না, হবে না বয়েস, হবেনা।

বুড়ো হয়ে মরব তবু বয়েস হবেনা।

বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগ্‌বে না ভাই—তার মাথাভরা টাক।

গান

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো,—মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেক্‌ব না ত কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দ্দার

আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজবনা জ্ঞান
খুঁজবনা জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

এই উঠ্‌তি বয়সেই দাদার যে রকম মতি গতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন—আর দেরি নেই!

সর্দ্দার

কোন্ বুড়ো রে?

সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না!

সর্দ্দার

তার খবর তোরা পেলি কোথা থেকে?

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

পুঁথিতে তার কথা লেখা আছে।

সর্দ্দার

তার চেহারাটা কি রকম?

কেউ বলে, সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মত, কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মত।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না সর্দ্দার?

সর্দ্দার

আমি তাকে বিশ্বাস করিনে।

বাঃ, তুমি যে উল্টো কথা বল্লে। সেই বুড়োই ত সব চেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়?

সর্দ্দার

সর্ব্বনাশ করলে দেখচি? তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা সুরু করছিস্ নাকি?

তাতে ক্ষতি কি সর্দ্দার?

সর্দ্দার

পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যাবি। কার্ত্তিকমাসের সাদা কুয়াশার মত। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাকবে না। আচ্ছা এক কাজ কর্! তোরা খেলার কথা ভাবছিলি?

-হাঁ সর্দ্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দ্দার

একটা নতুন খেলা বলতে পারি!

বল, বল, বল!

সর্দ্দার

তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়!

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কিনা জানি নে।

সর্দ্দার

আমি বলছি এ তোরা পারবিনে।

পারবনা? বল কি! পারবই!

সর্দ্দার

কখনো পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি!

সর্দ্দার

তাহলে গুরু বলে আমি তোদের মানব।

গুরু! সর্ব্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে?

সর্দ্দার

তবে কি চাস্ বল্ ?

তোমার সর্দ্দারি আমরা কেড়ে নেব্।

সর্দ্দার

তাহলে ত বাঁচিরে! তোদের সর্দ্দারি করা কি সোজা কাজ ? এমনি অস্থির করে রেখেছিস্ যে হাড়গুলোসুদ্ধ উলটোপাল্টা হয়ে গেছে।—তা হলে রইল কথা ?

হাঁ রইল কথা! দোলপূর্ণিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

তাকে নিয়ে কি করবে সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

বসন্ত উৎসব করব।

বল কি ? তাহলে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে!

আর কোকিলগুলো প্যাঁচা হয়ে সব লক্ষীর খোঁজে বেরবে।

আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাক্‌বে।

সর্দ্দার

আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনি বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবিনে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার

আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনি তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার

আর তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের কান মলতে থাকবি।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার

আর—

আর কাজ কি সর্দ্দার! থাক্ বুড়োধরা খেলা! ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দ্দার

তোদের দেখ্‌চি আগে থাক্‌তেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন? কি লক্ষণটা দেখ্‌লে?

সর্দ্দার

উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখই না কি হয়!

আচ্ছা, বেশ! রাজি!

চল্‌রে সব চল!

বুড়োর খোঁজে চল্!

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মত পট্ করে উপ্‌ড়ে আন্‌ব।

শুনেছি উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেল্‌তেই যখন বেরলুম্ তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি এ সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে ?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে ?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইক গলি,
নাইক ঝুলি, নাইক থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক্, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে !
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?

(২)

সন্ধান

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

কেন গো, তোমরা কাকে চাও?

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

কোন্ বুড়োকে?

কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

তিনি কে?

আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

ওঃ বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কি?

বসন্ত-উৎসব করব।

বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব? পাগল হয়েছ?

পাগল হঠাৎ হইনি। গোড়া থেকেই এই দশা।

আর অন্তিম পর্য্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে?
ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্যতারাকে ॥
কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর?

সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্‌রে সোজা, ফেলরে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি

ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে। এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি

সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে বসে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না!

জিজ্ঞাসা করেছিলুম—সে বলে, সাম্‌নে দিয়ে কত ছায়া যায় কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি?

ওযে একই জায়গায় বসে থাকে ও কারো ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেচ তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই—

মাঝি

ভাই, আমার ব্যবসা হচ্চে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত,—ঘর পর্য্যন্ত না।

আচ্ছা চল ত, পথগুলো পরখ করে দেখা যাক্‌।

মাঝি

ঐ যে কোটাল আসচে ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়—আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে!

কোটাল

কে গো, তোমরা কে?

আমাদের যা দেখ্চ ঐই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল

কি চাই?

বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েচি।

কোটাল

কোন্ বুড়োকে?

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল

এ তোমাদের কেমন খেয়াল? তোমরা খোঁজো তাকে? সেই ত তোমাদের খোঁজ করচে?

কেন বল ত?

কোটাল

সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তার বড় লোভ।

আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তাকে দেখেচ?

কোটাল

আমার রাতের বেলার পাহারা—দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝিনে। কিন্তু বাপু, তাকেই সকলে বলে ছেলে-ধরা, উল্টে তোমরা তাকে ধরতে চাও—এটা যে পুরো পাগ্‌লামি।

দেখেচ ? ধরা পড়েচি। পাগ্‌লামিই ত! চিন্‌তে দেরি হয় না।

কোটাল

আমি কোটাল, পথ-চল্‌তি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোন! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে—আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল

কিন্তু তোমরা ছেলেমান্‌ষি করচ।

ঐরে, আবার ধরা পড়েচি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্‌ষিই করচি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

আমাদের এক সর্দ্দার আছে সে ছেলেমান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হুহু করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে হুঁস নেই।

কোটাল

আর তোমরা ?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল (জনান্তিকে মাঝির প্রতি)

পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি

বাপু, এখন তোমরা কি করবে?

আমরা যাব।

কোটাল

কোথায়?

সেটা আমরা ঠিক করিনি।

কোটাল

যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করনি?

সেটা চল্‌তে চল্‌তে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল

তার মানে কি হল?

তার মানে হচ্চে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

কোটাল

তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বল্‌তে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল

তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট।

হাঁ, ওতে সুর আছে কি না।

কোটাল

কোনো সহজ মানুষকে ত কথা বল্‌তে বল্‌তে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে গেছিরে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল

তোমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই বুঝি?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল

কেন বল ত?

পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল

এটা ত বোঝা গেল না।

ঐ দেখ্—তা হলে আবার গান ধরতে হল।

কোটাল

না তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল

এমন হলে তোমাদের চল্‌বে কি করে?

আর ত কিছুই চল্‌বার দরকার নেই—শুধু আমরাই চলি।

কোটাল (মাঝির প্রতি)

পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস

এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আস্‌চে।

কি দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন?

চন্দ্রহাস

ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মত, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ—মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা

চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্চি।

না, না, এখন থাক্‌ দাদা! আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এত বড় খোঁড়া জন্তু জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

দাদা

আপনি কে?

আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা

আর আপনি?

আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা

তা উত্তম হল—আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিষ না—কাজের কথা।

মাঝি

বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন!

কোটাল

আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে, কিন্তু ভালো কথা যে মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই সাবাস্‌! ওটা ভাগ্যের কথা কি না। তা বল ঠাকুর বল!

দাদা

আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেচে। শুনলুম, সে কোন্ শ্রেষ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে তাঁকে ধরেচে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেচি। দেখ বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখিনে। আমি যা লিখ্‌ব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কি লিখেচ শুনি।

দাদা

আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেচ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে ত কেউ মারে না!

কোটাল

ওহে মাঝি, খাসা লিখেচে হে!

মাঝি

ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল

শুনলে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে! পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে!

সর্ব্বনাশ করলে রে !

ও ভাই মাঝি, তুমি যে বল্লে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জমলে ত আর—

মাঝি

আরে রসুন মশায়, পাগলামি রেখে দিন ! ঠাকুরকে পেয়েছি দুটো ভালো কথা শুনে নিই—বয়েস হয়ে এল কোন্ দিন মরব।

ভাই সেই জন্যেই ত বলচি, আমাদের সঙ্গ পেয়েচ, ছেড়োনা। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার মলে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

বাহির হইতে

ওগো, কোটাল, কোটাল, কোটাল !

কেরে ! অনাথ কলু দেখছি। কি হয়েছে ?

সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম তাকে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা ?

সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস

বুড়ো ? বলিস্ কিরে ?

আপনারা অত খুসি হন কেন ?

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুসি হয়ে উঠি।

কোটাল

পাগল ! একেবারে উন্মাদ পাগল !

চন্দ্রহাস

তাকে তুমি দেখেচ হে ?

কল্লু

বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কি রকম চেহারাটা ?

কল্লু

কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক পোকার মত জ্বলচে।

ওহে বসন্ত উৎসবে ত মানাবে না।

ভাবনা কি ? তেমন যদি দেখি তবে এবার না হয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে অমাবস্যায় করা যাবে। অমাবস্যার বুকে ত চোখের অভাব নাই।

কোটাল

ওহে বাপু তোমরা ভালো কাজ করচ না।

না আমরা ভালো কাজ কর্‌চিনে।

আবার ধরা পড়েচিরে, আমরা ভালো কাজ করচিনে।

কি করব, অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালো মানুষ নই।

কোটাল

একি ঠাট্টা পেয়েচ ? এতে বিপদ আছে।

বিপদ ? সেইটেই ত ঠাট্টা।

গান

ভালমানুষ নইরে মোরা
ভালমানুষ নই !
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই ॥
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই ॥

কোটাল

ওহে বাপু তোমরা যে কোন্ সর্দ্দারের কথা বলছিলে সে গেল কোথায় ? সে সঙ্গে থাক্‌লে যে তোমাদের সাম্‌লাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকেনা পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল

এ তার কেমনতর সর্দ্দারি ?

সর্দ্দারি করে না বলেই তাকে সর্দ্দার করেচি।

কোটাল

দিব্যি সহজ কাজটি ত সে পেয়েচে।

না ভাই, সর্দ্দারি করা সহজ, সর্দ্দার হওয়া সহজ নয়।

দাদা, চল তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল

না, না ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে ?

মাঝি

তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে ! এ সব কথা শোনা ভালো !

দাদা

না ভাই, এখান থেকে আমি নড়চিনে।

তাহলে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্চে।

পাড়ার লোক

ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো ? তোমরাই পাঠ করবে নাকি ?

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করিনে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

এরা বলে কিরে ? হেঁয়ালি না কি ?

আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌বে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

একজন বালকের প্রবেশ।

আমি পারলুম না। কিছুতে ওকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই ?

ঐ তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করেছিলে তাকে।

তাকে দেখেচ না কি ?

সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে ?

কিছুই ঠাউরাতে পারলুম না। কিন্তু তার চাকার ঘুর্ণি হাওয়ায় এখনো ধূলো উড়চে।

চল্ তবে চল্।

শুক্‌নো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

কোটাল

পাগল! উন্মাদ পাগল!

(৩)

সন্দেহ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ,—তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধূলো আর শুকনো পাতা।

তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক্ ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পূবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে সমস্ত দিন ধূলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হয়ে গেলুম।

বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্চে ততই মনে ভয় ঢুকচে।

মনে হচ্চে ভুল করেছি।

সকাল বেলাকার আলো কানে কানে বল্লে, সাবাস্, এগিয়ে চল,—বিকেল বেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করচে।

ঠকলুম বুঝি রে!

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়চে।

ভয় হচ্চে আমরাও চৌপদী লিখ্‌তে বসে যাব—বড় দেরি নেই।

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বস্‌বে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাক্‌বে যে তারা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাক্‌ব।

আর তারা আমাদের চারদিকে কুয়াশার মত ঘন হয়ে জমবে।

ও ভাই, আমাদের সর্দ্দার এ সব কথা শুনলে বল্‌বে কি?

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্চে সর্দ্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দ্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দ্দারের সঙ্গে লড়ব।

বল্‌ব, আমরা চলব না—দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বস্‌ব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল!

হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখব।

পিছনের কোনো বালাই নেইরে, যত মুস্কিল এই সাম্‌নেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিৎ হয়ে পড়্, চিৎ হয়ে পড়্!

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়তেই হয় চিৎ হয়ে।

গোড়াতেই যদি চিৎপাত দিয়ে সুরু করা যেত তাহলে মাঝখানে উৎপাত থাকৃত না রে।

আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়চে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, সে বল্‌চে, চল্ চল্ চল্,—আজ মনে হচ্চে ভুল শুনেছিলুম, সে বল্‌চে, ছল, ছল, ছল! সংসারটা সবই ছল রে!

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডি-মণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়!

কি ভুলটাই করেছিলুম! ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি! কিন্তু না চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উল্টো। সেটাইত তেজের কথা হল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে—আমরা চল্‌ব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়্, আমরা চলব না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং—আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই, আমরা চলব না!

চলজ্জীবন যৌবনং—আমাদের জীবনও থাক যৌবনও থাক্, আমরা চলব না।

যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছি ফিরে চল্।

না রে, সেখানে ফিরতে হলেও চল্‌তে হবে।

তবে?

তবে আর কি? যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি!

মনে করি এইখানেই বরাবর বসে আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্য্যন্ত।

ঠিক বলেছিস্, তাহলে মনটা স্থির থাক্‌বে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জান্‌লেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে।

আর-কোথাওটা বড় সর্ব্বনেশে দেশ রে!

সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তার পথগুলো চলে।

কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চল্‌ব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক্, মোরা ফলব না!
সূর্য্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্বলব না!
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না!
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা ত এই প্রাণের টলায়
টলব না!

ওরে হাসিরে হাসি!
ঐ হাসি শোনা যাচ্চে।
বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল!
যেন গুমটের ঘোমটা খুলে গেল।
এ যেন বৈশাখের এক পসলা বৃষ্টি!
কার হাসি ভাই?
শুনেই বুঝতে পারচিস্‌নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি।

কি আশ্চর্য্য হাসি ওর !

যেন ঝরনার মত, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।

যেন সূর্য্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।

যাক্ আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাট্‌ল ! এবার উঠে পড়।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই—চরাচরমিদংসর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সঞ্জীবতি।

ও আবার কি রকম কথা হল ? ঈশানকে এখনো চৌপদীর ভূত ছাড়েনি।

কীর্ত্তি ? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে ? কীর্ত্তি ও আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এস ভাই চন্দ্রহাস, এস, তোমার হাসিমুখ যে !

চন্দ্রহাস

বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে ?

চন্দ্রহাস

এই বাউলের কাছ থেকে।

ওকি ? ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস

সেইজন্তে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখ্‌তে পায়।

কি হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে ত ?

বাউল

ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন করে ?

বাউল

আমি যে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাই।

কান ত আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল

আমি যে সব-দিয়ে শুনি—শুধু কান-দিয়ে না।

চন্দ্রহাস

রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুন্‌লেই আঁৎকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল

না গো, আমি কেন ভয় করিনে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তাহলে এখন চল। ঐ ত সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল

আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে।

সে কি কথা হে ?

বাউল

আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চল অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্ত সমীরে॥

(৪)

সমাপ্তি

দেখ দেখি ভাই, আবার আমাদের এখানে ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল!

ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে?

বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চলে বিশ্রাম করে।

অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।

আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দ্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাক্‌লে মনে হয় কিছু হোক্‌ বা না হোক্‌ তবু মজা আছে। এমন কি বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করচে।

দেখচিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতর?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বলছিল চল্‌ চল্‌, তারা এখানে বল্‌চে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্চে, তবু লাগ্‌চে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আস্‌চে এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনো আমরা দেখিনি।

ঊর্দ্ধশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সাম্‌নের দিকেই চোখ থাকে চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশীতে, যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেতো তাহলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত?

চলার মধ্যে যদি কেবলি তেজ থাকৃত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্চি জগৎটা কেবল "পাব" "পাব" বল্‌চে না—সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌চে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে "পাব" আর "ছাড়ব"র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আনলে ভাই?

ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্চি আর মনে হচ্চে যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বল্‌চে মনে রেখো মনে রেখো, তাদের নাম ত মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস্ কারে ? (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলিনারে ! (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে ? (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে। (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত উৎসবে এ কি রকম সুর লাগ্‌চে ?

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়েছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত। আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে !

প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্চে আমাদের যা আছে সমস্তই—আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্চে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ওযে কিছু পায় কিছু পায় না এই জন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না!

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি।
ক্ষমা আমায় করবে না কি?
গান এসেচে সুর আসে নাই,
হল না যে শোনানো তাই,
সে সুর আমার রইল ঢাকা,
নয়নজলে নয়নজলে॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্চে।

আরে, গেল, গেল, গেল, এ ছাড়া আর ত কিছুই বোধ হচ্চে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল!

নিয়ে চল পথিক, নিয়ে চল তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেচ, এখানে সমস্ত পথিকজগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগ্‌চে—সমস্ত তারাগুলোর!

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কি তা ভুলেই গেছি।

আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বল্লে সে ভয়ঙ্কর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাক্‌ব না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে—তার পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও! রাত কত হল কে জানে? হয় ত বা ভোর হয়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
  তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চা'বার আগে
  আপনি আমায় দেব মেলি।

নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করিনি,
এখনো ভয় করব নারে,
দেবার খেলা এবার খেলি ॥
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে
সব সোনা তার দেয়রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এলনা কেন?

বাউল

সে যে গেছে, তা জান না?

গেছে? কোথায় গেছে?

বাউল

সে বল্লে, আমি তাকে জয় করে আনব।

কাকে?

বাউল

যাকে সবাই ভয় করে। সে বল্লে নইলে আমার কিসের যৌবন।

বাঃ এ ত বেশ কথা! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল

সে বল্লে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ!

তারি ঢেউ?

বাউল

হাঁ। খবর এসেচে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর?

বাউল

যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্চে—"আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাব্‌তে বস্‌তুম তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি ক্ষেপে উঠেচে?

বাউল

সে বল্লে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে.

মরণ এবার আনল আমার
বরণ ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌ল নেশা,
আরাম বলে, "এল আমার
যাবার পালা!"

কিন্তু সে গেল কোথায়?

বাউল

সে বল্লে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকৃতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে?

বাউল

সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।

সে কি কথা? সে যে ঘোর অন্ধকার!

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল

সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন?

তুইও যেমন? সে কি আর ফিরবে?

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কি?

আমাদের সর্দ্দারের কাছে কি জবাব দেব?

এবার সর্দ্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কি বলে গেল সে?

বাউল

বল্লে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব।

ফিরে আস্‌বে? কেমন করে জানব?

বাউল

সে ত বল্লে, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

তাহলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাক্‌ব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

বাউল

এই যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আস্‌চে এরি মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল? ওখানে যে কালো থাঁড়ার মত অন্ধকার!

বাউল

রাত্রের পাখীগুলোর ডানার শব্দ ধরে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন?

বাউল

আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন গেছে বল ত?

বাউল

অনেকক্ষণ—রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে—গা সির্ সির্ করচে।

দেখ ভাই স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়ে মানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে! ভাল লাগ্চে না!

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেক্চে।

প্যাঁচাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি—কিন্তু—

মাঠের ওপারে কুকুরটা কি রকম বিশ্রী সুরে চ্যাঁচাচ্চে শুন্চিস্! ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাব্‌কাচ্ছে।

যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।

রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়!

শোন্ রে ভাই ঐ মেয়েমানুষের কান্না!

ওরা ত কাঁদচেই কেবল কাঁদচেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারচে না।

নাঃ আর পারা যায় না—চুপ করে বসে থাক্‌লেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।

চল আমরাও যাই—পথ চল্লেই ভয় থাকে না!

পথ দেখাবে কে?

ঐ যে বাউল আছে।

কি হে, তুমি পথ দেখাতে পার?

বাউল

পারি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে! যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তাহলে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালবাসতুম তা জানতুম না।

এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা খুসী তাই করেচি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করিনে।

এবার যদি সে ফেরে তাকে মুহূর্ত্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্চে আমরা কেবলি তাকে দুঃখ দিয়েচি।

তার ভালবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।

সে যে কি সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।

ধরায় যখন দাওনা ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙিল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে।

ঐ বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগচে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ!

যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে দাও!

না, না, ও বসে আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখ্‌চ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই!

মনে হচ্চে ওর কপালে যেন কি সব খবর আস্‌চে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখ্‌তে পাচ্চে ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখ্‌লেই বুঝতে পারি কে আস্‌চে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।

ঐ দেখ জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পূবের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করচে।

ওখানে ত কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই কর না, ও কি দেখ্‌চে, কাকে দেখ্‌চে!

না, না, এখন ওকে কিছু বোলোনা।

আমার কি মনে হচ্চে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকোটির মত এসে ঠেকেচে!

ওর মনটা ভোর বেলাকার আকাশের মত চুপ।

এখনি যেন পাখীর গানের ঝড় উঠ্‌বে—তার আগে সমস্ত থমথমে।

ঐযে একটু একটু একতারাতে ঝঙ্কার দিচ্চে, ওর মন গান গাচ্চে।

চুপ কর চুপ কর ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।

এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয় !
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোকে
হোক্ অভ্যুদয় রে ॥

ঐ যে !

চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস !

রোস্ রোস্ ব্যস্ত হোস্‌নে—এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্চে না।

না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

বাঁচলুম, বাঁচলুম।

এস, এস চন্দ্রহাস !

এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কি করলে ভাই বল।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেচ ?

চন্দ্রহাস

ধরেচি তাকে ধরেচি।

কই তাকে ত দেখচি নে।

চন্দ্রহাস

সে আস্‌চে—এখনি আস্‌চে।

কি তুমি দেখ্‌লে আমাকে বল ভাই।

চন্দ্রহাস

সে ত আমি বল্‌তে পারব না।

কেন ?

চন্দ্রহাস

সে ত আমি চোখ্‌-দিয়ে দেখিনি।

তবে ?

চন্দ্রহাস

আমার সব-দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক্ না, বলনা ভাই।

চন্দ্রহাস

আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বল্‌তে পারত।

কাকে তুমি ধরেচ তাও কি বুঝতে পারলে না ?

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে ?

যে বুড়োটা অগস্ত্যের মত পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায় ?

সেই যে ভয়ঙ্কর ? যে অন্ধকারের মত ? যার বুকে চোখ ?

যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?

নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

চন্দ্রহাস

আমিত বল্‌তে পারিনে। সে আস্‌চে এখনি তাকে দেখ্‌তে পাব

ভাই বাউল, তুমি দেখেচ তাকে ?

বাউল

হাঁ, এই ত দেখচি।

কই ?

বাউল

এই যে !

ঐ যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।

ঐ যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল !

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

চন্দ্রহাস

এ কি, এ যে তুমি !

তুমি ! সেই আমাদের সর্দ্দার !

আমাদের সর্দ্দার রে !

বুড়ো কোথায় ?

সর্দ্দার

কোথাও ত নেই ।

কোথাও না ?

সর্দ্দার

না ।

তবে সে কি ?

সর্দ্দার

স্বপ্ন ।

চন্দ্রহাস

তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দ্দার

হাঁ ।

চন্দ্রহাস

আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দ্দার

হাঁ ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে তারা যে তোমাকে কত-লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা ত তোমাকে চিনতে পারিনি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।

তারপরে গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্চে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখ্‌লুম!

চন্দ্রহাস

এ ত বড় আশ্চর্য্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।

চন্দ্রহাস

আর দেরি না—এবার উৎসব সুরু হোক্। সূর্য্য উঠেচে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তাহলে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধর।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ওগো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন—
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

ঐ যে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্চে।

শুন্‌চি বটে।

ও ত মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।

তাহলে দাদা আস্‌চে চৌপদী নিয়ে।

দাদা

সর্দ্দার না কি?

সর্দ্দার

কি দাদা?

দাদা

ভালই হয়েচে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই!

না, না, গুলো নয়, গুলো নয়! একটা।

দাদা

আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হোক।

সূর্য্য এল পূর্ব্বদ্বারে তূর্য্য বাজে তার।
রাত্রি বলে ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার।
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না এখানে অর্থাৎ চল্‌বে না।

দাদা

এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা

এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা

উৎসব না কি? তাহলে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস

না তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্চিনে।

দাদা

আমাকে দরকার আছে না কি?

আছে।

দাদা

আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস

তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাক্‌লে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে। অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে, কোটাল তোমাকে বল্‌বে অবোধ, পণ্ডিত বল্‌বে অর্ব্বাচীন, ঘরের লোক বল্‌বে অনাবশ্যক, বাইরের লোক বল্‌বে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস

আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নবমল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।